শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি।

পূর্ব্বভাষ।

"কাণা-পুতের নাম পদ্মলোচন! ভারি তো লেখক অতুল গোঁসাই, তার আবার প্রবন্ধ, তার নাম আবার—নানান্ নিধি। ওমা, যাব কোথায়?"

গ্রন্থের আবরণপত্রে "নানান্ নিধি" নাম দেখিয়াই হয় তো তুমি শিহরিয়া উঠিয়া ঐ কথা বলিয়া নাসিকা সঙ্কুচিত করিবে? কিন্তু ভাই, দোহাই তোমার, আমি হলপ করিয়া বলিতেছি, আমার এ 'নানান্ নিধি' তোমার সেই কুবেরের কুমুদ-পদ্মাদি 'নিধি' নয়, ইহা খাস্ কাঙালের সম্পত্তি। তবে যে ইহাকে 'নিধি' বলিয়াছি কেন—জান? বলিয়াছি চলতি কথার হিসাবে। লোকে পাঁচ রকমের পাঁচটা জিনিষ হইলেই বলে—নানান্ নিধি, যেমন—অমুক নানান্ নিধি দিয়ে খাইয়েছে। অবশ্য খাদ্যদ্রব্যের ভিতর ভাল-মন্দ—কটু-তিক্ত অম্ল-মধুর সব রকমই তো থাকে, তবু লোকে যেমন বলে—নানান্ নিধি, আমার এ নানান্ নিধিও তেমনই। ইহাতেও কটু-তিক্ত অম্ল-মধুর প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাকৃত রসের সমাবেশ আছে, সঙ্গেসঙ্গে সেই অপ্রাকৃতরসেরও ছিটা-ফোঁটা আছে। বলা বাহুল্য, অপ্রাকৃত-রস বলিতে আমি ভগবদ্ভক্তিরসকেই লক্ষ্য করিয়াছি। শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর তো তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের মঙ্গলাচরণে এই অপ্রাকৃত রসকে তোমার কুবেরের নিধিরও উপরে উঠাইয়া দিয়াছেন। যথা—

> "নিধিষু কুমুদ-পদ্ম শঙ্খমুখ্যে-
> ষরুচিকরো নবভক্তি-চন্দ্রকান্তৈঃ।" (১)

---

(১) অর্থাৎ কুমুদ পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নন্দ ও নীল,—কুবেরের এই নয়টী নিধি। শ্রবণকীর্ত্তনাদি নয়টী ভক্তিরূপ চন্দ্রকান্তমণি আবার কুবেরের নয়টী নিধিতেও অরুচি জন্মাইয়া দেয়।

মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকৃপাপ্রাপ্ত মহাকবি তিনি দিতে পারেন—দিয়াছেন। তাই বলিয়া আমি তাঁহার কথা তুলিয়া গরব করিতেছি না। কেননা, আমি যে কাঙাল—আমি যে গরীব, সকল বিষয়েই অভাবগ্রস্ত। আমার ছোট মুখে অত বড় কথা বলা সাজে কি?

নাম-নির্ব্বাচনের কইফিয়ৎ এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট, তারপর অপর কথা বলি। প্রবন্ধগুলি নূতন নয়,—ইতিপূর্ব্বে বঙ্গবাসীর আদর গৌরবের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসীতে' এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মুখপত্র 'পল্লীবাসীতে' প্রকাশিত হইয়াছিল। শুনিতে পাই,—কাঁহারও কাহারও ভালও লাগিয়াছিল। যাঁহারা আমাকে ভাল বাসিয়া থাকেন, তাঁহাদের তো ভাল লাগিবারই কথা। আর তাঁহাদের আগ্রহেই তো গ্রন্থাকারে প্রকাশ। নচেৎ 'প্রবন্ধ' নামেও যা, কাজেও তা-ই হইত—অর্থাৎ কিনা 'প্র-বন্ধ'—প্রকাশ বিষয়ে প্রকৃষ্টরূপে বন্ধই থাকিত!

দ্বিতীয় সংস্করণের বক্তব্য।

যুদ্ধের হেঁপায় কাগজের বাজার চতুর্গুণ চড়িয়া গিয়াছে। এ বাজারে আর আমাদের মত অবস্থার লোকের কোন গ্রন্থ প্রকাশ করা চলে না। অথচ আজ প্রায় দুই বৎসর হইল "নানান্ নিধি" ফুরাইয়া গিয়াছে; অনেকেই পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশও করিতেছেন। তাই এই কঠিন সময়েও "দ্বিতীয় সংস্করণ" প্রকাশ করিতে হইল। এবার শ্রীশ্রীদোল লীলা, নুড়ীর আওয়াজ, শ্রীরথ মহাশয় এবং ফানুবাবু,—এই চারিটী প্রবন্ধ নূতন সংযোজিত হইয়াছে। আকারও বাড়িয়াছে। ব্যয়বাহুল্য বশতঃ মূল্যও কিছু বাড়াইতে হইয়াছে। লেখার পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন যে কিছুই হয় নাই, তাহা নয়; কিন্তু তাহা অতি অল্প। এবার আর ইহার অধিক বলিবার কিছুই নাই। ইতি—

ভাদ্রপূর্ণিমা, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৩
০।১।এ, মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন,
সিমুলিয়া, কলিকাতা।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

নানান নিধি।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী-কৃত।

নূতন বৎসর।

পুরাতন যায়, নূতন আসে। ইহা হইল সাধারণ নিয়ম। এই নিয়মেই পুরাতন ১৩১৭ তের শত সতেরো চলিয়া গেল, সঙ্গেসঙ্গে নূতন ১৩১৮ তের শত আঠারো আসিয়া হাজির হইল। একটি গেল, আর একটি আসিল তো বটে, কিন্তু ভাই! জিজ্ঞাসা করি,—যেটি গেল, সে যাইবার সময় তোমাকে নীরব সম্ভাষণে যাহা কিছু বলিয়া গেল, তাহা সব শুনিতে পাইয়াছ কি? শুধু শুনিতে পাওয়া নয়, সেই কথাগুলি ধরিয়া—যেটি আসিল তাহাতে কিভাবে চলাফেরা করিতে হইবে, তাহা কিছু স্থির করিতে পারিয়াছ কি? তোমরা যেরূপ বিষয়ে বিভোর, হয় তো তোমরা অনেকেই কোন কথাই শুন নাই, কাজে-কাজেই কর্ত্তব্যও অবধারণ করিতে পারো নাই। ভাল, আমিই না হয় একবার তোমাদের সেই কথাগুলা শুনাইয়া দিই। তখন তোমরা আপনাআপনি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লইতে পারিবে।

দেখ ভাই, এই যে একটা বৎসর চলিয়া গেল, এই বৎসর জিনিসটা কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছ কি? বোধ হয় কর নাই। করিলে বুঝিতে পারিতে যে, বৎসর বলিয়া একটা বিশেষ কোন বস্তু বা ব্যক্তি নাই;—ইহা কেবল ব্যবহার নির্ব্বাহের নিমিত্ত আমাদেরই কল্পনায় গঠিত এক মনোময় বিগ্রহ। কিন্তু এই মনোময় মূর্ত্তিও কথা কয়,—আমাদে গড়া বলিয়া আমাদের কল্যাণের কথা কহিয়া বিদায় লয়।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। 'বৎসর' হইতেছে কাল পরিমাণ বিশেষ। কাল বা সময়ের কোন অবয়ব নাই। কাল অখ দণ্ডায়মান,—চিরদিনই ছিল, আছে, বা থাকিবে; সুতরাং তাহার নিজে নিজে কোন পরিমাণ কিংবা পরিচ্ছেদও হইতে পারে না। কিং আমাদের ব্যবহারের অনুরোধে আমরা তাহাকে খণ্ডখণ্ড বা পরিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছি। এই খণ্ড করা কাণ্ডে আমাদের প্রধান সহায় হইতেছেন—সূর্য্যদেব, তাঁহাকে লইয়াই আমাদের যত-কিছু কাল-নিরূপণ ব্যাপার। 'পরমাণু' হইতে আরম্ভ করিয়া 'পরার্দ্ধ' পর্য্যন্ত যতকিছু ছোট বড় কালের কথা আমরা কহিয়া থাকি, সকলের মূলে ঐ তপনদেব ছাড়া আর কেহই নাই।

পৃথিবী প্রভৃতি সৃষ্ট-পদার্থের যে অংশ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, যাহা এখনও পরস্পর মিলিত হয় নাই,—কিংবা কার্য্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাই হইল—'পরমাণু'। সূর্য্যদেবের রথের ঘোঁড়া ত আর খোলা হয় না, তিনি দিন-রাতই এদেশে ওদেশে বেড়াইয়া বেড়ান। তাঁহার রথের একটি পরমাণুপরিমিত স্থান অতিক্রম করিতে যে সময়টুকু লাগে, আমরা তাহাকে 'পরমাণু' পরিমিত কাল বলি। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সময়টুকু হইতে আমাদের কাল-গণনার সুরু। তারপর ক্রমশ ঐ সূর্য্যেরই গতি ধরিয়া—আমরা অণু, ত্রসরেণু, ত্রুটি, বেধ, লব, নিমেষ, ক্ষণ, কাষ্ঠা

লঘু, নাড়িকা (দণ্ড), মুহূর্ত্ত, যাম (প্রহর), দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর প্রভৃতি গণনা করিয়া থাকি। সূর্য্যদেব পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া একটি বৎসর পরিমিত সময়ে সমগ্র পৃথিবীমণ্ডল একবার পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। অথবা তিনি যে সময়টুকুতে দ্বাদশ-রাশ্যাত্মক সমস্ত ভুবনকোষ একবার পর্য্যটন করিয়া আসেন, সেই সময়টুকুরই নাম একটি বৎসর।

আজ আমাদের সেই একটি বৎসর চক্ষুর সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। আরও কত গিয়াছে, আজিও আর একটি চলিয়া গেল। বরাবরই যে এইরূপ চলিয়া যাইবে, তাহা নয়। একটা সীমা আছে, তাহার পর আর আমাদের এখানে থাকিয়া সূর্য্যের ঐ পৃথিবীভ্রমণ ব্যাপার দেখিতে হইবে না। মানব আমরা, আমাদের সময়ের সে সীমাটা হইতেছে—একশত বৎসর মাত্র। অবশ্য দৈববল সঞ্চয় করিতে পারিলে ইহার অপেক্ষা অধিক বার দেখাও কাহারও কাহারও ভাগ্যে ঘটিতে পারে। সেটা কিন্তু সাধারণ নিয়ম নয়। আমাদের মত আবার পিতৃগণ, মনুগণ, কিংবা সকলের যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, তাঁহাদেরও একটা সময়ের বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। তাহার অধিক আর তাঁহাদের ঐ বৎসরের সাক্ষাৎকার করা ঘটে না। ব্রহ্মারই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তাঁহার নিয়মিত কাল হইতেছে—দুই পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত।

এখন দেখ ভাই, এই যে প্রতিদিন প্রাতঃকালে কালরূপী প্রভাকর উদিত হইয়া আবার অস্তমিত হইতেছেন,—এই যে তিনি যামিনীর তমোবিমোচন করিয়া, বীজাদির অন্তর্নিহিত শক্তিকে কার্য্যাভিমুখী করিয়া দিয়া, কিংবা তিথি প্রভৃতির প্রচার দ্বারা আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মের প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিয়া কত খেলাই খেলিতেছেন, সে খেলার প্রকৃত মর্ম্ম কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ কি? একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি

ভাই, তিনি আমাদের নীরব ভাষায় না বলিতেছেন কি? তিনি তো আকার-ইঙ্গিতে নিত্যই বলিয়া দিতেছেন,—দেখ মানব! তুমি আর কতদিন অজ্ঞান-অন্ধকারে অভিভূত থাকিবে? এই দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের পরম-দুর্ল্লভ পরমায়ু হরণ করিয়া অস্তমিত হইতেছি। একএকটি দিন যেমন যাইতেছে, তোমাদের শেষের সে দিনও তেমনই সমীপবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, এ কথা কি একবার ভাবিয়া দেখ না? ছি ছি, তোমরা মানুষ হইয়া এখানে আসিয়া করিলে কি? বিষয়ভোগ?—তাহা তো পশ্বাদি যোনিতেই যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার জন্য কি এই মানবজন্ম? এ জন্ম যে তোমাদের জন্মমরণের পথ অতিক্রম করিবার চরম জন্ম,—যাঁহার আদেশে আমি দেশে দেশে তাঁহার স্মরণ জাগাইয়া বেড়াই, এ জন্ম যে তাঁহাকে পাইবার উপযুক্ত জন্ম। দেখ, আমি যে তোমাদের পরমায়ু হরণ করি, সে কেবল তোমরা তাঁহাকে ভুলিয়া আছ বলিয়া। যাহারা ভাবেভাবে তাঁহাকে ভাবনা করে, আমার সাধ্য নাই যে আমি তাহাদের আয়ু হরণ করি। তোমরা বোধ হয় মনে কর যে, যমই তোমাদের পরমায়ু হরণ করে। তাহা স্বপ্নেও ভাবিও না। আমি পরমায়ু হরণ না করিলে যমের সাধ্য নাই—কাহারও ত্রিসীমা মাড়ায়। তবে আমি করি কি জান? যম আমার ছেলে কি না, তাই চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখি,—কাহারা আমার এত নিত্য-শিক্ষাতেও আমার প্রভুকে ভুলিয়া আছে। আমি তাহাদেরই পরমায়ু হরণ করিয়া সেই যমের কাছে পাঠাইয়া দিই। আর যাহারা কালরূপী আমাকে ফাঁকি দিয়া আমার সেই কালোবরণ প্রভুর গুণ-গানাদি লইয়াই কাল-যাপন করে, তাহাদের আমার সেই কালোকোলো মেয়েটির কাছে পাঠাইয়া দিই। মেয়েটি কে,—জান ত? তাহার নাম কালিন্দী—যমুনা। তাহার তীরেই প্রভু আমার বিচরণ করেন। সেইখানে

গেলেই সে প্রভুর আমার সাক্ষাৎ পায়,—তাহার মানব জীবন সার্থক হইয়া যায়।

ভাইরে, তোমরা মরীচিমালীর এই অমূল্য উপদেশ কি একটি দিনও শ্রবণ কর নাই? শ্রীমদ্ভাগবতেও কি এই উক্তির অভিব্যক্তি দৃষ্টিগোচর কর নাই?—

"আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া॥"

(২।৩।১৭)

শুনিবে কোথা হইতে? তোমরা তো সন্ধ্যাবন্দনা কর না; বিষয়ের উপাসনায় মজিয়া তোমরা যে—ওই সূর্য্যদেবের উপাসনা ছাড়িয়া দিয়াছ। আর দেখিবেই বা কি প্রকারে?—তোমরা যে এখন স্বাধ্যায় ছাড়িয়া দিয়া নাটক, নভেল বা গোয়েন্দার গল্পেই গলিয়া গিয়াছ। যাহা হউক ভাই, এখনও সময় আছে, এখনও তোমরা দিননাথের বর্ষব্যাপী দৈনিক উপদেশ স্মরণ করিয়া সেই দীননাথের দরবারের পথ ধরিতে পারো। যাহা গিয়াছে, তাহা গিয়াইছে; এখন আর যাহাতে যাইতে না পারে, তাহারই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হও। পরমায়ুর যতটুকু অবশিষ্ট আছে, ততটুকুর সদ্ব্যবহার কর, ততটুকুই তোমার পরম কল্যাণ করিবে,—ততটুকুই তোমার সেই আনন্দধামে যাইবার সহায় হইবে। শ্রীভাগবত বলেন,—

"কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ।
বরং মুহূর্ত্তং বিদিতং ঘটতে শ্রেয়সে যতঃ॥"

(২।১।১২)

'বৃথা কাল চলিয়া যাইতেছে'—এরূপ না জানা হাজার হাজার বৎসরের অপেক্ষা, জানা একটি মুহূর্ত্তও ভাল; কেননা সেই জানাশুনা স্বল্প সময়

টুকুতেই শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনে সযত্ন হইতে পারা যায়, আর তাহারই ফলে সাধনের ধন ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারা যায়।

তোমরা ভাই, সেই রাজর্ষি খট্বাঙ্গের চরিত্র শুন নাই কি?

"খট্বাঙ্গো নাম রাজর্ষির্জ্ঞাত্বেয়ত্তামিহায়ুষঃ।
মুহূর্ত্তাৎ সর্ব্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিম্॥"
(ভাগবত ২।১।১৩)

কোন সময় রাজর্ষি খট্বাঙ্গ দেবতাগণের পক্ষে থাকিয়া দৈত্যদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। অমরবৃন্দ তাঁহাকে প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—রাজর্ষে! আমরা পরম প্রীত হইয়াছি, তুমি অভিমত বর প্রার্থনা কর। খট্বাঙ্গ বলিলেন,—বরের কথা পরে কহিব, অগ্রে আমার পরমায়ুর কথা কীর্ত্তন করুন। দেবতাগণ বলিলেন,—মাত্র একটি মুহূর্ত্ত। খট্বাঙ্গ বলিলেন,—আমার অপর বরে প্রয়োজন নাই, আপনারা আপনাদের মনোগতি বিমানে করিয়া এখনই আমাকে পৃথিবীমণ্ডলে প্রেরণ করুন। আপনাদের স্বর্গধাম তো ভোগলোক; এখানে থাকিয়া তো আমার কার্য্য কিছুই হইবার নয়, কর্ম্মভূমি ধরণীই সাধনের সমুচিত স্থান। দেববৃন্দও তাঁহাকে তথাস্তু বলিয়া ধরায় প্রেরণ করিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বভয়হারী শ্রীহরির শরণাগত হইলেন।

তাই বলি ভাই, এই নূতন বৎসরের নূতন দিনে তোমরা নূতন উৎসাহে সেই নিত্যনূতন শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ কর, তাঁহারই কৃপায় কালের করাল কবল অতিক্রম করিয়া মানবজন্ম সার্থক কর। ভাইরে, আজ তোমরা নূতনখাতার উৎসবে খুবই মাতিয়া গিয়াছ দেখিতেছি, কিন্তু আপন পরমায়ুর জমাখরচের হিসাবনিকাশটাও একবার দেখিলে ভাল হইত না কি? দেখ দেখি

ভাই, হু-হু করিয়া তোমাদের খরচের দিক্‌টাই চাপ হইয়া পড়িতেছে কি না? অনিয়মিত নিদ্রা, অনিয়মিত স্ত্রীসঙ্গ, আর অবিশ্রান্ত অর্থ চিন্তা এবং কুটুম্বভরণচিন্তায় তোমাদের সমস্ত পরমায়ুটুকুই ফুরাইয়া আসিতেছে কি না? তবে ভাই! আর কেন, এখনও সাবধান হও,—এখনও সেই অনাথের নাথ শ্রীনাথের শরণাগত হও। পুরাতন বৎসর এই অমূল্য উপদেশ দিয়াই তোমাদের নূতনের হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিয়া যায়। এই উপকারক উপদেশ তোমরা শুনিবে না কি?

[বঙ্গবাসী; ২রা বৈশাখ; সন ১৩১৮ সাল।]

দশহরা।

অদ্য সেই পুণ্য দশহরা তিথি। আজিকার দিনেই পতিতপাবনী জাহ্নবী ভক্ত ভগীরথের প্রার্থনায় মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আজিকার দিনেই ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সেতুবন্ধে শ্রীরামেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হিন্দুর পক্ষে আজিকার দিন একটা মহনীয় ও স্মরণীয় দিন।

এ তিথির মাহাত্ম্য অতি অপূর্ব্ব। এই পুণ্য তিথিতে ভাগীরথীজলে স্নান করিলে মা আমার স্নানকারীর দশবিধ পাপ হরণ করিয়া থাকেন। তাই এই পাপহারিণী তিথির নাম 'দশহরা'। আজিকার দিনে পুণ্য কাশীধামে—দশাশ্বমেধ-ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া 'দশাশ্বমেধেশ্বর' শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়াও দশজন্মার্জ্জিত অনন্ত পাতক হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

পাপ করে না কে?—ইহ সংসারে আসিয়া শরীর মন বা বাক্য দ্বারা পাপাচরণ করে না কে? দশবিধ পাপের একটা পাপও করে না, এমন লোক এ সংসারে বড়ই বিরল। তবে কি না, কোন্‌টা পাপ আর কোন্‌টা যে পাপ নয়, তাহার তত্ত্ব অতি অল্প লোকেই রাখিয়া থাকে।

দশবিধ পাপ কি কি, একবার শুনাইয়া দিই; তাহা হইলে আপন পাপের কথা অনেকের প্রাণে জাগিয়া উঠিবে, আর সঙ্গেসঙ্গে সেই পাপমোচনের জন্য একটা চেষ্টাও যে না জাগিয়া উঠিবে তাহা নয়। দশ প্রকার পাপের মধ্যে কায়িক পাপ তিন প্রকার, বাচনিক পাপ চারি প্রকার এবং মানস পাপ তিন প্রকার।

প্রথম কায়িক পাপের কথাই বলি। যে সামগ্রী আমাকে কেহ

দান করে নাই, তাহা না বলিয়া গ্রহণ করা একটি, অবৈধ হিংসা করা আর একটি এবং পরদার-সেবা অপর একটি, মোট এই তিনটি কায়িক পাপ। এই পাপ তিনটি 'কায়' বা শরীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়াই ইহারা 'কায়িক পাপ'। এই তিনটিই যারপর নাই ঘৃণিত কর্ম্ম।

পারুষ্য, অনৃত, পৈশুন্য ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ,—এই চারিটি বাচনিক পাপ। অন্ধকে 'পদ্মনয়ন' বলা, চণ্ডালকে 'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ' বলিয়া শ্লিষ্ট সম্বোধন করা প্রভৃতিই 'পারুষ্য'। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—যাহারা আসুরী প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারাই পরুষ বাক্য প্রয়োগ করে; সুতরাং পারুষ্যের মত পাপ নাই। 'অনৃত' হইতেছে—অসত্য কথা বলা। ভগবান্ সত্যস্বরূপ। যে অসত্য কথা বলে, সে কখনও সত্যস্বরূপ ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না। স্বার্থসিদ্ধির অনুরোধে গুরুজনাদির সমীপে অন্যের দোষ উদ্‌ঘাটন করাই 'পৈশুন্য'। ইহার মত নিন্দিত কর্ম্ম জগতে আর নাই। নীচজনোচিত অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা কিংবা বাজে কথা বলাকেই 'অসম্বদ্ধ প্রলাপ' বলে। ইহাতে জিহ্বা-যন্ত্রই বিকৃত হইয়া যায়।

এইবার মানস পাপের কথা বলিব। তাহাও তিন প্রকার,—পরদ্রব্যে অভিধ্যান, মনেমনে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা এবং বিতথাভিনিবেশ। অপহরণ করিব বলিয়া পরের সামগ্রীর কথা মনেমনে আলোচনা করাই 'পরদ্রব্যে অভিধ্যান'। এরূপ চিন্তায় অন্তঃকরণ অত্যন্ত মলিন হইয়া থাকে। অন্যের অনিষ্টচিন্তায় অন্তরে অশান্তির আর সীমা-পরিসীমা থাকে না। অসত্যভূত বস্তুর বারংবার ভাবনার নাম 'বিতথাভিনিবেশ'। ইহাতে মন সর্ব্বদাই অস্থির হইয়া থাকে। চিত্ত চঞ্চল হইলে ধ্যান-ধারণাদি পুণ্য অনুষ্ঠান কিছুতেই হইতে পারে না।

এইতো দশ প্রকার পাপের কথা বলা হইল। এইবার একবার

ভাবিয়া দেখ দেখি, এই দশটির মধ্যে কোন না-কোন পাপ তুমি কর কি না? যদি না করিয়া থাকো, অতি উত্তম কথা। তুমি মানুষ হইয়াও 'দেবতার দেবতা' হইয়া গিয়াছ। শ্রদ্ধা-প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি লইয়া আমরা তোমার পূজা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছি। তোমার আদর্শ এ জগতের অতি উচ্চ আদর্শ। কিন্তু যদি তাহা না হয়,—অর্থাৎ কম হউক আর বেশীই হউক, যদি তুমি ঐ সকল পাপের কোন-না-কোনটি করিয়া থাকো, তবে ভাই! আর বিলম্ব করিও না, যাও, আজিকার এই পুণ্যদিনে ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে যাইয়া তুমি অবগাহন কর, তোমার সকল পাপ দূর হইয়া যাইবে। ভবিষ্যতে ঐ সকল পাপ হইতে তফাতে-তফাতে থাকিতে পারিলে তোমার আর ভাবনা নাই। তোমার মনুষ্য-জন্ম সার্থক হইয়া যাইবে। আসা-যাওয়ার বিড়ম্বনা আর তোমায় ভোগ করিতে হইবে না। কিন্তু সাবধান,—খুবই সাবধান, দেখো যেন তোমার মনের কোণেও এরূপ ভাব না আসে যে,—"যখন দশহরা তিথি আছেন—পাপহারিণী গঙ্গা আছেন, তখন আর আমার ভাবনা কিসের; এক বৎসর তো আমি যত পারি পাপাচরণ করি, তার পর দশহরার দিন আবার একবার গঙ্গাস্নান করিলেই চলিবে,—সকল পাপ দূর হইয়া যাইবে।"

এরূপ ভাব—বড়ই বিষম ভাব। এ ভাবে পাপের প্রসার আরও বাড়িয়াই যায়। পাপকে "পাপ" বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া পাপ করা কিংবা দায়ে ঠেকিয়া পাপ করা এক কথা, আর জানিয়া শুনিয়া মৎলব আঁটিয়া পাপ করা আর এক কথা। মা গঙ্গা আছেন, কি ভগবানের নাম আছেন, তবে আর আমার ভাবনা কিসের? এরূপ মৎলব আঁটিয়া পাপ করিলে সে পাপের আর নাশ নাই, সে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের কোন সাধনাই নাই; অধিক কি, যে যমদণ্ডলাভ

করিলে সকল পাপ হইতেই অব্যাহতিলাভ করা যায়, সহস্রসহস্র যম আসিয়া অতি প্রচণ্ড দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেও সে পাপ বিন্দুমাত্র বিনষ্ট হয় না।

তাই বলি ভাই, আজ জ্যৈষ্ঠের শুক্লা দশমী,—সেই পবিত্র দশহরা। যখন ভাগ্যবশে তাহা পাইয়াছ; তখন আর হেলায় হারাইও না। মনে মনে সঙ্কল্প কর,—যাহা করিবার করিয়া ফেলিয়াছি; অতঃপর আর কায়মনোবাক্যে কোন প্রকার পাপই করিব না, আর জাহ্নবীর জলে যাইয়া অবগাহন কর এবং ভক্তিভরে এই প্রার্থনা-মন্ত্র পাঠ কর,—

"অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্॥
পরদ্রব্যেষভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্॥
এতানি দশ পাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবি।
স্নাতস্য মম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে॥
বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবীতি-বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি॥"

[বঙ্গবাসী; ১৫ই জ্যৈষ্ঠ; সন ১৩১৬ সাল।]

শ্রীশ্রীহিন্দোল-লীলা।

লীলাময়ের লীলার আর অন্ত নাই। নিতুই তাঁহার নূতন লীলা। হইবে না কেন, তিনিই যে নিতুই নূতন। এই সেদিন তাঁহার 'লালে-লাল' দোল-লীলা হইয়া গেল, আজ আবার 'কালোয়-কালো', হিন্দোল-লীলা।

শুভ শ্রাবণ মাস। ঘুটঘুটে কালো মেঘে সারা আকাশটা ছাইয়া ফেলিয়াছে। ধরিত্রীও শ্যামল তৃণগুল্মে সমাচ্ছন্ন। শ্যামল বৃক্ষ-বল্লরীর কুঞ্জেকুঞ্জে পুঞ্জপুঞ্জ অন্ধকার। মেঘের ও বনরাজির কালিমায় কালিন্দীর কালো জল যেন আরও কালো হোয়ে উঠেছে। যে দিকে চাই, সেই দিকেই কেবল কালোরই রাজত্ব। রিমিঝিমি বারি বর্ষণ হইতেছে। থাকিয়া-থাকিয়া চপলা চমকিয়া উঠিতেছে। সনসন পবন-নিঃস্বন এবং গুরুগুরু জলদগর্জ্জন বর্ষাঋতুর বিজয়বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছে। আজ বৃন্দাবনের বনভূমির নিরুপম সুষমা। কাহার প্রেরণায় জানিনা, নীলকণ্ঠ ময়ূরগুলো যমুনাপুলিনে আসিয়া আকাশ পানে তাকাইয়া "কেও-কেও" করিয়া ডাকহাঁক জুড়িয়া দিল; কাহাকে দেখিবার আশায় যেন সহস্রসহস্র নেত্র বিস্তার করিল এবং এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়াঘুরিয়া কি জানি কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। ময়ূরের দল একবার চক্ষুর গুচ্ছগুলি ফর্‌ফর্ করিয়া কাঁপাইয়া তুলে; যেন চোখগুলি সানাইয়া লয়, আর একবার এ পা-টি একবার ও পা-টি তুলিয়াতুলিয়া হেলিয়া দুলিয়া দেখে, আর 'কেও কেও' বলিয়া ডাক ছাড়ে। তোমরা হয় তো বলিবে যে,

মেঘ দেখিয়াই ময়ূর সকল পাখম তুলিয়া নৃত্য করিতেছে। তা তোমরা যা বলিতে হয় বল, কিন্তু এ ময়ূর ব্রজের কি না, তাই ওদের ভাবভঙ্গী দেখে যেন কেমন কেমন মনে হয়। যাউক সে কথা। ময়ূরের ডাক শুনিয়া কালো কোকিলগুলো তাড়াতাড়ি কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া 'কুও কুও' করিয়া তাহাদের ভ্যাংচাইতে লাগিল। কালো-কালো ভোমরাগুলো কুঞ্জের ভিতর চুপেচাপে ফুলবধূর মধু পান করিতে ব্যস্ত ছিল। পোড়া কোকিলের হুড়াহুড়ির জ্বালায় তাহারাও ফুল কুল ছাড়িয়া ভোঁ ভোঁ করিয়া ভোঁ দৌড় দিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে যেখানকার যত পাখী—শুক-সারী, চন্দনা-নুরী, ভীমরাজ-বুলবুল, শ্যামা-দহিয়াল প্রভৃতি ঝাঁকে ঝাঁকে যমুনাপুলিনে আসিয়া আসর জমাইয়া দিল। এমন সময়ে করে বেণু কালো কানু সহচর সঙ্গে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁর সে ভঙ্গীটাও একটু বলি।—

মুদির মরকত, মধুর মূরতি,
মুগধ মোহন ছান্দে।
মল্লী-মালতী-, মালে মধুকর,
মত্ত মনমথ-ফান্দে॥
শ্যাম সুন্দর, সুঘড়-শেখর,
শরদ-শশধর-হাস।
সঙ্গে সবয়স, সুবেশ সম-রস,
সতত সুখময় ভাষ॥
চিকণ চাঁচর, চিকুরে চুম্বিত,
চারু চন্দ্রক-পাঁতি।
চপল চমকিত, চকিত চাহনি,
চিতচোরক ভাঁতি॥

তাঁহাকে দেখিয়া পাখীগুলা এক চোট খুব গলাবাজি করিয়া লইল। তাদের সে নাচুনি-কুঁদুনিই বা দ্যাখে কে? এদিকে বর্ষা-প্রকৃতির কি এক সরস সুন্দর ভাব দেখিয়া লীলাময়ের অন্তরে কি-এক লীলার কথা জাগিয়া উঠিল। তিনি সখাদের লইয়া কিছুক্ষণ রঙ্গরস করিয়া তাঁহাদের বিদায় দিয়া বংশীবটের মূলে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং বংশী লইয়া ব্রজনাগরীর আকর্ষণরাগিণী মধুরমধুর আলাপ করিতে লাগিলেন।

সে কুলনাশা বাঁশী বাজিলে তো আর রক্ষা নাই; শ্রীরাধা ও তাঁহার সখীগণ যে যেমন ছিলেন, অমনি বাঁশীর স্বর ধরিয়া বংশীবটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরি-অভিসারে আসিতে শ্রীরাধার পথে একটা-না-একটা বাধা ঘটেই ঘটে, কিন্তু আজ বর্ষায় তাঁহার বড় উপকার করিয়াছে, দিবাভাগে আসিতেও কোন বিঘ্ন ঘটিল না। কেননা,—

গগনহি নিমগন দিনমণি-কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিনরাতি॥
ঐছন জলদ করল আন্ধিয়ার।
নিয়ড়হি কোই লখই নাহি পার॥
চৌদিগে অথির পবন তরু দোল।
জগ ভরি শীকর-নিকর-হিলোল॥
চলইতে গোরী নগর-পুর-বাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট॥

রাই ধনী আসিলেন। শ্যামসোহাগিনীর সে শোভাই বা কত। তাঁহার অনুরাগভরা অপরূপ রূপের কথা কিছু বলি।—

শরদ সুধাকর-, মণ্ডল মণ্ডন-,
খঞ্জন-বদন-বিকাশ

অধরে মিলায়ত, শ্যাম-মনোহর-,
চিত-চোরায়ণি-হাস ॥
আজু বনি শ্যাম-নব-বিনোদিনী রাই।
তনুতনু অতনু-, যূথ-শত-সেবিত,
লাবণি বরণি না যাই ॥ধ্রু॥
কবরি-বকুলফুলে, আকুল অলিকুল,
মধু পিবি পিবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃতি, কঙ্কণ-ঝঙ্কৃতি,
কিঙ্কিণি-রণরণি বোল ॥
পদ-পঙ্কজপর, মণিময় নূপুর,
পূরিত খঞ্জন-ভাষ।
মদনমুকুর জনু, নখমণি-দরপণ,
নীছনি গোবিন্দদাস ॥

এই ভুবনভরা সৌন্দর্য্যের রাশি লইয়া রাই কিশোরী বংশীধারীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন দুইজনকে দেখিতে কেমন হইল জান?

ও নব জলধর অঙ্গ। ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ ॥
ও বর-মরকত-ঠাম। ইহ কাঞ্চন দশবাণ ॥
ও মত্ত মধুকররাজ। ইহ নব-পদুমিনী-সাজ ॥
ও নব তরুণ তমাল। ইহ হেমযূথী রসাল ॥

আহা আহা, কি অমিয়-মাখা শোভা রে! শোভা হেরিয়া সখীগণের নয়ন-মন ভুলিয়া গেল। এইবার তাঁহাদের মনের সাধ মিটিবে বলিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। শ্রাবণ মাস পড়িতে-না-পড়িতে তাঁহারা দেবী পৌর্ণমাসীর প্রেরণায় এবং বৃন্দাদেবীর উত্তেজনায় হিন্দোলায় চৌকী রচিয়া রাখিয়াছিলেন। সে চৌকীখানি কেমন?—

গজদন্ত-বিরচিত সুবর্ণখচিত।
নীল-পীত-রক্ত-সিত-মণিতে জড়িত॥
সুকোমল তূলী তাহে দিব্য উপধান।
ফুলের ঝালর আর ফুলের বিতান॥

সখীগণ নানাবর্ণের পট্টসূত্র-বিরচিত ডোরী দিয়া বংশীবটতরুর শাখায় সেই চৌকীখানি টানাইলেন। তাহাতে কতকগুলি বাজন্ত ঘুঙ্ঘুর বাঁধিয়া দিয়া তাঁহারা সহাস্য বদনে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—কানাই! আর কেন,' এই দোলায় তুমি আরোহণ কর, আর আমরা তোমায় দোলা দিতে থাকি।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তা-ও কি হয়, আমি একা-একা কি ইহার উপর চাপিতে পারি? তোমাদের কিশোরী যদি ইহাতে চাপেন তো আমিও চাপিতে আপত্তি করিব না।

শুনিয়া শ্রীরাধিকা কৃত্রিম রোষ প্রদর্শন করিয়া মুখ টিপিয়া-টিপিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিলেন,—ছি ছি নিলাজ কানাই! এ কথা বলিতে কি তোমার একটু সঙ্কোচবোধও হইল না? পরের রমণী আমি, তোমার সঙ্গে দোলায় চড়িতে যাইব কেন?

শ্রীকৃষ্ণ খলখল করিয়া এক গাল হাসি হাসিয়া বলিলেন,—রূপসি! এ আবার তোমার কি রকম কথা? তোমরা যে পরের রমণী, ইহা আমি স্বপ্নেও জানি না। পরনারী বলিয়া জানিলে, আমি তো তাহার সঙ্গে পিরিতিই করি না।

শ্যামের কথা শুনিয়া সকলে হোহো হাসিয়া উঠিলেন। তখন ললিতা একটু মুখনাড়া দিয়া বলিলেন,—বলি হাঁগা, ওই গোপনারীদের সঙ্গে তোমার বুঝি স্বপ্নেস্বপ্নেই বিবাহ হোয়েছিল? তাই বুঝি এরা তোমার আপন নারী?

ললিতার কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেন একটু থতমত খাইয়া গেলেন। শ্রীরাধিকাও অমনি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া শ্যামের দিকে কটাক্ষপাত করিতে করিতে সহচরীগণকে বলিয়া উঠিলেন,—

সখি! মোরা তবে কেন থাকি অন্য ঠাঁই।
চলচল ব্রজরাজ-ভবনেতে যাই॥
রাজা রাজরাণী হবে শ্বশুর শ্বাশুড়ী।
আদর হইবে কত ব্রজের ভিতরি॥

বিশাখা আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি হাসির মাত্রাটা আরও একটু চড়াইয়া দিয়া শ্রীমতীর হাত ধরিয়া বলিলেন,—সখি! সেখানে যাওয়া অমনি নয়। সেখানে গেলে কি হ'বে জানিস্ ত? এই শ্যামের শয্যাতেই তোকে শুতে হবে! তাতো তোর অভ্যাস নেই,—পেরে উঠ্‌বি না। তার চেয়ে ভালোয় ভালোয় এই দোলার উপর চেপে বোস্‌না ভাই!

শ্রীরাধিকাও কম রসিকা নন। তিনিও হাসির রাশি ছড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন,—বেশ লো বেশ, তাই ভাল সই তাই ভাল, তা এক কাজ কর্ ভাই! তোতে আমাতে তো আর ভেদ নাই, তা তুই গিয়ে আমার হোয়ে দোলায় চেপে বোস্, তোর চাপাতেই আমার চাপা হোয়ে যাবে এখন।

বিশাখা দেখিলেন বেজায় বেগতিক, কথায় তো আর সখীর সঙ্গে পারা ভার। কাজেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে একটু ইঙ্গিত করিলেন, আর তিনিও অমনি কিশোরীকে কোলে করিয়া লইয়া দোলার উপর চাপিয়া বসিলেন। তখন,—

তাহা নিরখিয়া, যত সখীগণ,
অতি আনন্দিত-মন।

উলু উলু উলু, নিনাদ করিয়া,
করে ফুল বরিষণ ॥
তবে নটবর, আপনি বসিয়া,
রাধারে বসাল্যা বামে।
সহচরী সব, দুদিকে দাঁড়ায়্যা,
দোলায়েন ক্রমেক্রমে ॥
গতায়াত করে, দোলা বারেবারে,
দেখি চমৎকার লাগে।
যেন সুরঞ্জিত, সুন্দর তরণী,
জলধি-তরঙ্গ-বেগে ॥
দোলাতে আছয়ে, যাবত কিঙ্কিণী,
রুণুঝুণু করি বাজে।
যে রব শুনিয়া, সারস সকল,
পড়ে অতিশয় লাজে ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা, তম্বুরা সারঙ্গী,
বীণা বেণু বাজাইয়া।
গোপীগণ গান, করেন সঙ্গেতে,
শ্রীরঘুনন্দনে নিয়া ॥

এমন সময় হইল কি? চারিদিক হইতে কোকিল পাপিয়া প্রভৃতি পক্ষিগণ পরমানন্দে ডাকিয়া উঠিল, সারস-ময়ূরাদি নানা রঙ্গে নৃত্য জুড়িয়া দিল, আকাশে ঘনঘন বিদ্যুদ্বিকাশ হইতে থাকিল এবং মেঘগণও মহাশব্দে গর্জ্জন আরম্ভ করিল। চপলার চক্‌চকানী ও জলধরের কড়-কড়ানীতে বিদ্যুদ্বরণী বড় ভয় পাইলেন, তিনি দুই বাহু প্রসারিয়া শ্যাম জলধরকে জড়াইয়া ধরিলেন। তখন হইল কি?

শ্রীকৃষ্ণ কহেন—মেঘ! থাকহ কুশলে।
কখনো যা পাই নাই তাহা তুমি দিলে॥
সখী সব কৃষ্ণকোলে কিশোরী দেখিয়া।
কহিতে লাগিল অতি সুখিত হইয়া— ॥
একি আমাদের আজি মঙ্গল বাসর।
প্রসন্ন হয়্যাছে বুঝি যাবত অমর॥
নিরবধি যাহা দেখিবারে সাধ করি।
কিন্তু তাহা সিদ্ধ নাহি করে সহচরী॥
আজিত মেঘেতে তাহা সিদ্ধ করি দিল।
দেখিয়া নয়ন মন সব জুড়াইল॥
একি বেঢ়ি আছে মেঘে স্থির সৌদামিনী।
অথবা তমালতরু মাধবী-কাঞ্চনী॥
হিন্দোলা দোলাও সবে অধিক করিয়া।
হেনই থাকুক রাই ত্রাসিত হইয়া॥
দেখিদেখি আমাদের জুড়াকু নয়ন।
জনম সফল করু এ রঘুনন্দন॥

সখীগণ মহানন্দমনে ঘনঘন হিন্দোলা দুলাইতে থাকিলেন, আর প্রাণ ভরিয়া যুগলমিলন দেখিতে লাগিলেন। এস এস ভাই! আমরাও আজ মানস-নয়নে ঝুলনার উপর ঐ যুগলমিলন দর্শনে নয়ন-জনম সার্থক করিয়া লই।

[বঙ্গবাসী; ১০ই ভাদ্র; ১৩১৬ সাল।]

সেকালের নন্দোৎসব।

বিলাতী সভ্যতার বিষম বন্যায় আমাদের জাতীয় মহোৎসবগুলি একে একে সকলই লোপ পাইতে বসিয়াছে। শ্রীনন্দোৎসব ত নাই বলিলেই চলে; কেবল ভিখারী বৈরাগীর দল ভিক্ষাব্যপদেশে বাড়ী-বাড়ী গিয়া এই উৎসবের স্মৃতিটুকু জাগাইয়া রাখিয়াছে মাত্র। এই ভিক্ষাজীবীদের নাচুনি-কুঁদুনি দেখিয়া আমার যে কত কথা মনে পড়ে, তাহা আর কি বলিব। মনে পড়ে, সেই ঝুলনযাত্রার প্রায় পনের কুড়িদিন পূর্ব্ব হইতে যাত্রার দলের বাড়ী-বাড়ী মহলা দেওয়ার কথা। মনে পড়ে, সেই দেবদারু পাতা সংগ্রহ করিবার কথা। মনে পড়ে, সেই ঘুঁড়ির সুতা ধরিয়া ধরিয়া জমা করিয়া রাখার কথা, আর সেই সুতায় দেবদারু পাতা গাথিয়া ঠাকুরবাড়ীর থামে থামে জড়াইয়া দিবার কথা। তার পর মনে পড়ে, কামিনী ক্রোটন প্রভৃতি গাছের ডাল ও বিবিধ ফুল দিয়া ঝুলনচৌকি সাজাইবার কথা, আর ময়ূরের পুচ্ছ ও পুষ্পগুচ্ছ প্রভৃতি দিয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির বেশভূষা রচনার কথা, আরও,—আরও কত রকমের কতই কথা।

এক বৎসর ঝুলনযাত্রার পূর্ব্ব হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টির আর বিরাম নাই। ঝুলনযাত্রার কয়দিনও সমানে বৃষ্টি চলিয়াছে। বাড়ী সাজান হইল না, তার উপর যাত্রা হইল না, ভাবিয়া সকলেই বিমর্ষ। ঝুলনপূর্ণিমার দিন অধিক রাত্রে বৃষ্টি ধরিয়া গেল। তখন আমাদের আনন্দ দ্যাখে কে? আমরা একপাল ছেলে জড় হইলাম। উঠানে একহাঁটু জল। কোদাল লইয়া নালা কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিলাম।

তখন কলিকাতা-সহরের এত উন্নতি হয় নাই। ড্রেণ হয় নাই। রাস্তার ধারে ধারে নর্দ্দমা। আমাদের বাটীর উত্তর ধারে ত খুব বড় নর্দ্দমাই ছিল। তাই জল নিকাশ করিতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইল না। বাটীর পার্শ্বেই অর্জ্জুন ঘোষের গোহাল। পর্ব্বতপ্রমাণ খড়ের গাদা। আমরা চাতকপাখীর মত দল বাঁধিয়া হর্ষধ্বনি করিতে করিতে সেই খড়ের গাদা হইতে বড় বড় তড়্পাগুলি টানিয়া আনিয়া উঠানে বিছাইয়া দিলাম। সেই রাত্রেই মাণিকতলায় খালপারে দেবদারু পাতা আনিতে কতক লোক ছুটিল। এইবার যুবা নাই, বুড়া নাই, সকলেই ছেলেদের দলে মিশিয়াছে। আর রক্ষা নাই। সে হৈহৈ-রৈরৈ ব্যাপার দ্যাখে কে! কেহ-কেহ ভারা বাঁধিতে, কেহ-কেহ পাল খাটাইতে, কেহ-কেহ ঝাড়-লণ্ঠন টানাইতে লাগিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দেবদারু পাতা আসিয়া গেল। তারই বা আমোদ কত? এখন ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য আনিয়া সম্মুখে কাঁড়ি করিয়া দিলেও সে আনন্দের শতাংশের একাংশ মিলে কিনা সন্দেহ। সকলেই একপ্রাণ। সকলেরই সমান উৎসাহ। তাহার উপর কাহারও কর্ম্মে কাহারও প্রতিবাদ নাই। চক্ষের নিমেষে ঠাকুরবাড়ী সাজান গোজান হইয়া গেল। আলো-টালো জ্বালা হইল। বর্ষায় বিষণ্ণ বাড়ী যেন হর্ষভরে হাসিয়া উঠিল। হইল ত সবই; এইবার?—এইবার আসল জিনিষের কি করা যায়? এত রাত্রে যাত্রার দল পাওয়া যায় কোথায়? না পাইলে ত সবই মাটী। আর রাস্তায় কাদা ভাঙ্গিয়া এপাড়া ওপাড়া হাতড়াইয়া বেড়ায়ই বা কে? তাহার জন্যও বড় বেশী ভাবিতে হইল না। তখন দেশ এত সভ্য হয় নাই; তখন ইষ্টকিন ভিজিবার—ডসনের বাটীর বুটজোড়াটি কাদায় মাটি হইবার এত ভয় ছিল না। তখন এই সভ্যতার আড়তবাটী কলিকাতার লোকও খালিপায়ে চলিতে পারিত। তার উপর তখন একটু আধটু জলে ভিজিতে—রৌদ্রে পুড়িতে—কিংবা কাদা

ভাঙ্গিতে কেহই কাতর হইত না। তখন এদেশে ট্রামগাড়ীর শুভাগমনও হয় নাই, সুতরাং একটু আধটু পথ হাঁটিতেও সকলেই অভ্যস্ত ছিল। সুতরাং যাত্রার দল খুঁজিয়া আনিয়া হাজির করিবার জন্য বড় বেগ পাইতে হইল না। চারিদিকেই লোক ছুটিল। কিন্তু অত রাত্রে কাহাকে পাওয়া যাইবে? বাদলার বাজারে সকলেই সকাল-সকাল খাইয়াদাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। তার উপর, কাহারও হয় তো গাইয়ে আছে তো নাচিয়ে নাই, কাহারও বা নাচিয়ে আছে তো বাজিয়ে নাই; এইরূপ নানা কারণে যাত্রার দল আর পাওয়া গেল না। সকলেই বিষণ্নমনে ফিরিয়া আসিলেন। আমরা কিন্তু নাছোড়বন্দ—যাত্রার দল চাই-ই চাই। তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। আমাদের কাহারও চোখে ঘুম নাই। চীৎকার চেঁচামেচিরও অবধি নাই। বৃদ্ধের দল হইতে বারবার 'চুপচুপ' হুকুম জাহির হইতেছে, কিন্তু আজ আর সে কথা কাণে তোলে কে? বরং তাহাতে যেন চীৎকারের মাত্রা আরও বাড়িয়াই যাইতেছে। রাত্রি তিনটা বাজে বাজে, এমন সময় পাড়ার অবিনাশ কাকা এক যাত্রার দল আনিয়া হাজির করিলেন। তখন নাকি আমরা এখনকার সভ্যতা শিখি নাই, তাই পাড়া-প্রতিবেশীকেও খুড়া জেঠা দাদা প্রভৃতি বলিয়া ডাকিতাম, তাঁরাও আমাদের আপন আত্মীয়ের ন্যায়ই স্নেহনয়নে দেখিতেন। যাউক সে কথা, অবিনাশ কাকা যাই আসিয়া বলিলেন যে—যাত্রার দল আনিয়াছি, আর অমনি চারিদিক হইতে মহা উল্লাসধ্বনি উত্থিত হইল। তাঁহার দুইচারিজন সমবয়স্ক তো 'ভ্যালা রে মোর ভাই!' বলিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া ধেই ধেই নৃত্য জুড়িয়া দিলেন। যাত্রার দলের সাজগোজের পেঁটরা পুঁটরি আসিতে লাগিল। আমাদেরও আমোদের মাত্রা বাড়িয়া যাইতে থাকিল। কর্ত্তৃপক্ষ জিজ্ঞাসিয়া উঠিলেন,—কার্ দল হে কার্ দল,—ব্রজরায়, নবীন ডাক্তার,

কালী হালদার, না আর কার? অবিনাশ কাকা বলিলেন,—না, তাহাদের কাহাকেও পাওয়া যায় নাই; ঝোড়ু অধিকারীর দল পাইয়াছি, তাহাই আনিয়াছি। 'বেশ-বেশ, তাহাই ভাল' বলিয়া সকলেই তাঁহাকে সাবাসী দিলেন, তিনিও তখন তাঁহার পুরস্কার স্বরূপ একটি হুঁকা কলিকা একচেটিয়া করিয়া লইয়া এক কোণে বসিয়া একমনে তামাক টানিতে আরম্ভ করিলেন। বন্দোবস্ত হইল, এই কলিকার তামাক পুড়িয়া গেলে তাঁহাকে আর এক কলিকাও দিতে হইবে। তখনকার কাল, তাই দু'এক ছিলুম তামাকেই সানাইয়াছে, আর এখনকার কাল হইলে 'গরম চা গরম চা' করিয়া হয়তো তাঁহাকে সারা বাড়ীটা সরগরম করিয়া ফেলিতে হইত।

তখনই সেই খড়ের উপর সতরঞ্চি-জাজিম বিছানো হইল। যাত্রার দলের ঢোল-খোল বাঁয়া-তবলা বেহালা-তানপুরাও আসিয়া পড়িল। মঙ্গলা-চরণ গান, তারপর কেলুয়া-ভুলুয়ার নাচ-টাচ হইয়া গেল, যাত্রার পালাও আরম্ভ হইল। গুরুজনগণ যাত্রা শুনিতে বসিয়াছেন, আমরাও তাঁহাদের কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়াছি। কিন্তু আমাদের যাত্রা দেখা সেই কেলুয়া-ভুলুয়া আসা পর্য্যন্ত। কেলুয়া-ভুলুয়ার রঙ্গ-ভঙ্গী দেখিয়া আমরা একচোট খুব হাসিয়া লইলাম, তারপর ঘুমঘোরে নয়ন ঢুলুঢুলু করিয়া আসিল, বসিয়া-বসিয়া ঢুলিতে-ঢুলিতে ক্রমশ শুইয়া পড়িলাম। অন্তরে বাহিরে আনন্দ-ময় হইয়া ঘুমাইতে লাগিলাম। ছেলেদের চেঁচামেচি থামিয়া যাওয়ায় অপর সকলে বাঁচিয়া গেলেন, তাঁহারা নিরুপদ্রবে যাত্রা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তবে আমাদের নিদ্রাটা বড় উপদ্রবশূন্য হয় নাই, পেলা দেবার হাঙ্গামায় গুরুজনগণ মাঝেমাঝে আমাদের ঘুম ভাঙ্গাইতে লাগিলেন, আমরাও ঘুম-চোখে পেলা দিয়া আবার জমি লইতে লাগিলাম। ঝুলনপূর্ণিমার দিন এইযে যাত্রা-আমোদ সুরু হইল, তারপর জন্মাষ্টমী পর্য্যন্ত সমানে চলিতে লাগিল।

কেবল কি আমাদের বাড়ীতেই এই আনন্দ, তা নয়, তখন প্রায় পল্লীতে-পল্লীতে এই আনন্দের মন্দাকিনী বহিয়া যাইত। আর সেই পবিত্র আনন্দধারায় স্নান করিয়া হিন্দু আমরা কৃতার্থ হইতাম।

জন্মাষ্টমীর কথা মনে হইলে, এখনও যেন সেই ধূপ-ধূনা গুগ্‌গুলের মনোমদ গন্ধ নাসার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, এখনও যেন পূজ্যপাদ পিতৃদেবের সেই প্রেমগদগদ পুরাণ পাঠ কাণের কাছে ঝঙ্কার করিয়া উঠে, এখনও যেন সেই মাঙ্গলিক ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি প্রাণের ভিতর প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে; এখনও যেন সেই মৃদঙ্গ-মন্দিরা-মুখরিত সঙ্কীর্ত্তনের সুশ্রাব্য স্বরলহরী মরমে-মরমে খেলিয়া বেড়ায়।

পরদিন প্রাতঃকালে নন্দোৎসব। তাহার আনন্দ ভাষায় বলা যায় না। ওঃ, সে আনন্দের কথা মনে হইলে এখনও প্রাণ উৎসবময় হইয়া যায়; সে যেন কেমন-কেমন করিয়া উঠে। আহা! মনে পড়ে, কেবল মনে পড়ে কেন, চক্ষের সম্মুখে যেন দেখিতে পাই,—সেই প্রাতঃকাল হইতে-না-হইতে পাড়ার ঢুলিরা সব নূপুর পায়ে দিয়া আসিয়াছে। ঢোলের বাদ্য শুনিয়া আমরাও তাড়াতাড়ি নূপুর পরিয়া তাহাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিয়াছি। কাঁসারিপাড়ার যত কারখানার কারিগরেরা খোল-করতাল লইয়া আসিয়াছে। পাড়ার নানেদের বাটীর, ও-গোস্বামি-বাটীর, দত্তবাটীর, দাসেদের বাটীর প্রভৃতি সকল বাটীর ছেলে বুড়ো সকলেই দলে-দলে আসিয়াছেন। পূজ্যপাদ ৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জ্যেঠা মহাশয়ের তখন দাঁড়াকবির দল ছিল। কবিবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ৺রামপ্রাণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতি তখন সর্ব্বদাই আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন। জ্যেঠা মহাশয়ের দলের গান ও ছড়া ইঁহারাই রচনা করিতেন। প্রথমে জ্যেঠা মহাশয় সদলবলে আসরে নামিয়া ডান হাত গালে দিয়া বাঁ হাত তুলিয়া গান ধরিলেন,—

"হোক্ না কেন কালো ছেলে রোইলো কি,
রূপে আলো কোরেছে,
আলো কোরেছে গো—
রূপে আলো কোরেছে।"

অমনি তাঁহার গলায় গলা মিলাইয়া সকলেই হাত তুলিয়া গাহিতে লাগিলেন। ছেলে নাই, যুবা নাই, বুড়াও নাই, সকলের পায়েই নূপুর; সকলেই চঞ্চল-চরণে নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছেন। ঢুলি ও কাঁসিদারেরা নানা অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া বাজনা বাজাইতেছে। এমন সময় বাবা আসিয়া দেবতার প্রসাদী হলুদ সকলের কপালে ছুঁয়াইয়া দিলেন। এইবার তাল-তাল বাটা হলুদ বাহির হইল। প্রাঙ্গণে দধি-হরিদ্রার জল ঢালিয়া দেওয়া হইল। আমরা হাতে কোঁচড়ে যে যত পারিলাম বাটা-হরিদ্রা সংগ্রহ করিলাম এবং পরস্পর মাথামাথি করিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলাম। তারপর, সেই কবির গান গাহিতে গাহিতে নাচিতে-নাচিতে আমরা সর্ব্বাগ্রে ৺ঈশ্বর নানের বাড়ীতে যাইলাম। তথায় গিয়া কিছুক্ষণের জন্য গান বন্ধ করা হইল। পূজ্যপাদ পিতৃদেব তখন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই গত কল্য রাত্রের শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন এবং "নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ" ইত্যাদি কতিপয় ভাগবতীয় পদ্য ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে মাতাইয়া তুলিলেন। তারপর তিনিই দুবাহু তুলিয়া নাচিয়া-নাচিয়া গান ধরিলেন,—

"ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইয়া।
হাতে লাঠি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া॥

দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচে রে নাচে রে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া॥"

এই গান যাই ধরা, আর অমনি চারিদিক্ হইতে "হরি হরি" ধ্বনির সহিত খোল-করতাল বাজিয়া উঠিল। সঙ্কীর্ত্তনের সে আনন্দরঙ্গ ছাখে কে? গোবিন্দ পাইলে বুঝি এইরূপ আনন্দেই মন-প্রাণ মাতিয়া উঠে? আমার ছোট পিশা মহাশয় কাঁধে ভার লইয়া গোয়ালা সাজিয়াছিলেন। তিনি কেবল বাবাকে উস্কাইয়া দেন,—মেজ গোঁসাই! মেজ গোঁসাই! সেই আঁকরটা? সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলীতে বাবারও বয়োজ্যেষ্ঠ অনেকে ছিলেন, কিন্তু আজ আমোদে মাতিয়া ছোট বড় সবই এক হইয়া গিয়াছেন। পরিহাস-রসিক পিশা মহাশয়ের প্রস্তাবিত আঁকরটা দিতে বোধ হয় বাবারও লজ্জা হইল না; তিনি হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন,—

"তালের বড়া খেয়ে নন্দ নাচে রে।"

তখনকার সেই হাসিমাখা মনোহর কীর্ত্তন-নর্ত্তনের কথা আর কি বলিব। সেখানে কিছুক্ষণ হলুদ-মাখামাখি দধিকাদায় গড়াগড়ি ও মাতামাতি করিয়া সকলে ও-গোস্বামিবাটী অর্থাৎ পূজাপাদ ৺নিতাই চাঁদ ও বলাই চাঁদ গোস্বামীর বাটীতে চলিলেন। সেখানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে কিছুক্ষণ আনন্দোৎসব করিয়া সকলে নাচিতে-নাচিতে গঙ্গাতীরে যাওয়া গেল। গঙ্গাজলে জল-কেলিরই বা রঙ্গ ছাখে কে? সে যেন সেই পুরাণবর্ণিত অবভৃত স্নানের ব্যাপার। স্নান জলকেলি সমাপন করিয়া সকলে বাড়ীতে ফিরিলেন। মধ্যাহ্নে প্রসাদ ভোজন করিয়া যে যাহার আবাসে চলিয়া গেলেন। ইহাই হইল সেকালের নন্দোৎসব। বিলাতী বাবু তুমি, এ উৎসবের মর্ম্ম তুমি বুঝিবে না। তোমার উৎসব বাগানের গুপ্ত-গৃহে কিংবা ক্লবঘরের মধ্যেই আবদ্ধ। হলুদকাদা-মাখা অসভ্য আনন্দ তোমার ভাল লাগিবে কেন? তা ভাই! তোমার ভাল না লাগে না লাগুক, কিন্তু

আমার যেন মনে হয়, এই অসভ্যতা-মাখানো উৎসব যদি কখনও পূর্ণ মাত্রায় ফিরিয়া আসে, তবেই তুমি তোমার জাতীয় উৎসবের প্রকৃত পরিচয় পাইতে পারিবে,—তবেই আবার নিরানন্দ হিন্দুর মন্দিরে-মন্দিরে আনন্দের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে।

নন্দমহোৎসবের এ আনন্দ এদেশে নূতন নহে। সে আজ চারিশত বৎসরের কথা, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুও উক্ত উৎসবের দিনে ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লইয়া কিরূপ মহানন্দে মত্ত হইতেন,—তাহা পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মুখেই শুনাইয়া দিই।—

"কৃষ্ণজন্মযাত্রাদিনে নন্দ-মহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লৈয়া ভক্তসব॥
দধি-দুগ্ধ-ভার সভে নিজস্কন্ধে করি।
মহোৎসবের স্থানে আইলা বলি হরিহরি॥
কানাঞি খুঁটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহিতী হইয়াছে ব্রজেশ্বরী॥
আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী।
সার্ব্বভৌম আর পড়িছাপাত্র তুলসী॥
ইহা সভা লৈয়া প্রভু করে নৃত্যরঙ্গ।
দধি দুগ্ধ হরিদ্রাজলে ভরে সভার অঙ্গ॥
অদ্বৈত কহে,—সত্য কহি, না করহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার, তবে জানি গোপ॥
তবে লগুড় লৈয়া প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বারবার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা॥
শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুইপাশে।
পদমধ্যে ফিরায় লগুড়, দেখি লোক হাসে॥

অলাতচক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকার পায়॥
এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।
কে জানিবে তাঁহাদোঁহার গোপভাব গূঢ়॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৪ পং।)

দেখিলে ত ভাই! প্রেম-বৈরাগ্যের প্রকট মূর্ত্তি মহাপ্রভু হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রতাপরুদ্রের মত মহারাজা, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মত মহামহা পণ্ডিত পর্য্যন্ত কিরূপ মহানন্দে মাতিয়াছেন। কিন্তু আজ সভ্য সাজিয়াই আমরা এইসকল ধর্ম্মানুগত উৎসবসুখে বঞ্চিত হইয়াছি। ভাগ্যবিধাতাই জানেন, আবার আমরা এইরূপ জাতীয় মহোৎসবে মাতিতে পারিব কি না।

[বঙ্গবাসী, ২রা আশ্বিন, ১৩১৬ সাল।]

মায়ের বোধন।

মা আমার ঘুমায়ে আছেন। ইচ্ছাময়ীরই ইচ্ছা; নচেৎ যাঁহার ইচ্ছায় চরাচর চালিত, যাঁহার মায়ানিদ্রায় বিশ্ব-সংসার বিমোহিত, তাঁহার আবার নিদ্রা কিসের? যিনি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির অতীত,—যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে—সৃষ্টির আদি মধ্য অবসানে সকল কালেই জাগরিত, তাঁহার আবার নিদ্রা কিসের?

মায়ের ইচ্ছায় মা আমার ঘুমায়ে আছেন। ভক্তেরই ইচ্ছা, তাই মায়েরও ইচ্ছা। মায়ের তো আর স্বতন্ত্র ইচ্ছা কিছু নাই। করুণাময়ী মা আমার যে আপন করুণায় আপনাকে ভক্তের অধীন করিয়া ফেলিয়াছেন। ভক্ত ঘুম পাড়াইলে তিনি চৈতন্যময়ী হইয়াও ঘুমাইয়া পড়েন; ভক্ত খাওয়াইতে চাহিলে, তিনি আনন্দময়ী হইয়াও ক্ষুধায় অধীর হইয়া উঠেন। মা আমার হাসি-কান্নার অতীত হইলেও ভক্ত কাঁদাইতে চাহিলে তিনি কাঁদিয়া আকুল হন, আবার ভক্ত হাসাইতে চাহিলে তিনি হাসির রাশি ছড়াইতে থাকেন। কৃপাময়ীর কৃপাবৈভবেরই বলিহারি, কোটিকোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ক্রীড়াকুট্টিম, তিনি হইতেছেন কিনা ভক্তের হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলিকা! তাই ভক্তেরই ইচ্ছা মায়েরই ইচ্ছা।

ওগো ভক্ত বড় গুণী গো গুণী। সে বড় মন্ত্র জানে গো মন্ত্র জানে। একবার সেই মন্ত্র পড়িলে তো আর রক্ষা নাই; যাই পড়া, আর অমনি শুড়শুড় কোরে মার তার বশীভূত হোয়ে যাওয়া। মা-বশ-করার মন্ত্রটা তোমরা শুন্‌বে কি? বিশ্বাস না হয় তো পরখ কোরেও তো দেখ্‌তে পারো—এ মন্ত্রবলে মা আমার বশ হয় কি না? কেবল রসনা বশে

থাকিলেই হইল। আমার রসনা তো আমার বশে আসিল না, তাই বলি-বলি কোরে বলাও হোলো না; ত্থাখ্ ভাই তোরা যদি পারিস্। সে মন্ত্রও তো আর বড় বেশী কিছু নয়,—মা বশ করার মন্ত্রও হইতেছে সেই—মা, মা, মা! বলিব কি ভাই, সেই তারা—যাদের রসনা বশে আসিয়াছে, তারা কেবল কচি খোকার মত দু'বাহু তুলিয়া মা মা বলিয়া ডাকে, আর মা আমার রইতে না পেরে তাদের কাছে ধেয়ে এসে তাদেরই হোয়ে যান, তার-পর তারা মাকে যা বলে, মা-ও তাই-ই শুনেন। এমন না হোলে আর দয়াময়ী?

ভক্তের ইচ্ছায় মা আমার ঘুমায়ে আছেন। তাই থাক মা! তাই থাক,—যাদের তুমি, তাদের সাধে কে আর বাদ সাধিবে বল, ঘুমায়ে থাক মা ঘুমায়ে থাক। তুমি আমাদের তো কেউ নও, আমরা তোমায় আপন ক'র্ত্তে পারলাম না বলিয়াই তো তুমি আমাদের কেউ হ'লে না? তাই বলি মা! তুমি আমাদের নও, তাদের তাদের তাদেরই হোয়ে ঘুমায়ে থাক মা! ঘুমায়ে থাক।

আহা-হা-হা! মায়ের আমার কি রূপ গো? ঐ যে দেখিতে পাইতেছ না,—ঐ যে কৈলাসশিখরে মণিমন্দিরের অভ্যন্তরে রত্ন-পর্য্যঙ্কে ঘুমন্ত মা আমার শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। ওকি রূপ গো?—মরি-মরি, আকাশের চাঁদ ফুটা হইয়া তাহার সকল সুধাটুকুই বুঝি পর্য্যঙ্কের উপর গড়াইয়া পড়িয়া গেছে? আহা-হা-হা! সে লাবণ্য-ঢল-ঢল তরল সুধার তরতর তরঙ্গই বা কত! হায় হায়, ঐ আকাশের নক্ষত্রগুলাও বুঝি সুধাকরের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া মায়ের অলঙ্কার সাজিয়া বসিয়াছে? ঐ যে ঐ যে—জলদজালও বুঝি চন্দ্রকলঙ্কের সহিত মিলিয়া মিশিয়া মায়ের কেশরাশির আকার ধারণ করিয়াছে? ঘুমায়ে থাক মা! ঘুমায়ে থাক;—ব্যোমকেশের হৃদয় আকাশ জুড়িয়া এই রূপের ডালি লইয়া ঘুমায়ে

থাক মা! ঘুমায়ে থাক। আমি তোমার ঐ মাণিক-ভুলানো মুখখানি খানিক দেখিয়া লই, ঐ রূপেই তুমি ঘুমায়ে থাক মা! ঘুমায়ে থাক।

ওকি—ওকি,—তোমার অতনু-নিন্দন কুন্দন-তনু কাঁপিয়া উঠিল কেন মা? ওকি—ওকি, তোমার বিদ্রুম-রঙ্গিম অধরোষ্ঠখানি কাঁপিয়া উঠিল কেন মা? ওকি—ওকি, তুমিও যে অস্ফুটস্বরে মা মা বলিয়া উঠিলে? মা-নাম কি এতই মিষ্ট—এতই মধুর, তোমারও বলিতে সাধ হয় মা? তাই বুঝি চুপিচুপি ঘুমাইয়াঘুমাইয়া মা-মা-নাম আবৃত্তি করিতেছ মা? না না,—আরতো চুপে চুপে নয়, এ যে সকল শরীর সকল ইন্দ্রিয় সকল মন সকল প্রাণ দিয়া তুমি মা মা ডাকিতে আরম্ভ করিলে? ওকি—ওকি, তোমার বিশ্ব-পাগল করা মা মা মন্ত্রে তুমিও পাগল হইয়া গেলে নাকি? হায় হায়! শঙ্করের সোহাগ আদরের করবন্ধন অনাদরে ছিনাইয়া ফেলিয়া তুমি যে পাগলিনীর মত আলুথালু বেশে চঞ্চল-চরণে গৃহের বাহিরেই চলিয়া গেলে?

মা-আমার ঘুমায়ে নাই। যারা ঘুম পাড়ায়েছিল তারা বুঝি কেউ জাগাইল; মা আমার আর ঘুমায়ে নাই। মা-ও জাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সকলেই জাগিয়া উঠিল। মহানিদ্রাকে হৃদয়ে ধরিয়া, আশুতোষ যোগনিদ্রা অনুভব করিতেছিলেন, চৈতন্যময়ীর জাগরণে তিনিও জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহার জাগরণে তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে ভুজঙ্গগণ জাগরিত হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মাথার জটাগুলিও যেন জাগিয়া খাড়া হইয়া উঠিল, অমনি তাহার মধ্য হইতে গঙ্গাদেবী খল্-খল্ করিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উঠিলেন। একি, অকস্মাৎ মহামায়ার জাগরণ কেন, বুঝিতে না পারিয়া পিনাকপাণি ব্যস্তসমস্তভাবে শয্যাত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। কুণ্ডলিগণের আকস্মিক জাগরণে তাঁহার কটিবন্ধন শিথিল হইয়া গেল, ব্যাঘ্রাম্বরখানি খসিয়া পড়িল।

তিনি দিগম্বর হইয়াই টলটল ভাবে বাহিরে গমন করিলেন। নয়ন উন্মীলন করিবামাত্রই ললাটনেত্র হইতে ধক-ধক অনল জ্বলিয়া উঠিল। ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য তিনি ভোঁ ভোঁ করিয়া শিঙ্গা বাজাইয়া দিলেন। মায়ের জাগায় সকলেই তো জাগিয়াছে, তাহার উপর শিঙার সঙ্কেত পাইয়া গজানন-ষড়ানন লক্ষ্মী-সরস্বতী জয়া-বিজয়া নন্দী-ভৃঙ্গী প্রভৃতি যে যেখানে ছিলেন, সকলেই ত্বরিতপদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা-ও আমার অমনি জয়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—জয়া! জয়া! আমি যে আর এখানে থাকিতে পারিতেছি না, আমার প্রাণ যেন কেমন কাঁদিয়া-কাঁদিয়া উঠিতেছে। কেবল মনে হয়,—কে বুঝি নয়ানজলে বয়ান ভাসাইয়া আমায় মা-মা বলিয়া ডাকিতেছে। দেখ্ দেখ্ জয়া! দেখিতে দেখিতে সংবৎসর অতীত হইয়া গেল, কতদিন আমার মাকে দেখি নাই বল্ দেখি। চল্ চল্ জয়া! গিরিরাজপুরে গমন করি; মা-ই বুঝি আমার মা মা বলিয়া কাঁদিতেছেন? শুধু মা কাঁদেন নাই জয়া! ঐ—ঐ দেখ্, চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখ্, বর্ষার ঘনঘোর কাটিয়া গিয়াছে, আকাশ নির্ম্মল হইয়াছে, ঝাঁকে ঝাঁকে শুকপক্ষী উড়িয়া বেড়াইতেছে, হংস-সকল আনন্দ-কলরবে দিগ্ দিগন্ত মাতাইয়া তুলিয়াছে। ঐ—ঐ দেখ্ জয়া, বিমল জল, জলে-জলে প্রফুল্ল কমল, কমলে কমলে মনোরঞ্জন ভ্রমরগুঞ্জন, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ফলভারাবনত ধান্যবৃক্ষ, আশে পাশে বিকশিত কাশকুসুম শরৎ ঋতুর আগমন-বার্ত্তা প্রচার করিতেছে। এই সময়—এই সময়েই তো বঙ্গের ঘরেঘরে আমার শারদীয়া মহাপূজার মহা আয়োজন হইয়া থাকে। বুঝি জয়া! তারাই আমায় ঘরে ঘরে মা মা বলিয়া ডাকিতেছে? চল্ চল্ জয়া! মা-ই ডাকুক, আর তারাই ডাকুক, আমি সকলেরই বাঞ্ছা পূর্ণ করিব। মা মা বলিয়া ডাকিলে আমি কি আর স্থির হইয়া থাকিতে

পারি? বল্ বল্ জয়া! নন্দীকে বল্, এখনই সে বাহন লইয়া আসুক, আর আমরা বিষাদের কালিমা মুছিয়া উল্লাস-হাস্যের জ্যোৎস্না ফুটাইয়া, যারা মা মা বলিয়া ডাকিতেছে, তাহাদের ঘরেঘরে গিয়া সংবৎসরের সাধ মিটাইয়া আসি।

জয়া মহামায়ার কথার উত্তর দিতে-না-দিতে তাঁহাকে ঘেরিয়া গণপতি প্রভৃতি সকলেই আনন্দকোলাহল করিয়া উঠিলেন;—মর্ত্ত্যে যাইতে সকলেই আগ্রহান্বিত হইলেন। নন্দী তো সেখানে উপস্থিতই ছিল, তাহাকে আর ডাকিতে হইল না। সে ঝড়ের আগে বাতাসের মত তৎক্ষণাৎ আঁকিয়া বাঁকিয়া নাচিতেনাচিতে বাহন সাজাইতে চলিয়া গেল। চারিদিকেই অমনি সাজ-সাজ-রবের মহা আনন্দোল্লাস আরম্ভ হইল। কাণ্ডকারখানা দেখিয়া ভোলানাথই যেন কেমন আরও বোম্‌ভোলা হইয়া গেলেন। দক্ষযজ্ঞের কথা তো ভোলেন নাই, তাই আর কোন কথায় আপত্তি করিতে পারিলেন না।

জাগো জাগো মা আনন্দময়ি! যারা তোমায় জাগাইতে জানে, তাদেরই বোধন-মন্ত্রে তুমি জাগরিত হইয়াছ, জাগো জাগো কুলকুণ্ডলিনি! যখন জাগিয়াছ তখন আর ঘুমাইও না মা! তুমি তোমার ঐ দশদিক-আলোকরা দশভুজা দুর্গামূর্ত্তিতে মর্ত্ত্যধামে আগমন কর, মা-মা বলিয়া সকলে তোমার কমল-চরণের অর্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাউক। জাগো জাগো গো করুণাময়ি!

[বঙ্গবাসী; ৩০শে আশ্বিন; ১৩১৬ সাল।]

মা-এলো।

মা এলো গো মা এলো,—আমাদের মা তোমাদের মা—জগতের মা উমা এলো।

বরষে-বরষে হরষের হাসি ছড়াইতে-ছড়াইতে মা আমার এমনই দিনে আসিয়া থাকেন। ঐ যখন আকাশের ঘনঘোর কাটিয়া যায়, ধরণীর কর্দ্দম-দুর্গমতা দূর হইয়া যায়; ঐ যখন মুনির মনের মত যত জল নির্ম্মল হয়, জলে জলে কমল সকল প্রস্ফুটিত হয়;—ঐ যখন গুন্‌গুনিয়ে ভোমরা বেড়ায়, মরালের দল খেলিয়া বেড়ায়;—ঐ যখন মাঠগুলি সব ধান্যে ঢাকা, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় জগৎ মাখা, সেই সময়টাতেই তো মা আর এখানে না আসিয়া থাকিতে পারেন না। এই সময়টায় কেমন পাপিয়া-টাপিয়া থাকিয়া-থাকিয়া ডাকিয়া উঠে;—ওরা যেন মার আগমনী গান গাহিতে থাকে। টুকটুকে ঠোঁটে ধানের শীষগুলি লইয়া টীয়াপাখীরা সব চলন্ত রামধনুকের মত এদিকে-ওদিকে ছুটাছুটি করে; দেখে মনে হয়—ওরা যেন মার আবাহনের অর্ঘ্য লইয়াই চলিয়াছে। শিশিরমাখা শেফালিকাফুল ঝরিয়া-ঝরিয়া পড়িয়া যায়,—ওরাও যেন মায়ের চরণে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাই এমনই সময়েই মা আমার আসিয়া থাকেন।

বলি হাঁ গা, ঐ উত্তরদিকটায় কি-একটা-কি—ঐ যেন কিসের কিসের কিসের মত কি-একটা-কি দেখা যাইতেছে না? ঐ যে ঐ কুঙ্কুম-রঞ্জিত মলয়জের মত;—না না, কামকার্ম্মুকের চম্পক-কুসুমের মত;—না না, কুন্দনকনকের কন্দুকের মত,—না না, সৌদামিনীমাখা

সুধাকরের মত ;—না না, ঐ যে ঐ মদন রতি মিশিয়ে গড়া ক্রীড়া-পুত্তলীর মত ;—না না, ঐ যে ঐ কিসের কিসের কিসের মত, এর মতও নয়—ওর মতও নয়—তারই তারই তারই মত কি-একটা-কি দেখা যাইতেছে না? আহা-আহা, মুকুতার ঢলঢল লাবণ্য যেন অঙ্গ দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে গো গড়াইয়া পড়িতেছে! মুখখানিতে বুঝি মাণিক চুয়াইয়া মাখাইয়া দেওয়া? আহা-আহা, নয়ন মন ভুলিয়া গেল গো ভুলিয়া গেল ;—রূপ-সাগরে ডুবিয়া গেল গো ডুবিয়া গেল।

ঐ যে ঐ গোলাপফুলের পাপড়ির মত ঠোঁটদুখানি,—তাহার সঙ্গে হাসিখুসির মিশামিশি, ও যেন কিছু না বলিয়াও কতই কথা বলিতেছে। ঐ যে ঐ চটুল-চটুল নয়ন কয়টি, ও যেন প্রথম প্রভাতের প্রস্ফুট পঙ্কজ, রাত্রে ভ্রমরকে লইয়া মুদ্রিত হইয়াছিল, অন্তরে মধু উছলিয়া পড়িতেছে ; ভ্রমর এখন ঠিক করিতে পারিতেছে না—মধুই খাইব, না বাহিরেই যাইব। ও নয়নও যেন কথা কয় গো কথা কয়। ও নীরব ভাষায় কি কথা কয় ও-ই জানে ; আর ও যারে জানায় সে-ই জানে। আমার মন বুঝি ওর কাছে থেকে কিছু জেনে নিয়েছে? তা না হ'লে সে অত উতলা হবে কেন,—ও নয়নের পানে তার অত টানই বা জন্মাবে কেন? আহা আহা, ভ্রূযুগল বুঝি ঐ নয়ন-কমলের নাল?—কোন্ অমিয়া-সাগরে এহেন কমল ফুটেছে গো? আহা-আহা, উজ্জ্বল গণ্ডে কুণ্ডলের কিরণ পড়িয়া ঝল্‌মল্ ঝল্‌মল্ করিতেছে,—ওরাও যেন কথা কয় গো কথা কয়।

ললাটে ওকি চাঁদ?—চাঁদই বটে,—আকাশের চাঁদই বটে। ও এসেছিল কি-এক লোভের খাতিরে, এখন বদন-চাঁদের ফাঁদে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। সে ঐ রূপ-সাগরে ডুবিয়া গিয়া ষোলকলায় জলাঞ্জলি দিয়া টায়ে-টোয়ে একটি কলা জাগাইয়া রাখিতে পারিয়াছে। ঠিক হ'য়েছে —বেশ হ'য়েছে ; যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল ফ'লেছে। জন্মেছিলি না হয়

সাগরেই, তা ব'লে কি ঐ সুধাসাগরের কাছে ঘেঁসিতে হয়?—ওর কাছে কি আর চালাকি চলে? না, চাঁদেরই বা দোষ দিব কি? ও আগা-গোড়া কথা-কওয়া চেহারাখানার লোভনীয় আহ্বান কি কেহ সহজে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? ও মাধুর্য্যমণ্ডিত মূর্ত্তির যে দিক্‌টা দেখি, সেই দিক্‌টাই যে কথা কয়,—প্রীতির আকর্ষণে টানিয়া লয়। তা চাঁদ বেচারি আর করিবে কি?

ও মূর্ত্তি তো নয়,—যাদুকরী! একবার চোখোচোখী হইলে ত আর রক্ষা নাই; তখনই কোন্ মোহন মন্ত্রে বশীভূত করিয়া ফেলে। ভাই, তোমাদের যদি সংসার করবার বাসনা থাকে তো সাবধান ক'রে দিই;—ও রূপের দিকে তোমরা চেয়ো না ভাই! চেয়ো না। ঐ ধরা-ছাড়া ধরা-আলোকরা অপরূপ রূপ নয়ন দিয়া ধরিতে গেলে নিজেই ধরা পড়িয়া যাইবে,—আপনাকে আপনিই খোয়াইয়া ফেলিবে,—শেষে ঘরে ফিরিয়া যাওয়া দায় হইয়া উঠিবে। তাই বলি, ও কুহকমাখা রূপের দিকে চেয়ো না ভাই! চেয়ো না।

ঐ দিগ্‌বলয় আলোকরা দিব্য-রূপে কে দেখা দিল গো, কে দেখা দিল? ঐ উজ্জ্বল স্নিগ্ধ জ্যোতিমাখা,—ঐ ললিতললিত-লাবণ্যমাখা,—ঐ শান্তিনিশানো কান্তিমাখা কে এলো গো কে এলো? ঐ কি আমার মা?—ঐ কি আমার দশ হস্তে দশপ্রহরণ-ধারিণী—দানবদলদলনী—দারিদ্র-দুঃখ-বিদ্রাবিণী মা?—ঐ কি সেই কৃপামৃতবর্ষিণী—অশিব-নাশিনী শিব-সীমন্তিনী মা? ঐ কি সেই হাসিহাসি-ভাষিণী—করুণার মন্দাকিনী—সন্তাপ-সংহারিণী মা?

কই, কেউ যে কিছুই বলে না গা? বলাবলিরই বা দরকার কিসের? আমার হিয়ার মাঝারে যে, ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে,—ও-ই আমার মা মা মা! মা না হইলে কি আর অত স্নেহমাখা ভাব আর কাহারও হইতে

পারে? রাজ্যের সৌন্দর্য্য রাজ্যের মাধুর্য্য—রাজ্যের কোমলতা রাজ্যের সহিষ্ণুতা একত্র করিয়াই না মায়ের প্রতিমার গঠন? তাই মনে হয়,—ঐ ভুবনভুলানো অভয়ারূপে আমার ভুবনমোহিনী মা-ই এলো।

এস,—এস মা! এই তো তোমার আসিবার সময়, এস মা! তোমার প্রীতির পাত্র শরৎ এসেছে, এস মা! বৎসরের বেদন বুকে চাপা আছে, এস মা! ও তোর মুখ দেখে দুখ দূর হোয়ে যাক্, এস মা! তুমি মা হোয়ে না হয় মেয়ে হোয়ে এস, এস মা! ও তোর রাজীবচরণে মঞ্জীর বাজায়ে এস মা! তার রুণু-ঝুনু রোলে পরাণ জুড়ায়ে, এস মা! অভিমানভরে চোলে যেওনাকো, এস মা! শূন্য সিংহাসন আলো কোরে বোসো, এস মা!

আহা আহা, মা আমার এসেছে গো এসেছে। ঐ যে ঐ বিল্বমূলে মঙ্গলঘটে সর্ব্বমঙ্গলার শুভ অধিষ্ঠান হোয়েছে গো হোয়েছে। তবে আর কেন ভাই! ঘরে ঘরে মঙ্গল-মহোৎসব আরম্ভ করিয়া দাও। তালে তালে দামামা দুন্দুভি বাজিতে থাকুক। তানে-তানে মায়ের গানে গগনমণ্ডল ছাইয়া ফেলুক। উলুউলু জয়জয় নাদে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিনাদিত হইতে থাকুক। ঘনঘন শঙ্খস্বরে মিশিয়া সেই শব্দ তুমুল হইতে তুমুলতর হইয়া উঠুক। কই, কোথায় কে আছ, দ্বারে-দ্বারে রম্ভাতরু রোপণ কর,—উভয় পার্শ্বে মঙ্গলকলসে আম্রশাখা-সহ সশীর্ষ নারিকেল স্থাপন কর। দ্বারের উপরে-উপরে এবং অলিন্দের ধারে-ধারে বন্দনমালা বিলম্বিত কর। পতাকায় পতাকায় রাজমার্গ রুদ্ধ করিয়া ফেলুক। সুগন্ধি সলিলে গৃহ-পথ সংসিক্ত হইতে থাকুক। তোরণে-তোরণে আলেয়া রাগিণীতে নহবৎ বাজিতে আরম্ভ করুক। পুরন্ধ্রীগণ! পূজার আয়োজনে ব্যাপৃত হও,—মায়ের মঙ্গল আরতির ঘৃত-কর্পূরের বাঁতি জ্বালিয়া ধূপধূনা পবিত্র গন্ধে চণ্ডীমণ্ডপ আমোদিত করিতে থাক। নর্ত্তক-নর্ত্তকি! নৃত

কর। ভট্ট-মাগধ-বন্দিগণ! স্তব পাঠ আরম্ভ করিয়া দাও। সাধকবৃন্দ! চণ্ডীপাঠের আবর্ত্তনে রসনাকে নিযুক্ত করিয়া রাখ। আর বালক-বালিকাসকল! আনন্দ-কোলাহলে চারিদিক্ মুখরিত করিয়া তুল;—বাহু তুলিয়া নাচিতে-নাচিতে তোমরাও বল আর আমিও বলি,—ঐ আমাদের মা এলো গো মা এলো,—তোমাদের মা আমাদের মা,—জগতের মা উমা এলো।

[বঙ্গবাসী ; ১৪ই আশ্বিন ; ১৩১৭ সাল।]

মাতৃ-দর্শন

সংবৎসর পরে আবার সেই আলেয়া রাগিণীর আলাপচারি আরম্ভ হইয়াছে,—আবার সেই আনন্দময়ীর আগমনী গানে গগন-পবন ভরিয়া গিয়াছে,—আবার সেই মাতৃদর্শনের প্রবল পিপাসা প্রাণের মাঝে জাগিয়া উঠিয়াছে।

আলেয়া-নামেরই কেমন গুণ,—সে একবার আলোক দেখাইয়া আবার আঁধারে ডারিয়া দেয়। আলেয়ার আলোক দপ্ করিয়া একবার জ্বলিয়া উঠে,—পথ-ভ্রান্ত পথিককে সেই আলোকে আকৃষ্ট করে, তার পর প্রগাঢ় অন্ধকারে তাহাকে নিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। রাগিণী আলেয়ারও স্বভাব তা-ই,—সে-ও অজ্ঞান অন্ধকারে অভিভূত দিগ্‌বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য পথভ্রান্ত আমাদিগকে কি-এক সুরে মোহিত করিয়া—অন্তরে কি-এক বাসনা জাগাইয়া দিয়া, মাতৃরূপের কি-এক অপ্রাকৃত আলোক দেখাইয়া দেয়, আর, সাধ মিটাইয়া দেখিতে-না-দেখিতে যে আঁধার সেই আঁধারেই ফেলিয়া দিয়া পলাইয়া যায়। সংবৎসরের মধ্যে আর তাহার দেখা পাইবার যো নাই। সংবৎসর পরে আজ আবার সেই আলেয়ারাগিণী আসিয়াছে,—তাহার মোহন-সুরে প্রাণ যেন কেমন-কেমন করিয়া উঠিয়াছে,—রূপসী মায়ের রূপের আলোক আলোকনের লোভে পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

হউক সংবৎসর আঁধারে আঁধারে অবস্থান, তিনদিনও তো আলোকের দর্শন পাই;—দুরন্ত দুঃখের ভিতর এইটুকু সুখও যে পরম লাভ। কিন্তু এ লাভে আর মন মানে না:—সে চায় এখন নিশিদিসি মায়ের মূর্ত্তি

হিয়ায় জাগাইয়া রাখিতে, সে চায় তাহার আঁধার ঘরখানি দিবা-যামিনী মায়ের আলোকে আলোকিত রাখিতে। তোমরা কেহ বলিয়া দিতে পার ভাই, মনের এ ক্ষেপামী-রোগের ঔষধ কি ?

মনের এ রোগটা ক্ষেপামী নয় ত কি,—যা হ'বার নয় তা-ই চাওয়া ক্ষেপামী নয় ত কি ? অবোধ মন বুঝে না যে, তিনটি দিনও যে মায়ের দর্শন পাস্, সে-ও সেই মায়েরই দয়ায়,—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।" (কঠ, ২।২৩) মা দয়া করিয়া দর্শন না দিলে—জপ তপ সাধন যজন কাহার সাধ্য তাঁহাকে দর্শন করায় ? কিন্তু ক্ষেপা মন কিছুতেই তাহা বুঝিবে না ; এখন আমি করি কি—তোমরা ভাই দয়া করিয়া বলিয়া দাও, এখন আমি করি কি ?

বলিব কি ভাই, আমি মনের ঔষধ জুটাইবার জন্য অনেক শাস্ত্রের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে ফল কিছু ফলে নাই। দেখিলাম,—শাস্ত্রগুলা কেবল হেঁয়ালিতেই কথা কয়, সে হেঁয়ালি-কথার ভাব বুঝা ভারি কঠিন।

হেঁয়ালি নয় ত কি ? শাস্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—মা কোথায় ? সে বলিল,—"দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ।" (মুণ্ডক উপনিষৎ ৩।১।৭) অর্থাৎ দূর হইতে অতি দূরে, আবার নিকট হইতেও অতি নিকটে। শাস্ত্রের এ কথা হেঁয়ালি নয় ত কি ? এ হেঁয়ালি কথার অর্থ কি বুঝিব ভাই ? অথচ মনেরও মাতৃ দর্শনের প্রবল বাসনা,—এখন এ ক্ষেপা মন লইয়া আমি করি কি ? তোমরাই ভাই, দয়া করিয়া বলিয়া দাও, এ ক্ষেপা মন লইয়া আমি করি কি ? তাহাকে নিশিদিসি মায়ের রূপের আলোক না দেখাইতে পারিলে সে যে আর কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছে না,—আমাকেও স্থির হইতে দিতেছে না ?

না না, পেয়েছি পেয়েছি,—মায়ের কৃপায় মনের ঔষধ যেন পেয়েছি—

পেয়েছি। হাঁ মা দয়াময়ি, তোমার দয়ায় তোমার শাসন-বাক্য শাস্ত্রের মর্ম্ম যেন বুঝেছি—বুঝেছি। হাঁ মা ব্রহ্মময়ি, সত্যই তুমি দূর হইতে অতি-দূরে, সত্যই তুমি নিকট হইতেও অতি নিকটে। যাঁহারা মা, তোমার ভক্ত, তাঁহাদেরই তুমি নিকট হইতেও নিকটে,—তাঁহাদেরই তুমি অন্তরে-বাহিরে—প্রাণে-প্রাণে নয়নে-নয়নে, আর যাহারা আমার মত তোমার ভক্তিসম্পত্তিতে বঞ্চিত—কেবল প্রাকৃত-বিষয়-ভোগেই ব্যাপৃত, তাহাদেরই তুমি দূরে—অতিদূরে, তাহাদেরই তুমি অন্তরেও নও—বাহিরেও নও—প্রাণেও নও—নয়নেও নও। তা তো হইবেই মা, তুমি হইলে প্রকৃতির অতীত—প্রপঞ্চের অতীত, প্রাকৃত প্রপঞ্চে মজিয়া থাকিলে কি আর তোমার দেখা পাওয়া যায়? তোমার ভক্ত ত প্রাকৃত প্রপঞ্চে আসক্ত নন,—তাই তোমার দেখা পান,—তাই তুমি তাঁদের নিকট হইতেও নিকটে। আর তোমার অভক্ত আমরা? আমরা প্রাকৃত প্রপঞ্চেই আসক্ত, তাই তোমার দেখা পাই না, তাই তুমি আমাদের দূরে—অতিদূরে।

মা, তবে আবার তুমি দয়াময়ী কিসের? হাঁ মা, তুমি দয়াময়ী। দয়াময়ী না হইলে কি আর মা, বৎসরান্তে তিনটী দিনের জন্যও দেখা দিতে,—বাসনা জাগাইতে? যাঁহারা তোমার উত্তম পুত্র—ভক্ত সাধক, তাঁহারা তো তোমায় অহরহ দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জন্য তো তোমায় মর্ত্ত্যে আসিতে হয় না,—আসিতে হয় আমাদের জন্য—তোমার অধম পুত্র—অভক্ত অসাধক আমাদের জন্য। ভালোছেলে আলো থাকিতে থাকিতেই আপনা-আপনিই ঘরে চ'লে যায়,—মাকে আর ডাক দিতে হয় না, দুরন্ত ছেলেই খেলায় মাতিয়া পথে পড়িয়া থাকে, শেষ, অন্ধকারে পড়িয়া হাবুডুবু খায়। তা বলিয়া দয়াময়ী মা তো আর চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না? তাই তাঁহাকে দেখা দিয়া ঘরের কথা স্মরণ

করাইয়া দিতে হয়। আহা, মায়ের আমার এত দয়া, অধম আমরা কিন্তু এ দয়ার আহ্বান তো শুনিতে পাই না—খেলাতেই ভুলিয়া থাকি, তাই মা আসিলেও মাকে দেখি না—মা ডাকিলেও তাঁহার ডাক শুনি না, যেথানে যাইলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না সেই ঘরের কথাও মনে করি না। তাই বলি মা, তোমারও দয়ার অন্ত নাই, আমাদেরও দুরন্তপণার অন্ত নাই। এই দুরন্তদের উপর যাঁর এত দয়া, সেই তুমি দয়াময়ী, নয় তো কি ?

মা, তোর কৃপায় আর একটা কথা মনে হইতেছে বলি,—বলি হাঁ মা, তত্বত তুই দূর হইতে অতি দূরে, আর নিকট হইতে অতি নিকটে, তাই তোর অধম পুত্র আমাদের আর তোতে অধিকারই নাই, তাই বুঝি মা তুই খুব-দূর ও খুব-নিকটের মাঝামাঝি প্রতিমারূপেই আমাদের দেখা দিয়া থাকিস্ ? তা না হইলে তো আর আমাদের তোকে দেখা হয় না ? আমরা খুব দূরের জিনিষ তো দেখিতেই পাই না, খুব নিকটের জিনিষও দেখিতে পাই না ; দেখিতে পাই কেবল—যাহা খুব দূরেও নয়, খুব-নিকটেও নয় এমনই জিনিষ। তাই নয় কি মা ? আমরা যে চক্ষু দিয়া দেখিয়া থাকি, সেই চক্ষুর সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকৃষ্ট—কাছাকাছি যে কজ্জল প্রলেপ—চক্ষু তাহাকে দেখিতে পায় না। কেন পায় না ?—সে যে তাহার নিকট হইতেও অতি নিকটে, তাই পায় না।

তবে কি, চক্ষু একেবারেই কজ্জলকে দেখিতে পায় না ? হাঁ পায়,—উপায় অবলম্বন করিলে। সে উপায়টাও আর কিছুই নয়, তাহাকে উল্টাইয়া লইতে পারিলেই হইল,—অর্থাৎ চক্ষুর দৃষ্টির গতিটা যে বাহিরের দিকেই স্বাভাবিক ঝুঁকিয়া আছে, তাহাকে নিজের দিকে ফিরাইয়া লইতে পারিলেই হইল। নিজেনিজে এ কাজটা তত সহজ নয়, তাই তাহার সহজ উপায় হইতেছে,—চক্ষুর সম্মুখে একখানি দর্পণ রাখা।

সেই দর্পণে যাইয়া যাই নয়ন উল্টাইয়া যায়,—নিজের দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়, অমনি সে অঞ্জনের রঞ্জন দেখিতে পায়। খুব কাছের জিনিষ দেখিবার উপায়ই এই। কেমন কি না?

আচ্ছা মা, তুই কি কেবল ভক্তেরই নিকটে, অভক্তের নয়? তা তো নয় মা,—ভক্ত অভক্ত সকলেরই তুই নিকটে। তা না হ'লে তুই ব্রহ্মময়ী কিসের? যে সব-চেয়ে বড়—সব চেয়ে ব্যাপক, সে-ই ত ব্রহ্ম? তবে আর তুই অভক্ত হ'লেও আমাদের হাত এড়াইতে পারিস্ কই? ভক্ত না হয় তোকে নিকট ক'রে নিয়েছে, আর আমরা না হয় তা পারি নাই, তা বো'লে তোর স্বভাবগুণে তুই আমাদের 'নিকটে' না রহিয়া থাকিতে পারিস্ কই?—তা তোর ব্রহ্মস্বভাবেই কি, আর স্নেহের স্বভাবেই কি? তা মা তুই এত 'নিকট' বলিয়াই তো তোকে নয়নের অঞ্জনের মত আমরা দেখিতে পাই না,—প্রকৃতির অতীত বলিয়া তো পাই-ই না। দে মা, দে—আমাদের নয়নের গতি ফিরাইয়া দে মা ফিরাইয়া দে,—বিষয়ের দিক ছাড়াইয়া নিজের দিকে ফিরাইয়া দে মা ফিরাইয়া দে;—ঐ ফিরাণো নয়ন দিয়া নয়নের মাঝেই তোর দর্শন লাভ করি। তুই কি মা, আমার এ নয়নে নাই? আছিস্ বই কি? তুই যে মা,—

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ। চক্ষুষশ্চক্ষুঃ॥"

(কেন উপনিষৎ ১।২)

কাণের কাণ, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু,—তুই না থাকিলে কি আর জড় কাণ কিছু শুনিতে পাইত, না মন কিছু ভাবিতে পারিত, না বাগিন্দ্রিয় কিছু বলিতে পারিত, না প্রাণবায়ু কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইত, না চক্ষু কিছু দেখিতে পাইত?

তা মা দয়াময়ি, বল্ এখন কেমন করিয়া এ নয়ন উল্টাই? তোর

কৃপায় বুঝিতে পারিতেছি যে,—নয়ন না উল্টাইতে পারিলে আর তোকে নিশিদিসি দেখিতে পাওয়া যাইবে না,—যে তোকে দেখিয়া দেখিয়া পাগোল হইয়া গিয়াছে, ঐ ত্রিনয়নের নয়নের ভাব দেখিয়া আর তোর ভক্তসাধকের নয়নের ভাব দর্শন করিয়া বুঝিতে পারি যে, নয়নের গতি উল্টাইতে না পারিলে আর তোকে দিবানিশি দেখিবার কোন উপায়ই নাই; কিন্তু মা, তোর অধম অসমর্থ সন্তান আমরা তাহা পারি কই? হায় মা, ইন্দ্রিয়স্থষ্টিকর্ত্তা বিধাতাই যে আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়া দিয়াছেন। তিনিই তো ইন্দ্রিয়ের গতি বাহিরের দিকে স্বাভাবিক করিয়া দিয়া তাহাদের মাথা খাইয়াছেন। তাই তো সর্ব্বান্তর্যামিনি! তুই যে আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের—মন প্রাণ সকলেরই অন্তরে-অন্তরে নিরন্তর বর্ত্তমান, আমাদের ইন্দ্রিয়গণ তো তাহা দেখায় না—দেখায় কেবল বাহিরেরই কতকি সামগ্রী। তাই তো করুণাময়ি, আমাদের এই সর্ব্বনাশ। এ কথা আমার কথা নয় মা, তোর বেদেরই কথা,—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।" (কঠ উপনিষৎ ২।১)

তা মা, বাহিরের এত প্রলোভন দিয়ে, আর সেই প্রলোভনের দিকে ইন্দ্রিয়দের স্বাভাবিক গতি দিয়ে সৃষ্টি করাটা কি সৃষ্টিকর্ত্তার ভাল কাজ হ'য়েছে? ভাল হউক, আর মন্দই হউক, আদার বেপারী আমরা, আমাদের ও জাহাজের খবরে দরকার নাই, দরকার কেবল তোর দয়ায়, আর তোকে ভালকোরে প্রাণভোরে দেখায়। দয়াময়ি, তোর দয়া বই তো আর অসমর্থ আমাদের অপর কোন উপায়ই নাই। তোর বেদ বলে,—

"কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥" (কঠ উপনিষৎ ২।১)

তা মা, আমরা ধীর নই—অমৃতত্ব লাভের ভিখারীও নই,—সুতরাং

তোর বেদের মতে তোকে দেখিবার অধিকারীও নই; তবে কি মা, আমরা "আবৃত্তচক্ষু" হইতে—চক্ষুর গতি ফিরাইতে পারিব না,—তোর অপ্রাকৃত রূপমাধুরী নয়নে দর্শন করিতে পারিব না? না না, তা-ও কি হয়,—মা তোর 'দয়াময়ী' নাম থাকিতে নয়নে দর্শন করিতে পারিব না তা-ও কি হয়? দয়াময়ি—দয়াময়ি মা আমার, তোর ঐ দয়ার আয়নাখানি একবার আমার সাম্‌নে ভাল কোরে ধর্‌ মা, আমি আমার নয়নের গতি ফিরাইয়া লই,—আর নয়ন ভোরে প্রাণ ভোরে তোকে দেখিতে দেখিতে মনের সাধ মিটাইয়া লই।

[বঙ্গবাসী; ২৬শে আশ্বিন, ১৩১৯ সাল।]

গৌর-পূর্ণিমার জয়।

"সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্"

অয়ি গৌর-পৌর্ণমাসি! আমি তোমায় বড় ভাল বাসি। তুমি এস,—আমি তোমায় আবাহন করিতেছি, তুমি এস। আমি আদরের চন্দন-চর্চ্চিত প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি করে লইয়া অন্তরে-অন্তরে তোমায় আবাহন করিতেছি, তুমি আসিবে না কি?

না না, তা-ও কি হয়,—আসিবে-না তা-ও কি হয়? তুমি তো বরষে-বরষে হরষের হাসি হাসিতে-হাসিতে এমনই দিনে আসিয়া থাক। তাই বলি, তুমি আসিবে বই কি,—তুমি এস।

অয়ি সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণে পূর্ণিমে! কেবল আমিই যে তোমাকে আবাহন করিতেছি, তাহা মনে করিও না। ঐ—ঐ দেখ, বাসন্তী প্রকৃতি ফাল্গুনের ফল্ল-ফুল-দল উপহার লইয়া তোমায় আবাহন করিতেছেন। ঐ—ঐ দেখ, কমনীয় কিশলয়ে,—প্রস্ফুটিত পলাশ-পুষ্পে,—বিকশিত শাল্মলীকুসুমে তাঁহার অন্তরের অনুরাগ ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ঐ—ঐ শুন, মধুকরের মধুর গুঞ্জনে,—কোকিলের কলকল-কূজনে,—পাপিয়ার পিউ-পিউ আলাপনে তোমারই আবাহনের মঙ্গল-সঙ্গীত উদ্গীত হইতেছে। এততেও তুমি আসিবে না কি?

গৌর-পৌর্ণমাসি! তোমার আসিবার জন্য এত আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা কেন, জান কি? আমি, একে-একে বলি শুন। তোমাকে দেখিলেই আমরা কেমন আপনাহারা হইয়া যাই। এই শোকসন্তাপের রাজ্যই যেন তখন কেমন অমিয়ময় বলিয়া বোধ হইতে থাকে। সে কি এক

আবেশে কত যে মনোহর দৃশ্য দেখিতে পাই, তাহা আর কি বলিব? প্রথমেই দেখিতে পাই,—শান্তিপুরনাথ শ্রীসীতানাথ ভক্তচূড়ামণি হরিদাসের সহিত উন্মত্তনৃত্য করিতেছেন,—আর প্রেমভরে ঘন-ঘোর হুহুঙ্কার ছাড়িতেছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যরত্ন প্রভৃতি পরম ভাগবতগণ আনন্দ-উল্লাসে মাতিয়া গিয়াছেন। ভুবনময় ভুবনমঙ্গল হরিধ্বনি উত্থিত হইতেছে। জয়জয়-উলুউলু ধ্বনিতে নদীয়া-নগরীর চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। কাংস্য-করতাল মৃদঙ্গ-মন্দিরা সহকৃত সংকীর্ত্তনের সুমধুর আরাবে ভাগীরথীর পবিত্র তীর ভরিয়া গিয়াছে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! তাহার পর আরও দেখিতে পাই,—চারিদিকেই দান-পুণ্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যে কখনও কিছু দান করে নাই, কোন্ দাতৃ-শিরোমণির প্রভাবে জানি না, সে-ও আজ মুক্তহস্তে দান করিতে বসিয়াছে। দানের কথা অধিক কি বলিব, আকাশের পূর্ণ শশী গ্রহণের ছলে আপনার সমস্ত সুধা ধরায় ঢালিয়া দিয়া—সমগ্র সংসার সুধাময় করিয়া, আপনি অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে। আজ ধরণীর যে কি মধুময় আকর্ষণ, বলা যায় না। স্বর্গের অমর-বৃন্দও স্বর্গ ছাড়িয়া মরভূমির মানুষের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া মহামহোৎসব আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। সঙ্গেসঙ্গে আরও যাহা দেখিতে পাই, তাহা প্রেমিক কবি প্রেমদাসের ভাষাতেই বলি,—

ফাল্গুন-পূর্ণিমা-নিশি, শচী-অঙ্কাকাশে আসি,
গৌরচন্দ্র হইল উদয়।
এ শশীর সহচর, ভক্ত-তারকা-নিকর,
চারিদিকে প্রকাশিত হয়॥
পাপ ঘোর অন্ধকার, সর্ব্বত্র ছিল বিস্তার,
বিধূদয়ে প্রস্থান করিল।

জীবের ভাগ্য-কুমুদ, হেরি শশী মনোমদ,
প্রেমানন্দে হাসিতে লাগিল॥
পাপ অমানিশি ভোর, হরষে ভক্ত-চকোর,
তুলিল আনন্দ-কোলাহল।
প্রেম-কৌমুদীর সুধা, পীয়ে দূর কৈল ক্ষুধা,
সবাই হইল সুশীতল॥

তাই বলি, অয়ি গৌর-গরবে গরবিণি ফাল্গুনপৌর্ণমাসি! তুমি আর বিলম্ব করিও না;—সত্বর আগমন কর। আমরা তোমার প্রতি পল-বিপল প্রতি দণ্ড-মুহূর্ত্ত মণিমাণিক্যে বিভূষিত করিয়া দিব,—তোমার জয়জয়-নাদে বিশ্বব্যোম পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিব,—আর ঐ গৌর-বিধুর সুধা পান করিয়া অহরহ বিভোর হইয়া রহিব। পৌর্ণমাসি! তুমি এস।

ভাই! তোরা জয় দেগো জয় দে;—আমার গলায় গলা মিলাইয়া আমার গৌরপূর্ণিমার জয় দেগো জয় দে। আয়—আয় ভাই! আমি বলি, আর তোরাও বল,—জয় গৌরপূর্ণিমার জয়,—জয় গৌরপূর্ণিমার জয়,—জয় গৌরপূর্ণিমার জয়।

[পল্লীবাসী; ১৯শে ফাল্গুন; ১৩১৫ সাল।]

গৌর এলো

গৌর এলো গো গৌর এলো। তোদের গৌর মোদের গৌর,—তোদের-মোদের গৌর এলো। ঐ শুনিতেছ না,—উলু-উলু হরি-হরি ধ্বনিতে ধরণীর এক ধার হইতে অপর ধার পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে? ঐ দেখিতেছ না,—অতি বড় প্রামাণিক জনও শিশুর সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া, আনন্দ-বাজনা আনন্দ-নাচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে? নদীয়ার এ আনন্দ নদীয়াবিনোদ না আসিলে আর হইতে পারে কি? তাই বলি,—আমার গৌর এলো।

ধন্য ছেলে যা হো'ক; নাম-বিলোবার প্রেম-বিলোবার গুরু কি না, তাই আপনি আসিবার আগে থেকেই নাম-বিলানো প্রেম-বিলানো সুরু কো'রে দিয়েছে। তা না হ'লে আজ ন'দেবাসীর হৃদেহৃদে সমবেদনার ভাব কে জাগাইল? সকলের কণ্ঠকে এককণ্ঠই বা কে করিয়া দিল? হিংসা-দ্বেষের বিষের অনল শান্তিসলিলে কে নিবাইল? এ ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে কোলাকুলি, গলা-জড়াজড়ি, চুমো-খাওয়া-খাওয়ীই বা কাহার ইঙ্গিতে আরম্ভ হইল? তাই ধাতধরণ দেখে ধারণা হয়,—আমার প্রাণের গৌরই এলো।

প্রবীণা নদীয়া-নগরীর বেশের বাহার,—বাসন্তী প্রকৃতির প্রফুল্ল ফুলভার,—মত্ত-মধুকরের সুমধুর গুঞ্জন,—কোয়েল-দোয়েলের কলকল কূজন—পূর্ণিমা-যামিনীর নিরুপম সুষমা,—সুর-তরঙ্গিণীর তরতর-তরঙ্গ-ভঙ্গিমা দেখিয়া-শুনিয়াও ওই কথাই মনে হয়,—ওই—ওই—গৌর নাগর এলো।

শুধু কি তাই-ই; ঐ যে ঐ জগন্নাথ মিশ্রের বাটীর দিকে একবার তাকাইয়া দেখ দেখি,—ও কিসের এত শান্ত-শীতল বিমল আলো উঠেছে? এ আলো তো সামান্য আলো নয়;—এ যে কেবল নদীয়ার কেন, অখিল জগতের ভিতর-বাহিরের আঁধার-হরা আলো ব'লেই বোধ হ'চ্ছে। আর ঐ যে মানুষের মেলে কোটীকোটী জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি—কোন্ দেশের কা'রা কেবল এ'সে এ'সে আপন মনে নাচ্‌ছে গাইছে, স্তবস্তুতি ক'চ্ছে, ধূলায় প'ড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে, দণ্ডবৎ-প্রণতি ক'চ্ছে; ওদের ওই ধারা দেখে দিশেহারা হ'তে হয় না কি? আর প্রাণের ভিতর হ'তে আপনা-আপনি সাড়া দেয় না কি;—মিশ্র জগন্নাথের গৃহে সর্ব্বজগতের নাথ গৌর এলো,—শচীমাতার কোলে শচীনাথের নাথ নিমাই এলো।

এলো এলো, তা ন'দেয় কেন? তা-ও বলি শুন। এতো কালো কানু নয় যে, রাজ্যের কালো খুঁজে-খুঁজে ব্রজে গিয়ে জন্ম নেবে? এ যে রাই-কানু-মিলিত-তনু—অতনুর দর্প-হরা, গৌরাঙ্গীর বর্ণ-ধরা গৌর-তনু! তাই সেই ভরা ভাদ্রের কালো মেঘ, কারাগারের কালো অন্ধকার, কালো-পক্ষের কালো রাত্রি, কালো বন, কালো যমুনা ছেড়ে-ছুড়ে ন'দেয় এসে উদয় হ'য়েছে। এখানকার চারি দিক্‌টা একবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দেখি—স্থল জল অন্তরীক্ষ আজ গৌরবর্ণে পরিপূর্ণ কি না? ঐ দেখ, জোছনা-মাখা আকাশের গায় গৌর-বর্ণ, বৃক্ষ-বল্লরীতে গৌরবর্ণ, বিহঙ্গের অঙ্গে গৌর-বর্ণ, গঙ্গা-তরঙ্গে গৌর-বর্ণ, ধরিত্রীর গাত্রে গৌরবর্ণ, কাঁচা সোণার তরল-রসে যেন চারি দিক্‌টাই চুবান! বলি হাঁ ভাই!—ব্রাহ্মণ শচী-জগন্নাথও ত গৌরবর্ণ? কালো কানাই কালো দেখেই বৃন্দাবনে জন্মেছিল—আর গৌরাঙ্গ আমার আগাগোড়া গোরা দেখে এই গৌড় দেশে ন'দেয় এসে উদয় হ'ল। কেমন কি না?

এর আর একটা কারণও মনে হয়। গৌর আমার চুরির দায়ে

দেশান্তরী। তোমরা হয় ত জান না; ও চোর গো চোর,—ভারি চোর। সেই ছেলে-বেলায় মা-যশোদার মাখন-চুরি থেকে ও'র চুরির কারবার সুরু; তার পর পূতনার প্রাণ-চুরি, ব্রজ-বালার বসন চুরি, যে দেখে তার নয়ন-চুরি মন-চুরি, প্রণতের পাপ-চুরি প্রভৃতি ক'রে ক'রে বেশ হাতটা পাকিয়ে নিয়ে, কর্ তো কর্ একেবারে চুরি নয় ডাকাতি—শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর প্রেমের গুপ্ত ভাণ্ডারটাই লুট! এই চুরি আর ছাপা থাক্‌লো না; মুখে মুখে প্রচার হ'য়ে প'ড়্‌লো। তখন আর তথায় টেঁকা দায়। তাই একেবারে গা ঢাকা দিয়ে স'রে প'ড়তে হ'লো, পশ্চিম দেশ থেকে একেবারে পূর্ব্ব দেশ। দেশান্তরী হ'য়েও রক্ষা নাই। সদাই ভয়, পাছে কেউ চিনে ফেলে। তাই একেবারে সব ওলোটপালোট ক'রে ফেল্‌তে হ'লো,—ছিল কালো, হ'তে হোলো গৌর,—ছিল বাঁকা, হ'তে হোলো সোজা,—ছিল চাঁচর চুল, হ'তে হোলো নেড়া,—ছিল বংশীধারী, হ'তে হোলো দণ্ডধারী,—ছিল গোয়ালা, হ'তে হোলো বামুন। কালোর নাম গন্ধ আর রাখ্‌লে না—কালোর উল্টো গৌর সেজে ব'স্‌লো! ব্যাপারখানা বুঝ্‌লে কি?

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধিকার প্রেম ত যেমন তেমন নয়? সেই প্রেমের ঝাঁজেই আজ নদীয়া-বাসীর অন্তরে-অন্তরে আনন্দ উল্লাস, মুখে-মুখে মঙ্গলগীতি মুখরিত,—হরি-হরি-জয়-জয় নাদে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রপূরিত। এত দেখে এত শুনেও বলিতে হয় না কি ভাই!—ওই আমাদের গৌর এলো। তোদের গৌর, মোদের গৌর—তোদের মোদের গৌর এলো।

[পল্লীবাসী; ৯ই চৈত্র; ১৩১৬ সাল।]

শ্রীশ্রীহোলী-লীলা।

আনন্দের স্বভাবই লীলা। আনন্দ কাহাকেও স্থির হইয়া থাকিতে দেয় না। যেখানে আনন্দ যত বেশী, লীলা-খেলাও সেখানে তত বেশী। শিশুর প্রাণে আনন্দ আছে বলিয়াই না সে শতশত নূতন খেলার অবতারণা করিয়া তাহাতেই অহরহ মাতিয়া রহে? শৈশবের সীমা অতিক্রম করার সঙ্গেসঙ্গেই সংসারের সুতীব্র তাপে শিশুর সে আনন্দ শুকাইয়া আসিতে থাকে, লীলাখেলাও ক্রমেক্রমে কম হইয়া পড়ে। ভগবান্ আনন্দময়। তাঁহার আনন্দ কখনও কম হইবার নহে। তাই তাঁহার লীলা-খেলারও বিরাম নাই। তিনি সর্ব্বদাই একটা-না-একটা লীলা-খেলায় মাতিয়া আছেনই আছেন।

লবণসমুদ্রে শত-শত তরঙ্গ সতত সমুত্থিত হইতেছে। সে তরঙ্গের রঙ্গগত পার্থক্য যতই থাকুক না কেন, তাহার লবণময় আস্বাদন সর্ব্বত্রই সমান। আনন্দের অপার মহাসাগর ভগবান্। সেই সাগরে যে-কোন লীলা-তরঙ্গ উঠুক না কেন, তাহা নিরাবিল আনন্দেই পরিপূর্ণ। তাই ভগবানের লীলা আস্বাদনে ভক্তের এত আনন্দ। তরঙ্গময় সমুদ্রের আস্বাদন ও তরঙ্গের আস্বাদন যেমন এক, লীলাময় ভগবানের আস্বাদন আর তাঁহার লীলার আস্বাদনও তেমনই এক। লীলা দিয়া ভগবান্‌কে ধরা আমাদের পক্ষে বরং সহজ। কিন্তু লীলা ছাড়িয়া তাঁহাকে ধরিতে গেলে তিনি অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয়—কি এক সামগ্রী হইয়া পড়েন; তখন তাঁহাকে ধরা বড় যার তার কার্য্য নয়। আমরা তো তাহার ধার দিয়াও যাইতে পারি না। তাই তাঁহার লীলার অনুশীলনই আমাদের একমাত্র ভরসার স্থল। শাস্ত্রেও তো দেখিতে পাই,—

"সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলা-কথা-রস-নিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধ-দুঃখ-দবার্দ্দিতস্য॥" (ভাগবত ১২।৪।৪০)

তাই ইচ্ছা হয়, ভগবানের লীলা একটু আলোচনা করি। শ্রীশ্রীহোলী লীলা,—লীলাময়ের অন্যতম লীলা। তাহারই কথা কিছু বলিব। এখন তো আর অন্য কোন লীলার কথা বলা যায় না। বলিলেই বা শুনিবে কে? ঐ দেখিতেছ না, চারিদিকেই 'ছ্যারা-রা-রা কবীর' রবের ধুম পড়িয়াগিয়াছে। ঐ দেখিতেছ না, আবাল-বৃদ্ধ সকলে ডম্ফ বাজাইয়া লম্ফ দিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ঐ দেখিতেছ না, আবীর-গুলালে চারিদিক লালেলাল হইয়া গিয়াছে। এখন কি আর অন্য লীলা বর্ণনা করা চলে, না—বলিতেই আছে?

মধুর বৃন্দাবন। মধুর বসন্তের নব সমাগমে তাহার মাধুর্য্য যেন আরও অধিক বাড়িয়া গিয়াছে। চারিদিকেই মাধুর্য্যের ছড়াছড়ি। বৃক্ষ-বল্লরীর নবনব কিসলয়-কুসুমে,—কুঞ্জেকুঞ্জে মঞ্জুল ভ্রমর গুঞ্জনে;—কোকিলের কুহুকুহু তানে,—পাপিয়ার পিউপিউ গানে,—শুক-শারিকার সরস সংলাপনে, ও ময়ূর-ময়ূরীর উন্মত্ত-নর্ত্তনে সে মাধুর্য্যের পূর্ণ বিকাশ। মাধুর্য্যের এই মাহেন্দ্রযোগে মাধুর্য্যের মূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মধুর অধরে মধুর মুরলী লইয়া মধুর বসন্তরাগ আলাপ করিতে লাগিলেন। মধুর মুরলীর স্বর-লহরী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মাধুর্য্যরসে আপ্লুত করিয়া ফেলিল। কিন্তু কি জানি কেন বংশীর এ বাজনা যেন ব্রজযুবতীগণের কর্ণেই কিছু অধিক বাজিল। ধ্বনি শুনিয়া সকল ধনীই চঞ্চলচরণে বংশীবদন নন্দনন্দনের উদ্দেশে উধাও হইয়া ছুটিলেন।

ব্রজনাগর দেখিলেন, তাঁহার বংশীবাদন সার্থক হইয়াছে। বংশীর

আকর্ষণমন্ত্রে কুল-ভয়-লাজে জলাঞ্জলি দিয়া গোপীগণ তাঁহার সমীপে আগমন করিয়াছেন। দেখিয়া নাগর হাসিতেহাসিতে বলিতে লাগিলেন,—তোমরা কে গা, বলা নাই, কহা নাই, অমনই যে বনের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিতেছ? তোমরা জান নাকি, ঋতুরাজ বসন্তের আদেশে আমি এই বন রক্ষা করি, আমার আদেশ না লইয়া কাহারও এ বনে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই।

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া গোপিকাসকলে হাস্য করিতে করিতে কহিলেন,—ওমা লাজে মরি মা, লাজে মরি,—

"বস্ত্রচুরী গো-রাখালী তরণী-বাহন।
বাকী নাই—হইয়াছে সকল করণ॥
একমাত্র বনের রাখালী বাকী ছিল।
মরিমরি ভাগ্যে বুঝি তাহাও ঘটিল॥"

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ছি ছি, কটু কথা কহিও না, কটু কথা কহিও না। আপন কার্য্যসিদ্ধির জন্য তুচ্ছ কর্ম্ম তো সকলকেই করিতে হয়। স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য দেবরাজ ইন্দ্র পুরঞ্জয়রাজার বাহন হইয়াছিলেন, রঘুনাথও বনের বানরের সহিত সখ্য করিয়াছিলেন। বনের রাখালী কি তাহার কাছে নিকৃষ্ট কর্ম্ম?

গোপীবৃন্দও পিছপাও হইবার নন, তাঁরাও জবাব দিলেন,—ভালই কথা, ইন্দ্র তো ধনের জন্য বৃষ হইয়াছিলেন, রামচন্দ্রও জানকীর জন্য কপির সহিত সখ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি বনের রাখালী করিয়া কি ধন লাভ করিবে?

কানাই কহিলেন,—তোমরা গোয়ালিনী বই তো নয়, বনের রাখালীর লাভের কথা কি করিয়া বুঝিবে বল? এতে কত লাভ, তাহা বলি শুন,—

"এই বনে যে তুলিবে পত্র ফুল ফল।
কাড়ি নিব তার শাড়ী ভূষণ সকল॥
তার মধ্যে যদি কোন নারী লাগে মনে।
তাহারে রাখিব লয়্যা নিকুঞ্জভবনে॥"

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া সকলেই 'হো হো' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ললিতাও দু'চার কথা মিষ্টি মিষ্টি শুনাইয়া দিলেন। উভয় পক্ষে কিছুক্ষণ কথা-কাটাকাটি চলিল। অবশেষে শ্রীরাধিকা বলিলেন,—রাইকানু না-কি অভিন্নতনু, তাই তিনি নাগরের ভাব বুঝিয়াই বলিলেন,—সই, শ্যামের বচন সকলই মিছা। ও কথা আমরা শুন্‌তেই চাই না। এই দেখনা কেন,—

"সুরপতি জয় করি রণে।
পাইছিলা অসুরের ধনে॥
শ্যাম আমাদিগে না জিনিয়া।
পাইবেন ধন কি করিয়া॥
হোলীখেলা করি মোসবারে।
যদ্যপি পারেন জিনিবারে॥
তবে আশা যে করেন শ্যাম।
সিদ্ধ হইতে পারে সেই কাম॥
যদি মোরা জিতি হোরী খেলি।
কাড়ি নিব শ্যামের মুরলী॥"

কিশোরীর কথা শুনিয়া সকল সখীই সমস্বরে 'ভাল ভাল' করিয়া উঠিলেন, আর আমোদ করিয়া হোলীখেলা আরম্ভ করিয়া দিলেন। খেলায় দুইটি দল হইল। এক দলে একা শ্রীকৃষ্ণ, অপর দলে গোপী সকল। প্রথমে দুই দলে আবীর লইয়া লড়াই চলিল। আবীরে

আবীরে চারি দিক অন্ধকার হইয়া পড়িল। একা কৃষ্ণ, শত-শত গোপিকার সহিত কতক্ষণই বা যুঝিতে পারেন? তিনি সুন্দরীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—তোমাদের এ যুদ্ধ ন্যায়যুদ্ধ নয়। আমি হইতেছি একা, আর তোমরা হইতেছ অনেক। ইহাকে কি ন্যায়যুদ্ধ বলিব? তখন শ্রীমতী ললিতা বলিয়া উঠিলেন—বেশ, একে-একেই যুদ্ধ করা যাউক, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তাহাতেও যদি তুমি কাহাকেও হারাইতে পার, তবে তোমার ব্রজে গিয়া মুখ দেখাইবার একটা পথ থাকে।

তখন নন্দনন্দন বলিলেন,—আমি একএকজনের সঙ্গে পৃথক্‌পৃথক্ কতক্ষণ ফাগুযুদ্ধ করিব? তাহার অপেক্ষা তোমরা এক কার্য্য কর, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রধানা, তিনিই আসিয়া আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন। তাঁহার জয়ে সকলেরই জয় হইবে; আর পরাজয় হইলে সকলেরই পরাজয় হইবে।

নাগরের কথা শুনিয়া সকলেই বলিলেন,—বেশ বেশ; বৃষভানু-নন্দিনীই হইতেছেন আমাদের সকলের প্রধানা, তাঁহারই সহিত তুমি সংগ্রাম কর। তাঁহার হারেই আমাদের হার, আর তাঁহার জয়েই আমাদের জয়।

তাহাই সাব্যস্থ হইয়া গেল। তখন,—

"সখীর বচন, করিয়ে শ্রবণ,
কিশোরী সুখিত-হিয়া।
মৃদুমৃদু হাসি, বান্ধিলেন কসি,
কেশপাশে ডোরি দিয়া॥
কিবা সে মধুর বেশ।
উত্তরী-অঞ্চলে, বান্ধি কুতূহলে,
দৃঢ় করি মধ্যদেশ॥

আবীরে করিয়া, অঞ্চল ভরিয়া,
কুম্‌কুমা লইলা তাতে।
ফুলগেঁড়ু কত, নিলা শত শত,
ফুলধনু বাম-হাতে॥
তেন বেশ দেখি, কানু হয়্যা সুখী,
ভাবিছেন মনেমনে।
কামের ঘরণী, আইলা ধরণী,
যুঝিবারে মোর সনে॥"

শ্রীরাধিকার সমরসজ্জা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেন একটু থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু সমরক্ষেত্র ছাড়িতে পারিলেন না। তাঁহাকে সমরেই প্রবৃত্ত হইতে হইল। রাই-কানুর ফাগুযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। সখীরাও চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া গীতবাদ্য যুড়িয়া দিলেন। দুইজনের আবীরে-আবীরে আকাশ-মেদিনী, বৃক্ষ-বল্লী, তৃণ-গুল্ম, পশু-পক্ষী সকলেই লালে-লাল হইয়া পড়িল। তাহার পর উভয়ে কুঙ্কুম ও ফুলগেঁড়ু লইয়া ছোড়াছুড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাহার পর পিচ্‌কারী লইয়াও গন্ধবারির সমর আরম্ভ হইয়া গেল। দেখিয়া সখীগণ আনন্দে নিমগ্ন হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—

"দেখ দেখ অদভুত সব সহচরি।
জলদ-চপলা দোঁহে বর্ষে দুঁহু'পরি॥
মেঘে বৃষ্টি করে জল—দেখি সব ঠাঁই।
সৌদামিনী বর্ষে জল—কভু শুনি নাই॥"

রাধা-শ্যাম উভয়েই সমান। কেহই হারিবার পাত্র নহেন। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া উভয়েই শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। গন্ধজলে ও ঘর্ম্মজলে উভয়ের বসন ভিজিয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়া সখীগণ বলিতে

লাগিলেন,—বুঝিলাম এ যুদ্ধে তোমরা উভয়েই সমান। অতএব তোমরা উভয়েই আমাদের সম্মানের পাত্র। এই নাও—শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া উভয়ে এই দোলায় আরোহণ কর। আমরা আমাদের মনোমত সেবা করিয়া কৃতার্থ হই।

সখীর বচনে সন্তোষ লাভ করিয়া কিশোরকিশোরী শুষ্ক বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক দোলায় আরোহণ করিলেন। সে দোলার বাহারই বা কত,—লীলারই বা মাধুরী কত!

"কিবা সেই দোলা হয় সুবর্ণ রচিত।
সিত-রক্ত-নীলবর্ণ-মণিতে খচিত॥
দোলে কত তাহে মুক্তা-কুসুম-ঝালর।
সুচিত্রিত চন্দ্রাতপ বালিশ বিস্তর॥
নানাবর্ণ-পট্টডোরী বদ্ধ চারি-পায়।
সখীগণ দুইদিকে থাকিয়া দোলায়॥
কিবা শোভে দোলার-উপরি রাই-শ্যাম।
বিমানের উপরিতে যেন রতি-কাম॥
সখীগণ পুষ্পবৃষ্টি ফাগুবৃষ্টি করে।
কিশোরী-কিশোর-গুণ গায় উচ্চস্বরে॥"

সখীগণের সঙ্গীতধ্বনিতে তখন চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। ময়ূর-ময়ূরী কেকারব করিতে-করিতে নৃত্য জুড়িয়া দিল। কোকিল-পাপিয়া দহিয়াল-শ্যামা প্রভৃতি পাখীগণ আনন্দকলকলে কাননভূমি মাতাইয়া তুলিল। আনন্দময়ের সেই আনন্দলীলা দর্শনে সকলেই আনন্দময় হইয়া উঠিল।

ভাইসব! তোমরা একবার এই আনন্দদৃশ্য দেখিবে না কি? এই নয়ন-জুড়ানো মন-মাতানো দৃশ্য যদি দেখিতে হয় তো একবার

বাহিরের নয়ন মুদিয়া ফেল। বাহিরের আলোক নিবাইলেই ভিতরের আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। সেই আলোকে পলক-হীন প্রেম-চক্ষে দেখ,—ঐ—ঐ দেখ,—

"দোলার উপরি, কিশোর-কিশোরী,
দুইজন শোভা পায়।
হেম-ধরাধর,— মাথে জলধর,—
বিজুরী যেমন ভায়॥
কিবা দোলে শ্যাম-রাই।
নীল-উতপল, হেম-শতদল,
যেমন পবন পাই॥
যবে ঘনেঘন, গমনাগমন,
করে দোলা বেগবলে।
তবে ভয় পাই, পসারিয়া বাই,
রাই ধরে শ্যাম-গলে॥
তাহা দেখি সুখে, মৃদু হাসি মুখে,
ললিতাদি সখী সব।
করে ঘনেঘন, কুসুম-বর্ষণ,
আর জয়জয় রব॥
ঢুলায় চামর, উড়ায় আতর,
গোলাব আবীর রোরী।
শ্রীরঘুনন্দন, করয়ে ভাবন,
সেই শোভা মনোহারী॥"

[বঙ্গবাসী; ২২শে ফাল্গুন; ১৩১৫ সাল।]

শ্রীশ্রীদোল-লীলা।

দোওল্ দোল্—দো-দোল্ দোল্,—নন্দদুলাল! তুমি দুল'।

দুলিবে না,—আজ যে তোমার দুলিবারই দিন,—দুলিবে না? দুল'—দুল'—নন্দদুলাল! তুমি দুল'।

তুমি স্বেচ্ছাময়! যাঁহারা তোমার 'স্ব'—আপনার লোক, তাঁহাদের ইচ্ছার অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাক বলিয়াই 'স্বেচ্ছাময়।' সেই তোমার আপনার লোক যাঁহারা, তাঁহারাই আজ তোমাকে দুলাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, তুমি কি না দুলিয়া থাকিতে পার? দুল' দুল',—নন্দদুলাল! তুমি দুল'।

মাঝে মাঝে এরূপ দোলন-খেলন না খেলিলেই বা তোমার আরাধকের মর্য্যাদাবর্দ্ধন আমাদের নয়নে পড়িবে কেন? আর তাহা না পড়িলেই বা আমরা তোমায় ভজিতে যাইব কেন?

কথাটা একটু খুলিয়াই বলি। তোমার নিজের কথায় তুমি বলিয়া থাক,—তুমি সর্ব্বভূতে সম,—তোমার কেহ দ্বেষের পাত্রও নাই, আর কেহ প্রীতির পাত্রও নাই। তুমি আপনা হইতে কাহারও দিকে ভালবাসায় ঢলিয়া পড়না, আবার বিরাগ-ভরে কাহারও নিকট হইতে তফাৎ হইয়াও পড়না। সেই তুমিই আবার বলিয়া থাক যে,—যাহারা তোমায় ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করিয়া থাকে,—ভালবাসার প্রবল স্রোতে গা ভাসাইয়া তোমাতে যাইয়া মিলিত হয়, তুমি আপনা হইতে তাহাদের সহিত মিলিত না হইলেও, ফলে তাহাদের সহিত মিলিত না হইয়া থাকিতে পার না। কেন না, তাহারা যে তোমাতেই মিলিত হইয়াছে।

এই মিলন তুমি আনন্দসহকারেই অভিনন্দন করিয়া থাক। এ মিলন আর তোমার প্রত্যাখ্যান করিবার যো নাই।

নন্দদুলাল হে, আমরা তোমার তত্ত্ব বুঝি আর না-ই বুঝি, কিন্তু একটা কথা মনে হয়, এই মিলন তোমার বড় ভাল লাগে। এই মিলনের আকাঙ্ক্ষাতেই বোধ হয় তোমার সর্ব্ব-আকর্ষণ 'কৃষ্ণ'-নাম ধারণ।

কৃষ্ণ হে, কিসের আকর্ষণে এ সংসারের সকলেই পরিভ্রমণ করে? এক কথায় বলিলে বলিতে হয়—আনন্দের। তোমার মায়ায় মুগ্ধ অবোধ জীব 'আনন্দ চাই' কেবল এই টুকুই বুঝিয়া থাকে, কিন্তু সকল আনন্দের মূল কেন্দ্র কোথায়, তাহা জানে না। তাই প্রাকৃত রূপ-রসাদি বিষয়কেই আনন্দের উপাদান বলিয়া বুঝিয়া থাকে। ফলে প্রকৃত আনন্দ লাভে বঞ্চিতই হইয়া থাকে।

কৃষ্ণ হে, শাস্ত্র বলেন,—তুমিই সেই আনন্দময়। তুমিই সেই আনন্দের মূল কেন্দ্র। তোমার অপার অতলস্পর্শ আনন্দ-বারিধির সামান্য যৎকিঞ্চিৎ অংশ লইয়াই এ জগতের যাহা কিছু আনন্দের ভারিভূরি।

কৃষ্ণ হে, কেবল শাস্ত্রের কথা কেন, তোমার ঐ শ্যামলসুন্দর ত্রিভঙ্গভঙ্গিম নর্ত্তন-নিরত হাস্য-প্রফুল্ল শ্রীমূর্ত্তিই বলিয়া দেয় যে, তুমিই সেই 'আনন্দময়'। শাস্ত্রের কথায় তুমি—'আনন্দঘন', কি না—মূর্ত্তিমান্ আনন্দ। তরল আনন্দের মূর্ত্তি নাই। তরল ভাব ঘনীভূত হইয়াই মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। তরল দুগ্ধে মূর্ত্তি গড়া যায় না, তাহাকে ঘন করিয়া ক্ষীর করিলেই মূর্ত্তি গড়া যায়। তরল জলে মূর্ত্তি গড়া যায় না, ঘন জমাট জলে—বরফখণ্ডেই মূর্ত্তি গড়া যায়। তুমিও আনন্দঘন—আনন্দের মূর্ত্ত্য বিগ্রহ। তরল আনন্দ ব্রহ্মের মূর্ত্তি নাই, মূর্ত্তিমান্ আনন্দ বা আনন্দঘন তুমি সেই ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়স্থান। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং"—এ তো তোমারই শ্রীমুখের কথা। বাস্তবিক

তোমার মূর্ত্তির বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, তাহার ভিতর-বাহিরে আনন্দছাড়া আর কিছুই নাই। যেমন সৈন্ধবঘন,—সৈন্ধবে গড়া মূর্ত্তি। তাহার ভিতরে-বাহিরে সৈন্ধব ছাড়া আর কিছুই নাই। তোমার ওই মূর্ত্তির ভিতরে-বাহিরে আছেই বা কি? আছে কেবল—নাচ গান হাসি, আর মধুর মধুর বাঁশি, আর মোহন রূপ-রাশি! এ সকলেই তো সেই আনন্দেরই অভিব্যক্তি। আর আনন্দের রূপ দিতে গেলে এইরূপ মূর্ত্তিই তো ফুটিয়া উঠে?

কৃষ্ণ হে, ইহসংসারে লোক যখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তখন করেই বা কি? সে সহজ চালে চলিতে পারে না, চলে নাচিয়া নাচিয়া। সে সহজ কথায় কথা কহিতে পারে না, কথা কয়—সঙ্গীতের তানে তানে। আর হাস্যের লহরী তো তাহার অধরপ্রান্তে খেলিয়াই বেড়ায়।

কৃষ্ণ হে, তুমি যেমন আনন্দময়, তেমনই করুণাময়। তাই করুণা করিয়া তোমার প্রতি আমাদিগকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিয়া থাক। তোমার ওই অধর-সংলগ্ন মুরলী তো সেই আকর্ষণ-মন্ত্রই প্রচার করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা আবার এখানকার মায়িক কোলাহলে এমনই বধির হইয়া আছি যে, তোমার সে আকর্ষণ-মন্ত্র শুনিয়াও শুনি না, বুঝিয়াও বুঝি না।

বহু ভাগ্যবলে যাহারা সংসারের কোলাহল কাটাইয়া সেই আকর্ষণমন্ত্র স্থিরভাবে শুনিতে পায় এবং সেই-ধ্বনি ধরিয়া লজ্জা-ধর্ম্ম কুল-শীল মান-অপমান সকল ভুলিয়া উধাও হইয়া তোমার উদ্দেশে ধাবিত হয়, তাহারাই—সেই ভাগ্যবানেরাই তোমার সহিত মিলিত হইতে পারে। আর তাহারা তোমাতে মিলিত হয় বলিয়াই তুমিও তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া থাক।

রাধানাথ, আজ তুমি যাঁহাকে বুকে লইয়া সোহাগভরে দোলন খেলা

খেলিতেছ, উনি আর কেহ নহেন; উনি তোমার আরাধিকা রাধিকা। যাঁহারা তোমার ওই বাঁশরীর আকর্ষণ-মন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া—কুল-শীল আত্মীয়-স্বজন লজ্জা-ভয় সকল ছাড়িয়া তোমার উদ্দেশে পাগলিনীর মত ছুটিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তোমার আরাধনায় সিদ্ধা বলিয়াই ইনি—'রাধা'। আর, সকল ছাড়িয়া সর্ব্বতোভাবে ইনি তোমার সহিত মিলিত হইয়াছেন বলিয়াই আজ তুমি ইঁহাকে বুকে লইয়া দোলনখেলা জুড়িয়া দিয়াছ। ভালই করিয়াছ,—আপন কথা সার্থকই করিয়াছ। দুল' দুল' নন্দদুলাল! তুমি দুল'।

রাধানাথ, তুমি যেমন আনন্দময়, তোমার ধাম বৃন্দাবনও তেমনই আনন্দময়। তবে যে-চক্ষে তোমাকে বা তোমার ধামকে দেখিতে হয়, সেই প্রেমাঞ্জন-রঞ্জিত ভক্তিচক্ষে দেখি-না বলিয়াই আমরা তোমাকে যেমন প্রাকৃত নায়ক বলিয়া বুঝিয়া থাকি, সেইরূপ তোমার ধামকেও প্রাকৃত ভূমি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসি। যে সকল ভাগ্যবান্ ওই নির্ম্মল নয়ন দিয়া তোমার ধামকে দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেখেন কি? দেখেন,—

> "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
> দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
> কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
> চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥"
>
> (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৫৬)

তাঁহারা দেখেন,—শ্রীবৃন্দাবনের সকল রমণীই লক্ষ্মীস্বরূপিণী। তথায় পুরুষ—একমাত্র পরমপুরুষ তুমি। সকল বৃক্ষই কল্পবৃক্ষ। ভূমি নয়,—চিন্তামণি। জল নয়,—অমৃত। যে কথা সেই গান। যে চলন সেই

নাচন। বংশী প্রিয়সখী। তথাকার চন্দ্রাদি জ্যোতিঃপদার্থ সমস্তই চিদানন্দস্বরূপ এবং রস-গন্ধাদি আস্বাদনের সামগ্রীও তাহাই। কেননা, তাহারা সকলেই যে 'পর',—পরমেশ্বর তোমারই অংশভূত।

ভক্ত তুলসীদাস যে-নয়নে বৃন্দাবন দেখিতে হয়, সেই নয়নে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই দোঁহায় বলিয়া গিয়াছেন,—

"শ্রীবৃন্দাবন ঔর গোলোক তৌলে তুলসীদাস।
যো ভারী হুয়া উহ রহগয়ে, হাল্‌কি চঢ়ে আকাশ॥"

দাঁড়ি পাল্লায় যাহা কিছু ওজন করিতে যাইবে, দেখিবে,—যে পাল্লা ভারী হয়, সেই পাল্লাই নীচে নামিয়া পড়ে এবং যে পাল্লা হাল্কা হয়, তাহাই উপর দিকে উঠিয়া যায়। তুলসীদাস শ্রীবৃন্দাবন এবং গোলোক দাঁড়ি পাল্লায় চাপাইয়া ওজন করিয়া দেখিলেন যে, গোলোকের পাল্লা উপরে উঠিয়া গেল এবং বৃন্দাবনের পাল্লা নীচে নামিয়া পড়িল। তাহাই তো হইবার কথা। তুমি আমি না বুঝিলেও যে এই ভৌম বৃন্দাবনেরই গুরুত্ব অনেক অধিক।

এই বৃন্দাবন আনন্দের ধাম বলিয়াই এখানে আনন্দময়ের নিত্যই নব নব লীলার অনুষ্ঠান; আজিকার এই দোলন-খেলাও সেই লীলার অন্যতম। এই লীলার জন্যই বাসন্তী প্রকৃতি আজ ফুল্ল ফুলদলে মনের মত করিয়া শ্রীবৃন্দাবনকে সাজাইয়াছেন। শুক-সারী ময়ূর-ময়ূরী কোয়েল-দোয়েল সকলেই আজ কি এক আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। শ্রীরাধারাণীর সহচরীবৃন্দও আজ মৃদঙ্গ-মন্দিরা বীণা-তানপুরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে কি এক মধুর নর্ত্তন-কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, কেহ বা কুঙ্কুম ছুড়িয়া, কেহ বা পিচকারীর বারি ছুটাইয়া, কেহ বা উভয় হস্তে আবীর উড়াইয়া চারি দিক্ লালে-লাল করিয়া ফেলিয়াছেন। জানি না, অনুরাগের লাল জমির উপর রাধাকৃষ্ণের রঙ্গিন লীলা ভাল

খুলে বলিয়াই এত আবীর কুঙ্কুমের ছড়াছড়ি কি না? কিন্তু এ কথাটা ঠিক যে, সর্ব্বোপাস্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যদি তাঁহার আহ্লাদিনী শ্রীরাধারাণীকে লইয়া কোন নিভৃত-নিকুঞ্জে সম্মিলিত রহিতেন, তবে তাঁহার এই উপাসকের বড়াই জগতে কেহ দেখিতে পাইত কি না সন্দেহ। আজ তাঁহার ভক্ত-শিরোমণি শ্রীরাধারাণীর প্রেরণাতেই হউক, আর তাঁহার সহচরীবৃন্দের প্রেরণাতেই হউক, তাঁহাকে আজ এই দোলন খেলায় মাতিতেই হইয়াছে। আর শ্রীবৃন্দাবনের বনদেবীও যেন মোহন সাজে সাজিয়া আজ এই দোলন-মালা গলায় দুলাইয়া তাঁহার বক্ষোবিহারী শ্রীহরির এই ভক্তবাৎসল্যলীলা—আরাধকের আরাধন লীলা দুলাইয়া দুলাইয়া দেখাইতেছেন। দুলান' কেন জান? স্থির থাকিলে যদি সহজে কাহারও নজরে না পড়ে!

আহা বনদেবি, তোমার জয় হউক, জয় হউক। তুমি ওই রাইকানু-জড়িত-তনু দোলন-মালার মধ্যমণি করিয়া চির দিন গলায় দুলাইয়া রাখ,—দুলাইয়া রাখ। এ লীলার সহায় সখীবৃন্দ, তোমাদেরও জয় হউক, জয় হউক। তোমরাও চিরদিনই এই মধুর লীলার আস্বাদনে বিভোর হইয়া থাক এবং তোমাদের অনুগত জনকেও আস্বাদ করাইতে থাক। আর রাধারমণ! তুমিও তোমার আদরের রাধায় হৃদয়ে ধরিয়া ওই দোলার উপর ওই রূপেই দুলিতে থাক, দুলিতে থাক। আমরাও তোমার ভক্তের কৃপায় ওই রূপে তোমায় দেখিতে থাকি, আর আনন্দভরে বলিতে থাকি,—দোওল্ দোল্—দো-দোল্ দোল্—নন্দদুলাল! তুমি দুল'।

[বঙ্গবাসী; ৩০শে ফাল্গুন; ১৩২০ সাল।]

হোলি হ্যায়।

হোলি হ্যায়! হোলি হ্যায়!! হোলি হ্যায়!!!

যেদিকেই কাণ পাতো, এই দোলের সময় ঐ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনা যায় না। বালক নাই, যুবক নাই, বৃদ্ধও নাই, আবীর গুলালে লালে-লাল হইয়া সকলেই বলে,—হোলি হ্যায়, হোলি হ্যায়, হোলি হ্যায়!

বলে তো,—সকলেই বলে তো; কিন্তু কেন বলে, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? কেন, দোলযাত্রার আনন্দ প্রকাশের কি অন্য কোন ভাষা ছিল না যে ঐ শব্দটাই বলিতে হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য তুমি যদি সংস্কৃত কোষগ্রন্থের শরণাগত হও, সে যে তোমায় বড় বেশী কিছু সাহায্য করিতে পারিবে, তা মনে হয় না। কেননা, শব্দের বর্ত্তমান মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার আদি মূর্ত্তি—সংস্কৃত মূর্ত্তি যে কি ছিল, তাহা ঠিক করা কঠিন।

আমরা হাই তুলি। হাইএর সংস্কৃত হইতেছে;—জৃম্ভণ। হাইকে দেখিয়া জৃম্ভণের মূর্ত্তি আবিষ্কার করা কি সহজ ব্যাপার? জৃম্ভণ হইতে প্রাকৃত ভাষা হইয়াছে—'জিমহণ'; তাহা হইতে হিন্দী হইয়াছে—'জিমুহাই'; আর আমরা ঐ জিমুটুকু বাদ দিয়া কেবল 'হাই'-টুকু বজায় রাখিয়াছি। তাই এই 'হাই'এর মূর্ত্তি দেখে তাহার আদিমূর্ত্তি আবিষ্কার করা চলে না।

তুমি শব্দ শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত; সামান্য বর্ণেরও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তোমার অপ্রতিহত অধিকার; হয় তো তুমি বলিবে যে, ওটা

একটা আনন্দব্যঞ্জক শব্দবিশেষ; ওর আর অপর অর্থ-টর্থ কিছুই নাই। হয় তো তুমি তোমার কথার সাফাই সাক্ষী তলব করিয়া প্রমাণ করিয়া দিবে যে, এ জগতে সকল জাতিরই আনন্দব্যঞ্জক যত কিছু শব্দ আছে, আনন্দের উদ্বোধক যত কিছু বীজমন্ত্র আছে, সমস্তই ঐ হ ও র কিংবা হ ও ল বর্ণে গ্রথিত। যেমন আমাদের হরিহরি, হরহর, হ্রাঁ হ্রীঁ প্রভৃতি; সাহেবদের হুরে হুরে, যবনের হর্, রহিম্, ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও হয়তো বলিবে,—আনন্দেই লোকে হুলাহুলি দেয়, আনন্দেই হাসির হর্‌রা ছুটে; আনন্দেই ভাষার হলহলা উঠে; হোলি হ্যায়েও সেই আনন্দেরই বিকাশ। বলিতে হয়, বল; ক্ষতি নাই। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি শাস্ত্রে কিংবা প্রাচীন গ্রন্থে ইহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা মানিতে প্রস্তুত আছ কি না? কিন্তু ভাই! আগে হইতে একটা কথা বলিয়া রাখি, শাস্ত্রে কিংবা প্রাচীন গ্রন্থে যাহা আছে, তাহাই আমি অবিকল শুনাইয়া দিব; তোমাদের সহিত তর্ক করিতে পারিব না। তা তোমাদের মনে লাগুক, আর না-ই লাগুক।

স্কন্দপুরাণান্তর্গত ফাল্গুনমাহাত্ম্যগ্রন্থের নাম শুনিয়াছ বোধ- হয়? তাহাতে ফাল্গুনমাসের মাহাত্ম্য-দ্যোতক নানা কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে হোলিকারাক্ষসীর ইতিকথাও একটি। সেই কথা আগাগোড়াই তোমাদের কাছে বলিতে পারিতাম, যদি তোমাদের 'কুরুচি কুরুচি' চীৎকারের ভয় না থাকিত। আমি কেবল গ্রন্থ দেখাইয়া দিলাম, কথা-ভাগ তোমরা তাহা হইতেই দেখিয়া লইও। অনেক তত্ত্বই দেখিতে পাইবে। দেখিতে পাইবে,—এই হোলিকা নাম হইতেই হোলি হ্যায়ের সৃষ্টি; দেখিতে পাইবে,—মেড্র-অসুরের দহন-ব্যাপার হইতেই আমাদের মেড়াপোড়ার (চাঁচোড় বা বহ্ন্যুৎসবের) অবতারণা,—আর সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী-সহকারে অশ্লীল-অপভাষা প্রয়োগের ব্যবস্থাটাও দেখিতে পাইবে।

ইহাতো গেল শাস্ত্রের কথা। একবার এ দেশের প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থকারগণ এ সম্বন্ধে কে কি বলিয়াছেন, তাহাও একটু শুনাইয়া দিই। দায়ভাগের টীকায় একটি শব্দ দেখিতে পাই—'হোলাকা'। টীকাকার ইহার অর্থ লিখিয়াছেন,—বসন্তোৎসবঃ, হোলী ইতি ভাষা। পুনা-নিবাসী বামন শিবরাম আপটে এম, এ, মহোদয় তাঁহার সংস্কৃত ইংরাজী-অভিধানে উক্ত অর্থেই—হোলাক, হোলিকা এবং হোলী, তিনটী শব্দ ধরিয়াছেন। কিন্তু প্রমাণ কিছুই দেন নাই। ভেন্দলাই গোপাল আয়ার (Vendlai Gopal Aiyer) তাঁহার "Chronology of ancient India" নামক গ্রন্থে হোলিকা-রাক্ষসীর নাম হইতেই যে হোলি-নামের উৎপত্তি, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। তবে তাঁহার হোলিকা এবং ফাল্গুনমাহাত্ম্যের হোলিকা এক কিনা সন্দেহ। তাঁহার হোলিকা রাক্ষসী বটে ;—সে এক রাজার রাজ্যে আসিয়া বেজায় উপদ্রব করিত। রাজা তাহার সঙ্গে কিছুতেই পারিয়া না উঠিয়া, শেষ দৈনিক একটী করিয়া মানুষ খাইতে দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। একদিন এক মহাপুরুষ পথ দিয়া যাইতেছেন। অকস্মাৎ মহা করুণ ক্রন্দন তাঁহার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিল। ব্যথিতপ্রাণে তিনি তথায় গিয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধা মস্তকে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন,—আহা, সেদিন সেই বুড়ীর নাতিনীর পালা,—সেদিন তাহাকেই হোলিকার খাদ্যরূপে যাইতে হইবে। তাই তাহার শোকে বৃদ্ধার এত কান্নাকাটি। মহাপুরুষ বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—বাছা, তোমার ভয় নাই। তুমি এক কার্য্য কর ; পাড়ার ছেলেপুলে জড় করিয়া তোমার নাতিনীকে সঙ্গে লইয়া হোলিকার কাছে চল। আর সকলে মিলিয়া তাহার সম্মুখে কুৎসিত-অঙ্গভঙ্গী-সহকারে অশ্লীল গালাগালি দিতে থাক,—পথের ধূলা ইটপাটকেল লইয়া, তাহার

অঙ্গে ছুড়িয়া ছুড়িয়া মার, তাহা হইলেই সে তখনই মরিয়া যাইবে। এইরূপে মৃত্যুই তাহার বিধিলিপি—পূর্ব্ব অভিসম্পাতের অবশ্যম্ভাবী ফল। সাধুর কথায় বৃদ্ধা আনন্দিত হইলেন। তাঁহার আদেশও প্রতিপালন করিলেন। ফলে হোলিকারও মৃত্যু হইল। হোলিকার মৃত্যুতে দেশে মহা-আনন্দের রোল উঠিল। সেই আনন্দের স্মরণের জন্য—শিশুসন্তানের পরম কল্যাণের জন্য বৎসরে বৎসরে হোলিকার মরণ-দিনে দেশেদেশে এই আনন্দ-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মহাকবি চন্দ বরদাই কৃত 'পৃথ্বীরাজ রসৌ' নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন হিন্দী গ্রন্থের ২২শ অধ্যায়ে (বাইশবাঁ সময়ে) এ বিষয়ে অপর একটী উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথ্বীরাজ চন্দকবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হাঁ হে, এই হোলির সময় ইতর নাই, ভদ্র নাই, স্ত্রী নাই, পুরুষ নাই, বালক নাই, বৃদ্ধ নাই, সকলেই লজ্জা-সরম ছাড়িয়া এত আবোল-তাবোল বকে, মাতা-মাতি করে কেন? ইহার উত্তরে চন্দ কবি বলিলেন,—চৌহান-বংশে ঢুণ্ঢা-নামক এক রাক্ষস ছিল; উহার কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম ঢুণ্ঢিকা। ঢুণ্ঢা একবার কাশীধামে গিয়া শতবর্ষব্যাপী তপস্যা করিল। দাদা তপস্যায় গিয়াছেন শুনিয়া, ভগিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না। ঢুণ্ঢিকাও তথায় গমন করিল। তপঃপ্রভাবে ঢুণ্ঢার আভ্যন্তর তেজ এতই বাড়িয়া গেল যে, সে আপনার তেজে আপনিই জ্বলিয়া ভস্মীভূত হইল। ভ্রাতার এই অবস্থা দেখিয়া ঢুণ্ঢিকা যেন কেমন একতর হইয়া গেল। সে অবাক হইয়া আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তথায় বসিয়া রহিল। এইরূপে তাহারও একশত বৎসর কাটিয়া গেল। ঢুণ্ঢিকার এই অবস্থা দেখিয়া কাশীশ্বরী মা অন্নপূর্ণা প্রসন্না হইয়া তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন,—ঢুণ্ঢিকা! আমার ক্ষেত্রে তুই যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিস, তাহাতে আমি বড়ই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। তুই আমার কাছে

অভিমত বর-প্রার্থনা কর। করুণাময়ী অন্নপূর্ণা করুণার প্রেরণাতেই ঢুণ্ঢিকাকে বর দিতে গিয়াছেন; কিন্তু সে রাক্ষসী তো আর ভক্তি-মুক্তি লক্ষ্য করিয়া প্রকৃত তপস্যা করিতে বসে নাই,—সে যোগেশ্বরীর নিকট রাক্ষসীরই মত বরপ্রার্থনা করিল; বলিল,—বালক নাই, বৃদ্ধ নাই, যুবকও নাই, এ জগতের সকলকেই যেন আমি অনায়াসে ভক্ষণ করিতে পারি।

ঢুণ্ঢিকার বরপ্রার্থনা শুনিয়া মহামায়া বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; প্রাণেশ্বর বিশ্বেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—তাই তো করা যায় কি? শঙ্কর বলিলেন—সমস্যা বটে! এমন কাজ করা চাই, যাহাতে দুই দিকই রক্ষা পায়—তোমার কথাও সত্য হয়, লোকক্ষয়ও নিবারিত হয়। এক কাজ কর, আজ হইতে এক নিয়ম করিয়া দাও,—এই ফাল্গুনমাসে অন্তত তিন দিনও যে গালাগালি বকিবে, হোহো শব্দ করিবে, আবীরে-গুলালে লালে-লাল হইবে, গাধার উপর চড়িবে, ঢুণ্ঢিকা তাহাকে ছাড়িয়া আর সকলকেই খাইতে পারিবে। শিবের আজ্ঞায় শঙ্করী সেইরূপ ব্যবস্থাই করিলেন, আর সেই দিন হইতেই লোকে এই ফাল্গুনমাসে ঢুণ্ঢিকাকে লক্ষ্য করিয়া উন্মত্তের মত নাচগান গালাগালি ধূলা-আবীর-ছোড়াছুড়ি আদি আনন্দ-উৎসব করিতে লাগিল।

অতঃপর বলাই বাহুল্য যে, উপরি-লিখিত কারণের যে কোনও কারণেই হউক, আমাদের দেশে এই সময় এই হোলি-হ্যায়ের এত ধূম,—খিস্তি-খেউড়ের এত ছড়াছড়ি, আর আবীর-গুলাল লইয়া এত হুড়াহুড়ি।

কলিকাতা এখন সভ্য হইয়াছে। তাই অন্যান্য প্রাচীন উৎসবের মত এই হোলি-লীলা উৎসবও এখন এখান হইতে একরূপ বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। একদিন এই কলিকাতাতেই এই হোলিখেলার এত মাতা-মাতি ছিল যে, লাল আবীর বিক্রয় উপলক্ষে 'লালবাজার' নামের সৃষ্টি

হইয়াছে। রাধাবাজার হইতে রাধারাণীর পক্ষ হইয়া কতক লোক এবং শেঠেদের শ্যামরায়ের পক্ষ হইয়া কতক লোক বর্ত্তমান জেনরেল-পোষ্ট-আফিসের অধিকৃত বিস্তৃতভূমিতে সম্মিলিত হইতেন। ঐ খানেই উভয় পক্ষের আবীরের তুমুল লড়াই চলিত। আবীরে-আবীরে ঐ স্থানটা লালে-লাল হইয়া যাইত। পোষ্ট-অফিসের পূর্ব্বদিকের দীঘীর জলও লালে-লাল হইয়া যাইত; তাই অদ্যাবধি দীঘীটা 'লালদীঘী' নাম ধারণ করিয়া তাহার ক্ষীণ স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। এ কথা আমার কপোল-কল্পিত নয়। এদেশের প্রাচীন ইতিহাসেই ইহার প্রমাণ বিদ্যমান। (Friminger's old Calcutta, পৃঃ ১৪৮ এবং Good old days of Hon'ble John Company, vol III, Calcutta Review, Transactions of Royal Asiatic Society, প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)

[বঙ্গবাসী; ১২ই চৈত্র; ১৩১৬ সাল।]

ফাগুনের ফাগুখেলা।

পূর্ণিমা কিংবা পূর্ণচন্দ্রমা কাহার মহিমা বলা যায় না, ওদের যে হ'ক একজন সারা সংসারটাকে কেমন রসময় করিয়া দেয়। শুধু তাই নয়, অত বড় সমুদ্র, যে কথনও আপন মর্য্যাদা অতিক্রম করে না, ওদের আগমনে সে-ও কেমন আপন মর্য্যাদা অতিক্রম না করিয়া থাকিতে পারে না।

চন্দ্রমাকে বুকে লইয়া পূর্ণিমা যথন হাসিমুখে দেখা দেয়, তথন যেন সকলেরই প্রাণে কেমন একটা—কাকে যেন বুকে-রাখি বুকে-রাখি ভাব জাগিয়া উঠে। যে বুকে রাখিতে পায়, তাহার কাছে সবই যেন সুধায় চুবানো বলিয়া বোধ হয়,—জ্বলন্ত অনলও যেন অমৃতে-অমৃত বলিয়া অনুভূত হয়। আর যে না পায়, বিরহের তপ্তশ্বাসে তাহার যেন চারিদিকেই প্রলয়ের আগুন জ্বলিয়া উঠে,—অমন যে শীতরশ্মি, তাহাও যেন দাব-বহ্নি বলিয়া বিবেচিত হয়।

কেবল যে মানবেরই মনে এই ভাবের আবির্ভাব, তাহা নহে; এ ভাব বোধ হয় এ সংসারের সকলেরই। তাই ওই পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র দর্শনে পাথীরা সব ডাকিতে থাকে, তাহাদেরও প্রাণ বোধ হয় কাহার মিলনের আশায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠে। পশুদেরও ঐ ভাব। বৃক্ষ ও বল্লরী জড়াজড়ি করিয়া কেমন এক প্রফুল্ল ভাব ধারণ করে। নদ-নদী গিরি-গহন সকলেই কি এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে থাকে।

পূর্ণিমা বা পূর্ণচন্দ্রমার এ প্রভাব কেবল প্রাকৃত জগতের সীমা-পরিখায় আবদ্ধ নয়, অপ্রাকৃত ভগবল্লোকেও ইহাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া

থাকে। প্রকৃতির পারে—পরব্যোম। তাহার উপরে কৃষ্ণলোক। প্রেমের ধাম শ্রীবৃন্দাবন তাহারই মধ্যে। প্রাকৃত জগতে তাহার প্রকাশ—কৃষ্ণেরই ইচ্ছায়। আমারা চর্ম্মনয়নে তাহাকে প্রপঞ্চের মত দেখিয়া থাকি। তাহার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে হইলে প্রেমনেত্রের প্রয়োজন। সে নয়ন পাইলেই দেখিতে পাইবে,—সেখানকার ভূমি চিন্তামণিগণময়ী,—সেখানকার জল অমৃতরস,—সেখানকার বৃক্ষ কল্প-বৃক্ষ। এই অপ্রাকৃত ধামেও পূর্ণিমার ও পূর্ণচন্দ্রমার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। এখানেও তাহারা বিরহ জাগাইতে, মর্য্যাদা ভাঙ্গাইতে এবং মিলনে মাতাইতে সম্পূর্ণ সমর্থ।

শ্যামনাগর তো ওই পূর্ণিমার পূর্ণ শশধর হেরিলেই কেমন কেমন হইয়া উঠেন, অধরে মুরলী লইয়া বিরহ-গীতির আবৃত্তি করিতে থাকেন। আর সেই ধ্বনি ধরিয়াই না যত ধনী কুলশীল লজ্জাধর্ম্মের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া কাননে যাইয়া মিলিত হন?

আজিও সে-ই পূর্ণিমা—সে-ই সে সুধাকরের সুধার ছড়াছড়ি। নব-বসন্ত-সমাগমে ফাল্গুনের এ পূর্ণিমা যেন আবার নবীন সুষমায় ফাটিয়া পড়িতেছে। এ যেন সেই কামোন্মাদিনী প্রিয়সঙ্গ-প্রার্থিনী স্ফুটযৌবনী প্রণয়িনী প্রিয়সঙ্গলাভের আমোদে মাতিয়া উঠিয়াছে। এই মাতামাতি প্রকৃতির পরতে-পরতে পরিব্যক্ত। কোকিলের কুহুই বল, পাপিয়ার পিউই বল, ভ্রমরের গুঞ্জনই বল, আর হরিণের নর্ত্তনই বল, সকলই ওই উন্মাদনারই অভিব্যক্তি। ওই যে ওই শশধরের শত খণ্ড অঙ্গে মাখিয়া কলতান ধরিয়া তরঙ্গভঙ্গে যমুনা নৃত্য করিতেছে, উহাও ওই উন্মাদনারই অভিব্যক্তি।

নন্দকুলের অকলঙ্ক চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই চন্দ্র-পূর্ণিমার খেলা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আরও দেখিলেন;—গাছে-গাছে নূতন পাতা নূতন ফুল, আর লতাগুলি ফুলসাজে সাজিয়া তাহাদের

গায়ে এলাইয়া পড়িয়া বসন্তের মন্দ-মন্দ সমীরণে মন্দমন্দ আন্দোলিত হইতেছে। গাছের ডালে শুক ও সারী নয়ন মুদিয়া চঞ্চুপুটে এ ওর গা-মাথা কুরিয়া-কুরিয়া দিতেছে। ভ্রমর ও ভ্রমরী একই ফুলে নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। হরিণ-হরিণী এ ওর গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া ধীরে-ধীরে শৃঙ্গের অগ্রে পরস্পর অঙ্গ কণ্ডূয়ন করিতেছে। এ দেখিয়া তাঁহার আর স্থির থাকা কঠিন হইয়া পড়িল। খেলা তো তাঁহার স্বভাব, তাই তিনি এক নূতন খেলাই পাতিলেন।

সাপুড়েদের যেমন বাঁশী বাজাইয়া খেলার আরম্ভ, এই অঘ-নাশন কালীয়-দমন শেষ-শয়নেরও তেমনি বাঁশী বাজাইয়াই প্রায় সকল খেলার আরম্ভ। এ খেলাতেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। তিনি যমুনার তটে বসিয়া বেশ সরস করিয়া বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। সে ডাকাতিয়া বাঁশী তো সহজ নয়? সে—যাঁহাদের জন্য তাকে বাজানো, তাঁহাদের সকলেরই মন-প্রাণ ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমস্তই চুরি করিয়া ফেলিল, আর তাঁহাদিগকে গৃহের বাহির করিয়া বংশীধারীর নিকটে আনিয়া হাজির করিয়া দিল।

তাঁহারাও আসিলেন, বাঁশীও থামিয়া গেল। অমনি বাঁশীর বদলে হাসি আসিয়া তাঁহার রঙ্গিম অধর অধিকার করিয়া বসিল। এ হাসি দেখিয়া ব্রজদেবীরা সব বিষম চটিয়া গেলেন। রাগটা কিন্তু হাসির চেয়ে বাঁশীর উপরেই হইল বেশীবেশী। বাঁশীর অপরাধ—সে যে তাঁহাদের ফাঁকি দিয়া একাএকাই শ্যামের অধরসুধা পান করিতেছে, সে কথা আবার গলাবাজি করিয়া তাঁহাদের জানাইয়া দিয়া যাতনা দিতেছে,—উঃ, বাঁশীটা কি দুষ্ট!

রাগটা তাঁহাদের এক-আধ জনের হইল না; হইল সকলেরই। তাঁহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন,—আজ যে কোন উপায়েই

হউক, শ্যামের বাঁশী কাড়িয়া লইতেই হইবে, সামান্য বাঁশের বাঁশীর এ টিট্‌কারী কিছুতেই সহ্য করা যায় না। তা ও কালার সঙ্গে বলে তো আর আমরা পারিয়া উঠিব না, কৌশলেই কাজ সারিতে হইবে।

এখন কৌশলটা করা যায় কি?—ইহা লইয়া চুপিচুপি অনেক কথা-কাটাকাটি হইয়া গেল। শেষ স্থির হইল,—ফাগু খেলিয়া শ্যামের নয়ন ধাঁধিয়া দিয়া বাঁশরীটি কাড়িয়া লইতে হইবে। কাজেও হইল তা-ই। তাঁহারা কয়েকজনে মিলিয়া শ্যামের সঙ্গে কথার লড়াই জুড়িয়া দিলেন, আর কএকজন পাশ কাটাইয়া আবীর-টাবীর সংগ্রহ করিতে গেলেন। তাঁহাদের আসিতে বড় বিলম্ব হইল না। আসিবামাত্রই সকলে একচোট খুব হাসিয়া লইলেন। তারপর শ্যামবঁধুকে ঘিরিয়া ফেলিয়া চারিদিক্ হইতে ফাগুবৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দিলেন। কেবল ফাগু নয়। কেহ বা শ্যামের অঙ্গে 'কুঙ্কুম' ছুড়িয়া মারেন, কেহ বা পিচকারীর বারিতে তাঁহাকে স্নান করাইয়া ফেলেন, কেহ বা গুলাল গুলিয়া তাঁহার মুখে মাখাইয়া দেন। এইরূপে সকলে মিলিয়া তাঁহারা শ্যামসুন্দরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। অনেকক্ষণ ফাগুযুদ্ধের পর তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। ফাগুখেলার উপদ্রবে শ্যাম আর নয়ন উন্মীলন করিতে পারেন না, ইত্যবকাশে কিশোরী যাইয়া তাঁহার হাত হইতে বাঁশরীটি কাড়িয়া লইলেন সকলেই হো হো উচ্চ হাসি হাসিয়া বলেন,—এইবার?—এইবার কানু! এইবার? বাজাও,—কুলনাশা বাঁশী বাজাও?

শ্যাম আর কি করেন? একা তিনি, অনেক গোপী পারিবেন কেন? হার মানিতেই হইল। আর তাঁদের কাছে কবেই বা তিনি জিতিতেই পারিয়াছেন? শ্যামসুন্দর তখন ফাঁপরে পড়িয়া কাণামাছি-খেলার মত দুই হস্ত বিস্তারিয়া বংশীহারিণীকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন যাঁহার সকল অঙ্গ সকল ইন্দ্রিয়ময়, নয়ন নিমীলনে তাঁহার আর কোন

কাজটা আটকাইবে বল? তবে ভক্তের অন্তরে আনন্দ দিবার জন্য তাঁহাকে নয়ন থাকিতেও অন্ধ সাজিতে হইল। ফলে তিনি খানিকক্ষণ কাণার ভাণ করিয়া হাতড়াইতে-হাতড়াইতে বাঁশরীসমেত রাই-কিশোরীকে ধরিয়া ফেলিলেন। অমনি দুঁহু অঙ্গ পরশনে দুঁহুজনে ভাব-বিবশ হইয়া পড়িলেন। সেই অপ্রাকৃত যুগল-মাধুরী দেখিয়া সখীগণের নয়ন-মন ভুলিয়া গেল। তাঁহারা অমনি শ্যামগোরীর জয় দিয়া আনন্দভরে নাচিতে গাহিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। এ আনন্দ-দৃশ্য দর্শনে বৃন্দাবনের তৃণ-গুল্ম পশু-পক্ষী তারাও সব বিমুগ্ধ হইয়া গেল। পাঠক! ওই সেই আনন্দের দৃশ্য দেখিয়া নয়ন মন সার্থক কর।

[বঙ্গবাসী ; ২৭শে ফাল্গুন ; ১৩১৭ সাল।]

নামব্রহ্মের অবমান।

কলিযুগে ভগবানের নামের মাহাত্ম্যই সব চেয়ে বেশী। নাম বড় সামান্য বস্তু নন। নাম ও নামী একই বস্তু। যাঁহার নাম—তিনিই নামী। তাই ভগবানের নামে ও ভগবানে ভেদ নাই। ইহা কাহারও কল্পনার কথা নয় ;—শাস্ত্রেরই কথা।

কোন কোন মহাজন আবার বলিয়া থাকেন,—নামীর চেয়ে বরং নামই বড়। কেননা, নামী পরিচ্ছিন্ন বস্তু—দেশ কাল ও পরিমাণের পরিচ্ছেদে তিনি আবদ্ধ, কিন্তু নাম কোন পরিচ্ছেদেই বাঁধা থাকেন না। যাঁহার নাম, তিনি যে-স্থানটুকুতে থাকেন, সে-স্থানের একটা সীমা আছে, কিন্তু তাঁহার নামের অবস্থিতির একটা সীমা নাই,—তাঁহার অপেক্ষা তাঁহার নাম অনেক দূরদূরান্তর ব্যাপিয়া থাকিতে পারেন। আমাদের দেশের রাজা কোথায়—কোন্ সুদূর-বিলাতে একটু সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে অবস্থান করেন, কিন্তু তাঁহার নাম সীমার মানা না মানিয়া জগৎ জুড়িয়া বিরাজমান।

মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সময়টার একটা সীমা আছে। শত বৎসরেই হউক, আর তাহার কিছু কমবেশীই হউক, সেই কালের মধ্যেই তাহার যাহা কিছু লীলা-খেলা। কিন্তু মানুষ চলিয়া গেলেও তাহার নামকে থাকিতে দেখা যায়। নামীর মত কালের গণ্ডী মানিতে নাম নিতান্তই নারাজ।

মানুষের পরিমাণেরও একটা পরিচ্ছেদ আছে ;—সাড়ে তিন হাত কিংবা তাহার চেয়ে কিছু ছোট-বড়। কিন্তু তাহার নামের তেমন কোন পরিচ্ছেদ নাই। কোন পরিমাণের বাঁধনেই নামকে বাঁধা যায় না।

তাই বলিতে হয়,—নামীর মত নাম পরিচ্ছিন্ন নহেন ;—নাম সকল প্রকার পরিচ্ছেদেরই অতীত।

হয় তো কেহ বলিবেন যে, সাধারণ লোকের সম্বন্ধে এই কথা খাটিতে পারে, কিন্তু বিভু ভগবানে ও তাঁহার নামে এ কথা খাটিতে পারে না। যাঁহার অপেক্ষা আর বড় কেহ নাই, যিনি সর্ব্বব্যাপক, তিনি হইতেছেন 'বিভু'। ভগবান্ যখন বিভু—সর্ব্বব্যাপক, তখন তাঁহার অপেক্ষা বড় হইবার কথাই উঠিতে পারে না।

মহানুভব মহাজনগণ ঐ আপত্তির উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—সত্যই ভগবান্ বিভু বস্তু,—তাঁহার অপেক্ষা আর কেহই বড় হইতে পারে না, কিন্তু শক্তির তারতম্য বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, বিভু ভগবানের অপেক্ষা তাঁহার নাম আরও বড়, নামের শক্তি আরও বেশী। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যখন স্বয়ং লঙ্কাপুরে গমন করেন, তখন তাঁহাকে সেতু বন্ধন করিয়া পার হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার নাম-বলে বলীয়ান্ হনুমান্ "জয় রাম জয় রাম" ধ্বনি করিয়াই অনায়াসে সাগর উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। নামের শক্তি এত অধিক।

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার ভাগবতসন্দর্ভগ্রন্থে লিখিয়াছেন,—ভগবান্ যেমন মৎস্য-কূর্ম্মাদি নানা জীবরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, বৃক্ষরূপে নদীরূপে অবতার অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, নামও তেমনি তাঁহার অক্ষররূপে অবতার।* ভগবন্নামের এই অপার মহিমা দেখিয়াই

---

* "অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণাবতারোঽয়মিতি * * * তস্মান্নামনামিনোরভেদ এব।"—(প্রভুপাদ ৺ শ্যামলালগোস্বামিমহাশয়-সম্পাদিত শ্রীভাগবতসন্দর্ভের দ্বিতীয় সন্দর্ভ—ভগবৎসন্দর্ভের ১০৫ পৃষ্ঠা, ১২—১৪ পংক্তি।) শ্রীভগবানের নাম ও শ্রীভগবান্ যে অভিন্ন তত্ত্ব, ইহার সবিচার শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত জানিতে হইলে উক্ত সন্দর্ভের ১০২ হইতে ১০৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত অবশ্য দ্রষ্টব্য।

কালনার সুপ্রসিদ্ধ ৺ভগবান্ দাস বাবাজী প্রভৃতি মহাপ্রভাবশালী ভাগবতগণ নামব্রহ্মেরই উপাসনা করিতেন এবং আজিও অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি এই অক্ষরব্রহ্মের—নামরূপি-ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" ইহাও তো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীমুখোক্তি। কিন্তু কালের কি কুটিল গতি, আজকাল অনেক লোকই সামান্য নামের লোভে এই অসামান্য নামব্রহ্মের অবমান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই অবমান আবার নানা প্রকারে প্রকাশমান। তাহার মধ্যে আজ একটার কথাই বলি।

যে কোন তীর্থক্ষেত্রে যে কোন প্রসিদ্ধ দেবালয়ে যাও, দেখিতে পাইবে,—যাইবার পথে—প্রাঙ্গণে, সোপানে, অথবা দালানে নানা লোকের নাম প্রস্তরের উপর খোদিত রহিয়াছে। ঐ সকল নামের অধিকাংশই আমাদের পরমারাধ্য দেবদেবীরই নাম। বল দেখি ভাই! ঐ নাম মাড়াইয়া যাওয়াটা দেব-নামের অবমান করা হয় কি না?

আমি জানি, ৺পুরীধামের কতিপয় ভক্ত শ্রীশ্রীজগবন্ধুর শ্রীমন্দিরে দর্শনার্থ গমন করেন না। বাহির হইতে নীলচক্র দর্শন করিয়াই তাঁহাদিগকে প্রভুদর্শনের সাধ মিটাইতে হয়। আমি একদিন তাঁহাদেরই মধ্যে একজন অতি প্রাচীন সুপণ্ডিত ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—মহাশয়! আপনি শ্রীদেউলে শ্রীপ্রভুকে দেখিতে যান না কেন? উত্তরে তিনি বলিলেন,—যাইব কি অপরাধ সঞ্চয় করিতে? কলিতে সাক্ষাৎ নামেরই উপাসনা সর্ব্বোপরি বিরাজিত। সেই নামব্রহ্মের অবমাননা করিয়া দারুব্রহ্ম দর্শনে আমার কি পরমার্থ লাভ হইবে? শ্রীমন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ দশ-বিশটি টাকার লোভে দেউলে যাহার-তাহার নাম খোদাইয়া দেন, নামলুব্ধ যাত্রিগণও দশ বিশ টাকার বিনিময়ে নাম জাহির করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করেন; দুঃখের বিষয়, উভয় পক্ষের কেহই একবার

চিন্তা করিয়া দেখেন না,—প্রকৃতপক্ষে কাজটা করিতেছি কি? প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের পত্নীর পরলোক প্রাপ্তির পর আবার বিবাহ করিতে হইলে যেমন মায়ের দোহাই দিতে হয়,—কি করিব মা ছাড়িতেছেন না, তাই বিবাহ করিতে হইতেছে ইত্যাদি, অনেক যাত্রীদেরও এই নাম জাহির করিবারও এইরূপ একটা কাটান আছে। তাঁহারা ভক্তির দোহাই দিয়া বলিয়া থাকেন,—আহা, এই পবিত্র দেবমন্দিরে দেবদর্শনের জন্য কত সাধু মহাত্মা আগমন করেন, আমার উপর তাঁহাদের চরণধূলি পড়িলে আমি কৃতার্থ হইয়া যাইব, ইত্যাদি।

এইরূপ বলিতে-বলিতে সেই প্রবীণ ভক্ত অজস্রধারে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিয়া বড়ই দুঃখ হইতে লাগিল।

চারিশত বৎসরের কথা, শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের প্রধান প্রবর্ত্তক শ্রীমদ্‌বল্লভাচার্য্যও একদিন এই দুঃখে বরদরাজের দর্শন করিতে তাঁহার দেউলে যাইতে পারেন নাই। তিনি নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিতে-করিতে শ্রীবিষ্ণুকাঞ্চীতে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া অন্তরঙ্গ ভক্ত দামোদর দাসকে বলিলেন,—"দামলা! পৃথিবীতে সাতটী পুরী আছেন, তাহার মধ্যে সাড়ে তিনটী পুরী শিবের এবং সাড়ে তিনটী পুরী বিষ্ণুর। বিষ্ণুর সাড়ে তিন পুরী হইতেছেন,—মথুরাপুরী, অযোধ্যাপুরী, দ্বারকাপুরী; এই তিনটী পুরা পুরী, এবং বিষ্ণুকাঞ্চী অর্দ্ধপুরী। বরদরাজস্বামী এই বিষ্ণুকাঞ্চীর মালিক। তাঁহার দর্শন অতি অপূর্ব্ব। তাঁহার সেই দিব্যমূর্ত্তি দর্শনের জন্য এখানে আসিয়াছি বটে, কিন্তু মন্দিরে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করা ঘটিবে না।" দামোদর দাস মিনতিপূর্ব্বক আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহারাজ! আপনি শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় করিবেন না, ইহার কারণ কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে বল্লভাচার্য্য যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার

চরিতকারের ভাষাতেই বলি,—"শ্রীআচার্য্যজী আপ কহেং,—জো জয়দেব কবিজী ভএ হেং, সৌ য়হাঁহী ভএ হেং। সো বে বরদরাজস্বামীকে কৃপাপাত্র হতে। বীনমেং ২৪ অষ্টপদী কীএ হেং। ওর নিজমন্দিরকী চোবীশ সিঢ়ী হেং। সো এক এক সিঢ়ীপে এক এক অষ্টপদী লিখী হেং। তাতেং ভগবান্নামপে পায় কেসেং দীয়ো জায়?" ইত্যাদি। (শ্রীআচার্য্য মহাপ্রভুজীকী শ্রীবিষ্ণুকাঞ্চীকী বৈঠককো চরিত্র।) অর্থাৎ শ্রীআচার্য্যজী বলিলেন,—এখানে একজন জয়দেবনামক প্রসিদ্ধ কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপর বরদরাজের ভারি কৃপা। তিনি চব্বিশটি 'অষ্টপদী' শ্লোক রচনা করেন। বরদরাজস্বামীর শ্রীমন্দিরের সিঁড়ি চব্বিশটি। কবি সেই চব্বিশটি অষ্টপদী চব্বিশটি সিঁড়িতে অঙ্কিত করিয়া দেন। সেই অষ্টপদীর পদেপদে ভগবন্নাম, আমি তাহার উপর পদক্ষেপ করি কি প্রকারে?

শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তা তাঁহার ভাষ্যাদি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার সম্প্রদায়ের সকলেই তাঁহাকে অভিন্ন ভগবান্ বলিয়াই মনে করেন। উক্ত কথা তাঁহার কথা। ইহা কি একবার চিন্তা করিয়া দেখা দরকার নয়? তাই বলি ভাই! বহু পূর্ব্বকাল হইতে শাস্ত্রজ্ঞ সাধু মহাত্মার কাছে যে কর্ম্ম অপকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে, সামান্য নামের লোভে তাহাতে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হওয়া কি আমাদের কর্ত্তব্য? দেবনামের এ অবমান-অমর্য্যাদা নিবারণকল্পে বদ্ধপরিকর হওয়াটা কি আমাদের বাঞ্ছনীয় নয়?

শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যের জীবনী হইতে স্পষ্টই জানিতে পারা যায়, সেকালে এক বরদরাজের শ্রীমন্দির ব্যতীত অন্য কোন দেব-মন্দিরের সোপানাদিতে দেবনাম অঙ্কিত ছিল না, এই সর্ব্বনাশকর নামলুব্ধতা তখন একালের মত বিস্তৃতি লাভ করে নাই। সে যাহাই হউক, আমার

এখন সকলের প্রতি সবিনয় নিবেদন,—কেহ যেন নামের লোভে কোন দেব-মন্দিরের চলাচলের পথে আপন নাম মুদ্রিত না করেন। যদি নিতান্ত লোভ সামলাইতেই না পারেন, তাহা হইলে সোপানাদির বদলে দেয়ালের গায়ে খোদিত করিবেন। আর দেবমন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়-গণের নিকটেও বিনীত প্রার্থনা,—তাঁহারা যেন যৎসামান্য অর্থের লোভে ধর্ম্মের স্থানে এই ধর্ম্মবিগর্হিত অনুষ্ঠানের সহায়তা না করেন। বলিতে কি, এই দেবনামের অবমাননার নিবৃত্তি প্রধানত তাঁহাদেরই আয়ত্ত। তাঁহারা মনে করিলেই এই অবমাননা দূর করিয়া দিতে পারেন,—বিশ্বেশ্বরের শ্রীমন্দির বিশ্ববাসীর সুগম করিয়া দিতে পারেন। তাঁহারা এই প্রথার পরিবর্ত্তন করিলেই—দেব-দর্শনের জন্য দেউলে যাইতে পারিলাম না বলিয়া আর কাহাকেও আক্ষেপ করিতে হইবে না, আমরাও যার-পর-নাই আনন্দ অনুভব করিব।

[বঙ্গবাসী ; ১৭ই অগ্রহায়ণ ; ১৩১৭ সাল।]

দেবতার অবমান।

আদরের সামগ্রীর অনাদর,—পূজার পাত্রের অবমাননা, দর্শন করিলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় ব্যথিত না হয়? দুঃসহ দুঃখের বিষয়,—আজকাল এই অনাদর-অবমাননার দৃশ্যই জগৎ জুড়িয়া,—যে দিকে তাকাইবে, সেই দিকেই দেখিতে পাইবে। সেই সংখ্যাহীন দৃশ্যের মধ্যে অদ্য দেবতার অবমাননা সম্বন্ধে দুই চারি কথা শুনাইব।

পরিচয় দিবার সময় আমরা মহা-আড়ম্বর-সহকারেই পরিচয় দিই,—আমরা হিন্দু;—অমুক মুনির সন্তান—তমুক মুনির সন্তান,—হেন দেবতার উপাসক—তেন দেবতার উপাসক; কার্য্যত আমাদের মত সেই মুনি-দেবতার অবমন্তা বোধ হয় হইতেই পারে না। কেন?—তাহাও বলি। এই সেদিনকার কথা; আমার পরম স্নেহাস্পদ ঋতুভায়ার,—শ্রীমান্ ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মুদীর দোকানে" বিবিধ স্বদেশী সামগ্রীর মধ্যে একটি সামগ্রী দেখিলাম,—'দেবনামে অনাদর'। সহৃদয় ভায়ার আমার হৃদয়ের ব্যথা দিয়া সামগ্রীটি গঠিত। আমরা যে কথায়-কথায় "ধেড়েকেষ্ট, গোবর গণেশ" প্রভৃতি দেবনামের অবমানসূচক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, শ্রীমান্ তাহা সহিতে পারেন নাই। শ্রীমান্ আদিব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্ম; সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, প্রতিমাপূজার পক্ষপাতী নহেন; অথচ কথাটা বাজিল তাঁহার অন্তরে। আর তুমি-আমি—দেবমূর্ত্তির উপাসক বলিয়া যাহারা পরিচয় দিই, তাহাদের হৃদয়ে এ কথাটা জাগিল-না বা বাজিল-না। কি লজ্জা, কি পরিতাপের কথা! কেবল কি তাহাই?—ভায়া আমার দেবনামের অবমাননা সহ্য করিতে

পারেন নাই, আর আমরা সেই দেবতারই অবমাননা অবলীলাক্রমে করিতেছি।

ঠিক তাই কি না, দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। প্রথমতঃ,—আজকাল অনেকেই আমরা বিলাসী বাবু হইয়াছি। পল্লীবাস আর ভাল লাগে না। বার মাস সহরেই বাস। দেশের বাটী দ্বেষের সামগ্রী। সেখানে থাকেন কেবল—গলগ্রহ দুই-একটা বিধবা আর পৈতৃক দেববিগ্রহ। বাবু এখানে বিদ্যুৎ (ইলেক্‌ট্রিক)-আলোকিত উত্তম অট্টালিকায় চর্ব্ব্যচোষ্য-লেহ্য পেয় চাতুর্ব্বিধ অন্নে পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছেন, দেবতা সেখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন আবর্জ্জনাপূর্ণ গৃহে রাঙারাঙা বুগড়ি চাউল আর ঠক্‌ঠকে ঘোঙা মোণ্ডায় মনপ্রাণ ঠাণ্ডা করিতেছেন। মাসে দুই দিন বিধবার একাদশী, গ্রাম্য পুরোহিতের কৃপায় দেবতার একাদশীটা তার চেয়েও বেশী-বেশী। বাবু এদিকে বারবিলাসিনীর সঙ্গীত-নর্ত্তনে আনন্দ অনুভব করুন, দেবতা ওদিকে মশক ঝিঁঝিপোকার গীতে এবং ভেক-মূষিকাদির নৃত্যে শ্রবণ-নয়ন সার্থক করিতে থাকুন। বল দেখি ভাই! এ সকল কি আমাদের আরাধ্য দেবতার অবমাননা নয়?

সাধে কি আর পল্লী-কৃষক নারায়ণ হইতে নারাজ হইয়াছিল? বহুদিন পরে কৃষকের কুটীরে গুরুদেবের পদধূলি পড়িয়াছে। তাহার আর আনন্দের সীমা নাই। সে ভক্তিভরে যথাশক্তি প্রণামী দিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিল,—কৃতাঞ্জলিপুটে আশীর্ব্বাদ মাগিল। গুরুদেবও হাসিহাসি-মুখে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"বাবা! তুমি নারায়ণ হও।" কৃষক শুনিয়া কাঁদিয়াই আকুল; বলিল,—ঠাকুর! আমি এতই কি মহাপাতক কোরেছি যে, নারায়ণ হোতে যাব? গুরু ত অবাক্; তিনি বলিলেন,—কেন বাবা! কাঁদ কেন?—জগতে নারায়ণের চেয়ে বড় কে? তোমাকে সেই সবচেয়ে বড় নারায়ণ হবার আশীর্ব্বাদ কোরেছি।

আশীর্ব্বাদটা আর মন্দ কি হোয়েছে বল? কৃষক বলিল,—তা ঠাকুর! তিনি বড় আছেন বড়ই থাকুন; আমি কিন্তু তাঁর মত বড় হোতে চাই না। গুরু জিজ্ঞাসিলেন,—সে কি রকম? কৃষক বলিল,—ঠাকুর! আপনি কি আমাকে কয়েদীর মত দিন-রাত ঐ এঁধোঘরের কুলুঙ্গীতে তালাবন্ধ হোয়ে উপস কোরে পোড়ে থাক্‌তে বলেন? ঐ দিন নাই রাত নাই, কাণের কাছে ইঁদূর-ছুঁচোর কিচ্‌কিচিনী মশামাছীর পেন্‌পেনানী ভেন্‌ভেনানী শুন্‌তে, আর গায়ের উপর আরশুল্লার সডসড়ানি, কোলা-ব্যাঙের লাফানী ঝাঁপানী সইতে বলেন? না, তা আমি কিছুতেই পারবো না।

কৃষকের দোষ দিব কি? সে তাহার পল্লীবাসে নারায়ণদেবের যেরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়াছে, সেইরূপই বলিয়াছে। এ সকল কি আমাদের প্রশংসার কথা? বল ভাই! তোমরাই বল।

একা পল্লীগ্রামই চোরের দায়ে ধরা পড়ে নাই; এ শ্রেণীর দেবতার অবমাননা এখন অনেক সহুরে বাবুরও ঘরে-ঘরে। ঠাকুরদের সন্দেশের দায়ে সেদিন তো এক বাবুর বাড়ী ডাক্তার ডাকিতেই হইয়াছিল। হঠাৎ বাবুর এক বালক পুত্র কাঁদিয়া আকুল। কান্নাও আর থামে না, কারণও কিছু বুঝা যায় না। তখনই ডাক্তর ডাকা হইল। তিনি বালকের নাড়ী টিপিলেন, যন্ত্র-সাহায্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন,—রোগ টোগ কিছুই নয়; কেবল তাহার দাঁতের গোড়া দিয়া একটু রক্ত বাহির হইতেছে মাত্র। তিনি তাহারই চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বালক প্রকৃতিস্থ হইল। মুখে দুইচারিটা কথা ফুটিল। তখন তাহার জননী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—কি হোয়েছিল বাবা! পোড়েগিয়েছিলি,—না, আর কিছু হোয়েছিল? ছেলেও অমনি ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে

উত্তর দিল,—না মা! পোড়ে যাই নাই; আমায় ঠাকুরদের সন্দেশ খেতে দিয়েছিল।

কি সর্ব্বনাশ! 'নরম-নরম বাবুদের সন্দেশ' খাইতে অভ্যস্ত বাবুর বেটার কি ঐ 'রগে মার্‌লে রগ ভেঙে যায়' ঠক্‌ঠকে ঠাকুরদের সন্দেশ ভাল লাগে,—না, তাহার কাঠিন্য সে সইতে পারে? তাহাতে তাহার দুধে দাঁতের মেড়ে দিয়ে রক্ত না বেরিয়ে থাক্‌তে পারে কি? এখন বল দেখি ভাই! এ কথায় তুমি হাঁসিবে, না কাঁদিবে?

দ্বিতীয়তঃ,—ঐ যে কলিকাতার পথে পথে কষাইগুলো তোমার পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর মূর্ত্তি খাড়া করিয়া তাঁহার কাছে জীব-জবাইয়ের জঘন্য ব্যবসা চালাইয়াছে, তা দেখিয়া, দেবীপূজক তুমি, তোমার প্রাণে কি একটুও আঘাত লাগে না? জননীমূর্ত্তির এ অবমান দর্শনে তোমার কি একটুকুও আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় না? রসনার তাড়নায় তুমি যখন ঐ সকল স্থানে গমন কর, তখন কি একবারও সেই বীভৎস জীব-জবাইয়ের দৃশ্য তোমার দৃষ্টিপথে পড়ে না? ওঃ, কি ভীষণ সে দৃশ্য, লেখ্‌নীমুখে তাহা প্রকাশ করাই অসম্ভব। এটা যে তোমার করুণাময়ী মাতার শোচনীয় অবমান, তাহাও কি ভাই! তোমার একবারও মনে হয় না? যদি মনে না হয়, ধিক্ তোমার শক্তি-উপাসক নামে,—ধিক্ ধিক্ শতধিক্ তোমার রসনা-তৃপ্তি-লালসায়।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; ঐ অপূজিত দেবীমূর্ত্তির নিকটে অবৈধ—জবাইকরা মাংসকে কি তোমরা মেধ্য মাংস বলিয়া মনে করিয়া থাক? যদি তাই কর, তোমাদের অপেক্ষা ভ্রান্ত ও অহম্মুখ কে? তা তোমরা যখন ঐ বৃথা মাংসগুলা খাইতেছই; খাইবেও; তখন যবনের কসাইখানা হইতেই তো তাহা সংগ্রহ হইতে পারে? তোমাদের অনেককে ঐরূপ সংগ্রহ করিতে দেখি বলিয়াই ওকথা বলিতেছি; মর্ম্মান্তিক

দুঃখের সহিতই বলিতেছি। তা আর ঐ নোল্‌চের আড়ালটা কেন? ওটা তুলিয়া দিলেই তো সকল বালাই চুকিয়া যায়। ছিঃ ভাই! বড় লজ্জা, বড় লজ্জা!

তৃতীয়তঃ,—তোমরা আজকাল অনেকে বার্ডসাই সিগারেট ফুঁকিতে শিখিয়াছ। দাকাটা গুড়ুকে আর তোমাদের মন উঠে না। সিগারেট-বার্ডসাই তো তোমাদের মুখে লাগিয়াই আছে। তোমাদের দশা দেখে আমার এক রসিক বন্ধু বলেন,—জোট বাঁধিয়া বাবুর দল পথে চলিলে, ষ্টীম বোট যাইতেছে কি আর কিছু যাইতেছে, ঠিক বুঝে উঠা ভার! বন্ধুর কথা মিথ্যা নয়, ব্যাপারটা কতক ঐরূপই দাঁড়াইয়াছে বটে! তা ভাই! তোমরা বার্ডসাই সিগারেট ফোঁকো, আর যা-ই ফোঁকো, তাহার জন্য তোমাদিগকে কিছু বলিতেছি না; ট্রামে, সভায়, পথে ঘাটে,—তাহার চাম্‌সা গন্ধ যেমন সহিয়া আসিতেছি তেমনিই সহিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু ভাই! একটা কথা বলি, তোমাদের 'স্বদেশী হুজুক' দেখিয়া ব্যবসাদারের দল সিগারেটের বাক্সের উপর যে তোমাদের দেশপূজ্য দেব-দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেছে; আর তোমরা সিগারেট খাইয়া যেখানে-সেখানে সেই দেবদেবীর মূর্ত্তি আঁকা বাক্সগুলি ফেলিয়া ফেলিয়া দিতেছ; আর যে-সে সেই বাক্সগুলির উপর থুতু গয়ার ফেলিতেছে;—জুতা পায়ে মাড়াইয়া যাইতেছে; ইহাও কি তোমাদের দেব-দেবীর ঘোরতর অবজ্ঞা-অবমাননার কথা নয়? নিজের হৃদয়ের সহিত একবার পরামর্শ করিয়া দেখ দেখি ভাই! কথাকয়টা প্রকৃত কি না? প্রাণে বাজিবার মতন কি না?

[বঙ্গবাসী; ১৬ই মাঘ; ১৩১৬ সাল।]

ভগবান্ ভিখারী।

ভগবানের কথা নিয়ে রাম ও শ্যামের বিবাদ বেধেই আছে;—একবার চোখোচোখি হোতে যা দেরী। রাম বলে এক, শ্যাম বলে আর,—মতের মিল হয় না, কাজেকাজেই ঝগড়া বেধে যায়। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, বিবাদটা প্রায় "বিয়োগান্ত" না হোয়ে "মিলনান্তই" হ'য়ে থাকে।

ভগবান্ জিনিষটি বড় মিষ্টি,—তাই তাঁর কথাও খুব মিষ্টি; তা যে যে-ভাবেই আলোচনা করুক না কেন। আর কারো না হোক্, আমার ত নিজের এইরূপই বিশ্বাস। তাই আমি মাঝেমাঝে রাম ও শ্যামের ঝগড়া শুন্‌তে যেতাম,—শুনে অনেক নূতন কথা শিখ্‌তে পার্‌তাম,—একটু আনন্দও পেতাম।

একদিনকার কথা বলি। সে আজ কয়েক মাস হ'য়ে গেল, গড়ের মাঠের পশ্চিমদিকে—গঙ্গার ধারে রাম ও শ্যাম ব'সে আছে, আশেপাশে আরও দু'দশজন লোক,—যারা আমার মত তাদের ঝগড়া শুন্‌তে ভালবাসে, তারা কেহ দাঁড়িয়ে, কেহ বা ব'সে র'য়েছে। কাহারও মুখে কথাটি নাই—নড়াচড়াও নাই; ঠিক কে যেন একখানি ছবি তুলি দিয়ে এঁকে রেখেছে। দেখেই বোধ হোল, কোন কঠিন বিষয়েরই আলোচনা চোল্‌ছে,—দুজনের যে হোক একজন কি জবাব দেবে, তাই মনে-মনে ভাঁজ্‌ছে। আর সকলে তাই শুন্‌বে বোলে হাঁ কোরে রোয়েছে।

সেদিনকার সেই ছবিখানি আমার বড় ভাল লেগেছিল। সন্ধ্যা উৎরে গিয়েছে—চাঁদের আলোয় চারিদিক্‌টা ফুট্‌ফুটে হোয়ে উঠেছে,—গঙ্গার ছোটছোট ঢেউগুলি কল্‌কল্ কোরে হাজার-হাজার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা

চাঁদ নিয়ে খেলা জুড়ে দিয়েছে, ফাল্গুনের ফুর্‌ফুরে দক্ষিণে হাওয়ায় প্রাণটা যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে, আর সেই সুমিষ্ট সময়ে, সুমিষ্টের চেয়েও সুমিষ্ট ভগবানের কথায় কয়টি লোক আপনহারা হোয়ে রোয়েছে। বল দেখি ভাই, এ ছবিখানি দেখ্‌লে কার্ প্রাণ না আমোদে মেতে ওঠে,—কারই বা মন থেকে-থেকে নেচে না ওঠে?

কিছুক্ষণ পরে রামের ঠোঁট দুখানি কেঁপে উঠ্‌লো,—কথাও ফুট্‌লো। কথার সুরটি ভাদ্দরে রোদের মত খুব কড়াও নয়, আবার শরতের জ্যোৎস্নার মত তত কোমলও নয়; কিন্তু তাতে যেন একটু অভিমানের ভাব মাখানো আছে। রাম বোলে উঠ্‌লো,—তুমি ভাই, যা বলো যা কও, তোমার সকাম কর্ম্মের পক্ষপাতী আমি কিছুতেই হোতে পার্‌বো না। ঐ যে ভগবান্‌কে নানা রকম পূজার উপহারের লোভ দেখিয়ে বা তাঁর সঙ্গে কিছু ঘুষের বন্দোবস্ত কোরে "ধনং দেহি পুত্রং দেহি" প্রভৃতি দেহি-দেহি রবে দশদিক্ কাঁপিয়ে তোলা, আর সঙ্গে-সঙ্গে ভগবানেরও কাণ ঝালাপালা কোরে ফেলা, এটা আমার একেবারেই ভাল লাগে না। বরং আমার মনে হয়, যে ব্যক্তি ঐ রকম পূজার অছিলায়, যিনি সকলেরই ভিতর ও বাহিরে আছেন, সেই ভগবানের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে, তার মত হতভাগা আর দুটি নাই।

শ্যাম।—এ ভাই, তোমার বড়ই অন্যায় কথা। আমরা সংসারী;—আমাদের ধন চাই, মান চাই, পুত্র চাই, কত কি চাই। তা সে সকল আমরা ভগবানের কাছে চাইব না ত আর কার্ কাছে চাইব বল? ছেলে মা-বাপের কাছে আব্দার কোর্‌বে না ত আর কার্ কাছে কোর্‌বে বল? আমার মতে,—ভগবান্‌কে পূজাও কোর্‌তে হবে, আর সঙ্গে-সঙ্গে যা যা দরকার, তাঁরই কাছে চেয়ে-চিন্তে নিতে হবে। মা-বাপের পূজাও কোর্‌তে হয়, আবার যখন যা দরকার তা'ও তাঁদের কাছে যেচে

নিতে হয়। আমার বরং মনে হয়,—যে মা-বাপের কাছে,—ভগবানের কাছে আব্দার কোর্‌তে না পারে,—তার মত হতভাগা এ সংসারে খুঁজে পাওয়া যায় না।

রাম।—ভাই, রাগ ক'রো না, একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোনো দেখি। শুধু শুন্‌লেও চ'ল্‌বে না, বেশ কোরে তলিয়ে বুঝে দেখ্‌তেও হবে।—আচ্ছা, প্রথমত তোমায় জিজ্ঞাসা করি,—তুমি যে ভগবানের পূজা করো, সে ভগবান্ সকল দেশ সকল কাল ও সকল লোকের সকল কথা জানেন কি না?

শ্যাম।—নিশ্চয়ই তিনি সবই জানেন।

রাম।—তোমার মনের কথাও জানেন?

শ্যাম।—তা আর জানেন না?—জানেন বৈ কি।

রাম।—আচ্ছা ভাই, যিনি তোমার আমার—সংসারের সকলেরই মনের কথা জানেন, অথচ যিনি দয়ার সাগর, তিনি কি, তোমার কিসের অভাব,—তোমার প্রাণ কি চায়, তা আর জান্‌তে পারেন না,—না, সেই অভাব মিটিয়ে দেবার জন্য তাঁর দয়ার প্রাণ কেঁদে ওঠে না? তবে, তাঁর কাছে খামোকা চাইবার দরকার?

শ্যাম।—তোমার নিষ্কাম-কর্ম্মে কি মাথার দিব্বি দেওয়া আছে যে, ভগবানের কাছে কিছুই চাইতে নেই?

রাম।—হাঁ;—কিছুই চাইতে নেই; আছে কেবল ভগবান্‌কে। তা-ও অন্য কিছুর জন্য নয়,—ভগবানেরই জন্য,—ভগবানেরই প্রীতির জন্য।

শ্যাম।—তাহাতে লাভ?

রাম।—লাভ,—ভিখারীর মত তাঁর কাছে রোজ-রোজ গলাবাজি কোর্‌তে হয় না।

শ্যাম।—ভিখারী কি কেবল আমরাই;—তোমার নিষ্কাম-কর্ম্মীরা নন? আমরা না হয় ভগবানের নিকট ধন জন মান এই সব চাই, আর তাঁরা না হয়, সে সব কিছু চান না, কেবল ভগবান্‌কেই চান; তফাৎ ত এইটুকু?

রাম।—তোমরা ভিখারী, এক হিসাবে তাঁরাও ভিখারী, এ কথা সত্য; কিন্তু স্বর্গে ও নরকে—আকাশে ও পাতালে যতটা তফাৎ, তোমাদের ও তাঁদের মধ্যে যে তার চেয়েও অনেক বেশী তফাৎ আছে, সেটা জান কি?

শ্যাম।—কি রকম?

রাম।—এই দেখই না কেন, তোমরা ভিক্ষা কোরে কেবল ভিখারীর বদনামই কুড়োও, আর তাঁহারা ভিক্ষা কোরে সেই বদনাম একেবারে হজম কোরে ফেলেন। তোমাদের ভিক্ষায় ভিক্ষার ঝুলি প্রায় খালিই থাকে, কেবল গলাবাজিই সার হয়, আর তাঁহাদের ভিক্ষায় ভিক্ষার ঝুলি সদাসর্ব্বদা বোঝাই থাকে, অথচ অত গলাবাজি ক'র্‌তে হয় না। তোমরা ভগবানের কাছে দু'দশটা জিনিষ চেয়ে থাক, তা-ও সকল সময়ে পাও না,—তোমাদের কামনা-মাখানো কুৎসিত স্বর সে রাজ্যে পঁহুছায় না বোলেই তোমরা চেয়ে-চেয়েও পাও না,—তোমাদের গলাবাজিও ফুরোয় না; কিন্তু তাঁহারা ভগবানের কাছে, ভগবান্-ছাড়া—ভগবানের প্রীতি ছাড়া, আর কিছুই চান না, সুতরাং ভগবানের কৃপায় তাঁহাদিগকে আর কিছুই চাইতেও হয় না। তাঁহাদের ভিক্ষার ঝুলিটি বরং ক্ষণেক্ষণে উবছাইয়াই পড়ে। তাহাতে জগতের অনেক অভাগারই অনেক উপকার হোয়ে থাকে। এখন বল দেখি, এই দুই ভিখারীর মধ্যে ভাল কে?

শ্যাম।—ভিখারীর আবার ভাল-মন্দ কি?

রাম।—তা ত বটেই;—মুড়ি আর মিছরি দুই-ই এক, একথা তোমার মত অতিবড় বুদ্ধিমান্ ছাড়া আর কেউ বোল্তে পারে না। দেখ, যেমন মাতালদের মধ্যে এক রকমের মাতাল আছে, তাদের নাম—"পেঁচি মাতাল" তোমরাও ঠিক সেই রকম "পেঁচি ভিকিরী";—বুঝ্লে?

শ্যাম।—(কুপিতস্বরে)—দেখ, তুমি অমন কোরে আমাদের "পেঁচি ভিকিরী" বোলোনা বোল্ছি। ভিকিরী কে নয়?—আমরা ভিকিরী, যাঁরা নিষ্কামকর্ম্মের বড়াই করেন, তাঁরাও ভিকিরী, আর তাঁদের গীতার কেষ্টো ঠাকুর,—ঐ যাঁর দোহাই দিয়ে তাঁরা নিষ্কাম-ধর্ম্মের ধ্বজা উড়িয়ে থাকেন, সেই ঠাকুরটিও ভিকিরী। তুমি কি ব'ল্তে চাও, তিনি ভিকিরী নন? তিনি বরং আমাদের চেয়ে এককাটি সরেস।

রাম।—কিসে বুঝলে যে, শ্রীকৃষ্ণও ভিকিরী?

শ্যাম।—এর আর বোঝাবুঝি কি? সোজা-সুজি পোড়েই রোয়েছে, চোখ খুলে দেখ্লেই হোলো। এই দেখ না কেন, তিনি অর্জ্জুন বেচারিকে কেবল বোলেছেন,—"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"—"কুন্তীনন্দন! তুমি যা করো, যা খাও, যা হোম করো, যা দান করো, যা তপস্যা করো, তা সবই আমাকে দাও।" বাপ, এ কি কম ভিক্ষে! ঠাকুরটি আরও বলেন যে, —"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃত-মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"—যে আমায় ভক্তি কোরে পাতা, ফুল, ফল বা জল, যা কিছু দেয়, আমি তার ভক্তিভাবে দেওয়া জিনিষ সবই খেয়ে ফেলি।" উঃ, কি চালাকির ভিক্ষে! আমরা ভিকিরী বটে, কিন্তু গীতার ঠাকুরটির মত অমন প্যাঁচোয়া ভিক্ষে জানিনে বাবা! ঠাকুরটি শুধু ভিকিরী নন,—পয়লা-নম্বর প্যাঁচোয়া ভিকিরী।

রাম।—হাঁ, তিনিও ভিখারী বটেন, কিন্তু তোমাদের ভিক্ষে ও

আমাদের ভিক্ষে যেমন আলাদা, এইরূপ আমাদের সকলকার ভিক্ষে অপেক্ষা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভিক্ষে আলাদা শ্রেণীর।

শ্যাম।—সে কি রকম?

রাম।—আমাদের ভিক্ষে যেমন আমাদের নিজের জন্য, ভগবানের ভিক্ষে তেমন নয়, তাঁহার ভিক্ষে পরের জন্য—জীবের জন্য।

শ্যাম।—আহা হা হা, যা বোল্লে! যাও, তোমার কথা শুন্‌তে চাইনে।

রাম।—তুমি যে রেগেই অস্থির, তা বুঝ্‌বে কি? কথাটা একটু ভেঙ্গে-চুরে বলি, মন দিয়ে শুন দেখি।

শ্যাম।—আচ্ছা বল, কাণ আছে শুনে যাই।

রাম।—এই বোল্‌ছিলাম কি যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভিক্ষে আর আমাদের ভিক্ষে এক রকমের নয়। কেননা, আমাদের ভিক্ষেয় আমাদের স্বার্থ আছে, শ্রীকৃষ্ণের ভিক্ষেয় তাঁহার কিছুই স্বার্থ নাই। শুন্‌ছো তো?

শ্যাম।—হাঁ হাঁ শুন্‌ছি শুন্‌ছি, ও তো আগেই শুনেছি, তারপর কি ব'লে যাও না।

রাম।—একথাটা তুমি বোধ হয় স্বীকার ক'র্‌বে যে, অভাব না থাক্‌লে, কেউ কারুর কাছে কিছু চাইতে যায় না। যার অনেক টাকা আছে, সে আর কারুর কাছে টাকার জন্যে মাথা খোঁড়া-খুড়ি করে না, যার পুত্র আছে, সে আর পুত্রের প্রার্থনা কোরে সাত দেবতার দোর ধরে না। কেমন ঠিক্ কি না?

শ্যাম।—হাঁ হাঁ ঠিক্ ঠিক্, তুমি বোলে যাও, আমি শুনে যাচ্ছি।

রাম।—আচ্ছা, এখন জিজ্ঞাসা করি, 'ভগবান্' শব্দের অর্থটা তোমার মনে আছে কি?

শ্যাম।—হাঁ, আছে বৈ কি, ঐ যে কি বলে,—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

'ভগ' শব্দের অর্থ—সমস্ত ঐশ্বর্য্য; সমস্ত বীর্য্য (মণি-মন্ত্রাদির ন্যায় অচিন্ত্য শক্তি), সমস্ত যশ, সমস্ত সম্পত্তি, সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত বৈরাগ্য। এই ছয়টী যাঁহাতে পরিপূর্ণরূপে আছে, তিনিই 'ভগবান্'।

রাম।—ভাল কথা, যিনি ঐ ছয়টী ঐশ্বর্য্যে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ, যিনি আপনার আনন্দে আপনি ডগমগ, যিনি সকল দেশে সকল সময়ে সমভাবে বর্ত্তমান, তাঁহার আবার অভাব কি বস্তুর যে, তাহার জন্য তাঁহাকে ক্ষুদ্র জীবের কাছে ভিক্ষে ক'র্‌তে হবে? সূর্য্য কি কখনও জোনাকিপোকার কাছে ভিখারীর সাজে এসে থাকেন?

শ্যাম।—হ্যাঁ, ঠিক কথা।

রাম।—তবেই এখন দেখ, ভগবানের যখন আপনার নিমিত্ত ভিক্ষে করবার কোন প্রয়োজন নাই, অথচ দেখছি যে তিনি ভিক্ষা ক'র্‌ছেন, তখন বুঝতে হবে যে, এ ভিক্ষের কিছু আলাদা মতলব আছে।

শ্যাম।—সে মতলবটা কি ভাই, বল না? তোমার কথা আমার এখন বেশ ভাল লাগছে।

রাম।—তাহা ত পূর্ব্বেই বোলেছি যে, **ভগবানের ভিক্ষে নিজের জন্য নয়, জীবের জন্য। জীবের প্রতি করুণা ক'রেই তিনি ভিখারী সেজে থাকেন।**

শ্যাম'। কথাটা একটু খুলে বলনা ভাই?

রাম।—ঐ যেমন মনে কর,—মা আছে, আর ছেলে আছে। মার

কোন অসুখ নাই, কিন্তু অজ্ঞান ছেলে ওষুধ খেতে চাহে না, অথচ ওষুধ না খেলে রোগও সারে না। মার প্রাণে বড় মায়া, বড় দয়া। মা কি করেন, ছেলের জন্য—ছেলের রোগ সারবার জন্য—ছেলের হোয়ে আপনিই তেতো, কষা, ঝাল কত রকমের ওষুধ খেয়ে ফেলেন। আর তাইতেই ছেলের সকল রোগ সেরে যায়। অথচ ছেলে কেবল মায়ের মাই খেয়েই খালাস। এইরূপ আমরাও ভগবানের কাছে অবোধ শিশু মাত্র। রোগও আমাদের প্রবল। ঐ 'দেহি দেহি' রবই রোগের একটী প্রধান লক্ষণ। সেই লক্ষণ দেখেই দয়াল ভগবান্ আর থাকতে পারেন না। তাঁহার হৃদয় দয়ায় গ'লে যায়, আর আমাদের হোয়ে আপনিই ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে 'দেহি দেহি' ক'র্‌তে থাকেন। যাহার কাণে সেই দেহি দেহি শব্দ প্রবেশ করে এবং ভাগ্যবলে তাঁহার ঝুলিতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে, তাহারই রোগ চিরদিনের জন্য সেরে যায়। আর তাহাকে ভিক্ষে কর্‌বার জন্য ভবের হাটে ঘুরে বেড়াতে হয় না। বুঝ্‌লে কি ?

শ্যাম।—না ভাই, আরও একটু পরিষ্কার কোরে ব'ল্‌লে ভাল হয়।

রাম।—আচ্ছা, ভক্ত-চূড়ামণি প্রহ্লাদের কথাতেই তোমাকে এ বিষয়টী ভাল কোরে বুঝিয়ে দিতেছি। প্রহ্লাদ ব'লেছেন,—

"নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ ॥"

ইহার মতলবটা বুঝ্‌তে পারলে কি ?

শ্যাম।—না কিছুই না।

রাম।—আচ্ছা, বলি শোন। প্রহ্লাদ ব'ল্‌ছেন যে,—প্রভু আমার

জ্ঞানহীন জীবের নিকটে নিজের জন্য কিছুই চান না, কেননা তিনি আপনার লাভে আপনি পূর্ণ,—আপন আনন্দে আপনি বিভোর। তবে যে দেখি, তিনি 'এ দাও ও দাও' এইরূপ প্রার্থনা করেন, তা কেবল তিনি বড় 'করুণ' বোলে। তিনি জীবের প্রতি কৃপা কোরেই ভিক্ষে কোরে থাকেন মাত্র। জীব যে বিবিধ বিধানে ভগবানের পূজা কোরে থাকে, সে পূজায় ভগবানের কিছুই এসে যায় না, কিন্তু তাহাতে জীবের নিজের উপকারই হোয়ে থাকে। এ পর্য্যন্ত বুঝ্‌লে কি ?

শ্যাম।—কিছু কিছু—ভাসা ভাসা।

রাম।—আচ্ছা, এইবারে একটু ভাল কোরে মন দিয়ে শোন। প্রহ্লাদ যে একটী অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দিয়ে এ বিষয়টা বুঝিয়েছেন, সেটা শুনলেই বেশ পরিষ্কার বুঝ্‌তে পারবে।

শ্যাম।—সে দৃষ্টান্তটি কি ভাই ?

রাম।—শোন ব'লছি। মনে কর, একখানি আরসি তোমার সামনে রোয়েছে, আর তাহাতে তোমার মুখের প্রতিবিম্ব পোড়েছে। তোমার আসল মুখখানি হইল 'বিম্ব' আর যে মুখখানি আরসির ভিতর দেখা যাচ্ছে, সেটি হোলো 'প্রতিবিম্ব'। কেমন ঠিক কি না ?

শ্যাম।—হাঁ ঠিক।

রাম।—এখন মনে কর, যদি তোমার আরসির ভিতরের 'প্রতিবিম্ব' মুখখানিকে তিলক-টিলক দিয়ে বেশ সাজানো-গোজানো দেখতে ইচ্ছে হয়, তা হোলে কি করা উচিত ?

শ্যাম।—কেন, 'বিম্ব'-মুখখানিকে বেশ তিলক-টিলক দিয়ে সাজাইলেই হইল।

রাম।—ঠিক কথা, প্রতিবিম্বকে ভাল দেখতে হোলে বিম্বটিকেই ভাল করা দরকার। বিম্বে যাহা কিছু দেওয়া যাবে, প্রতিবিম্বে তাহাই দেখ্‌তে

পাওয়া যাবে। এখন আর একটী বিষয় ভেবে দেখ,—তোমার আসল মুখখানি যেমন 'বিম্ব' এবং আরসির ভিতরের মুখখানি 'প্রতিবিম্ব', বিম্ব-মুখখানিকে সাজাইলেই প্রতিবিম্ব-মুখখানিও আপনা-আপনি সেজে উঠে, তাহাকে আর স্বতন্ত্র কোরে সাজাতে হয় না। এইরূপ ভগবান্ হ'লেন 'বিম্ব' আর জীব হ'চ্ছে তাঁহার 'প্রতিবিম্ব' স্বরূপ। জীব ভগবান্‌কে যে সাজে সাজাইবে, আপনিও সেই সাজে আপনা-আপনি সেজে উঠবে। বিম্ব-স্বরূপ ভগবান্‌কে জীব যাহা কিছু অর্পণ ক'রবে, প্রতিবিম্ব-স্বরূপ জীব তাহা আপনা-আপনি অবশ্যই লাভ ক'রবে। কিন্তু জীব এমনই অজ্ঞানে অন্ধ যে, এত সহজ উপায় ছেড়ে—ভগবান্‌কে না সাজিয়ে, সর্ব্বদা আপনিই সাজবার চেষ্টা কোরে থাকে। কাজেকাজেই তাহার সমস্ত চেষ্টা ভস্মে ঘৃত-ঢালার মত ব্যর্থ হোয়ে যায়। এই নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের প্রতি করুণা কোরে উপদেশ দিয়েছেন যে,—জীব! তুমি যাহা কিছু কর, সমস্তই আমাকে অর্পণ কর, আমাকে দিলেই তোমার যোল-আনা লাভ হবে।

ভাই, এখন বুঝ্‌লে কি যে, ভগবানের ভিক্ষে কেন? ভগবানের ভিক্ষে যে নিজের জন্য নয়, জীবের জন্য, এখন বোধ হয় তোমার আর বুঝ্‌তে বাকী নাই?

শ্যাম।—হাঁ ভাই, বুঝ্‌লাম—নিজের জন্য যেমন আমরা নিজেই ভিখারী, জীবের জন্য তেমনি ভগবান্ ভিখারী। যা হোক ভাই, আজ তোমার কথায় আমার একটা মস্ত বড় সন্দেহ দূর হোয়ে গেল। রাগের মাথায় তোমায় হয় তো দু' একটা কড়া কথা বোলেছি, তা ভাই কিছু মনে কোরো না—আমার অপরাধ নিও না। আরও তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বার কথা অনেক আছে। আজ আর থাক, রাত্রি অনেক হ'য়ে গেছে, চল ঘরে যাই।

রাম আনন্দে শ্যামের গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। আমাদেরও বাড়ীর কথা মনে হইল। আর থাকা হইল না। পথে আসিতে-আসিতে কেবলই মনে পড়িতে লাগিল,—হায়, আমাদের জন্যই আমরা ভিখারী, আর দীন-হীন আমাদের জন্যই দয়াময় **ভগবান্ ভিখারী**।*

[বঙ্গবাসী ; ৭ই শ্রাবণ ; ১৩১৭ সাল।]

---

* এ লেখাটী বহুপূর্ব্বের,—১৩০৮ সালের। তখন যেরূপ ভাষায় লেখা হইয়াছিল, সেইরূপই রাখা হইয়াছে।

হাম্ মারা হ্যায়।

রাম-শ্যামের ত' তত্ত্বকথার বিরামই নাই। নিত্যই তাহারা গঙ্গাতীরে মিলিত হয়—নিত্যই তাহাদের শাস্ত্রীয় নানা প্রসঙ্গের আলোচনা চলে। তবে আমার ভাগ্যে সকল দিন শোনা ঘটে না। দৈবাৎ এক আধ দিন ঘটে মাত্র।

সেদিন আমি একটু আগে আগেই গঙ্গাতীরে গিয়াছি। বসিয়া-বসিয়া পতিতপাবনীর তরঙ্গ-রঙ্গ দেখিতেছি। হঠাৎ একখানি নৌকার দিকে আমার নজর পড়িয়া গেল। দেখি কি,—ভাঁটার টানে তরণীখানি একটু অসামাল হইয়া পড়িয়াছে। আর মাঝীগুলা মাথায়-বাঁকানো-লোহাবাঁধা বড়-বড় বাঁশের লগী দিয়া আশেপাশের নৌকা, জাহাজ বা বয়া ধরিবার মহা চেষ্টা করিতেছে। আন্তরিক চেষ্টা প্রায় ব্যর্থ হয় না। দেখিতে দেখিতে তাহারা কয়েকখানি নৌকা ও একখানি জাহাজে সেই লগীগুলি আটকাইয়া ফেলিল এবং নৌকাখানি সাম্‌লাইয়া লইল। তাহার পর তাহারা করিল কি,—না, সেই লগীগুলির বাঁকানো-লোহাবাঁধা মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া, গোড়ার দিক্ দিয়া,—যে সকল নৌকা ও জাহাজের সাহায্যে আপনাকে রক্ষা করিল, তাহাদিগকেই অবিশ্রান্ত গুঁতা দিতে দিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। লগীগুলার ব্যবহার দেখিয়া আমার মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল। ভাবিলাম,—এ সংসারে এই লগীজাতীয় লোকের সংখ্যা বড় অল্প নয়। কার্য্য উদ্ধার হইয়া গেলেই লাগাও গুঁতা, আর যতক্ষণ সেটি না হইতেছে, ততক্ষণ ধর গলায়—ধর পায়।

কতকগুলি লোকের কথোপকথনের শব্দে আমার ভাবের ঘোরটা ভাঙ্গিয়া গেল। পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখি,—রাম আসিয়াছে, শ্যাম আসিয়াছে, আরও কত-কে আসিয়াছে; রামে শ্যামে তত্ত্বকথাও জুড়িয়া দিয়াছে। আমার আর মায়ের লীলা দেখা হইল না। রাম-শ্যামের শাস্ত্রবিচার-প্রসঙ্গ শুনিতেই প্রবৃত্ত হইলাম।

সেদিন কথাটা হইতেছিল,—কর্ম্মবন্ধনের। রামের কথা,—জীবের কর্ম্মবন্ধন হইতেই পারে না; আর শ্যামের কথা,—নিজের দোষেই জীবের কর্ম্মবন্ধন। তাহাদের সেই শাস্ত্রীয় প্রীতিবিবাদের কিয়দংশ বলিতেছি।

রাম।—আচ্ছা ভাই! তুমি যে সেদিন বলিলে—"ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—ওহে হৃষীকেশ! (হৃষীক + ঈশ = হৃষীকেশ—ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা) তুমি হৃদয়ে থাকিয়া আমায় যে কর্ম্মে নিযুক্ত কর, আমি তাহাই করিয়া থাকি। তবে আমি চুরি-বাটপাড়ী খুন-যখম মদ-খাওয়া বেশ্যাবাড়ী-যাওয়া প্রভৃতি যাহা কিছু করি না কেন, সকলই সেই হৃষীকেশ করান বলিয়াই ত করি?—তবে আবার আমার (জীবের) সেই সেই কর্ম্মে বন্ধন হইবে কেন?

শ্যাম।—বেশ-বেশ, ভাল প্রশ্ন করিয়াছ ভাই! আমি ইহার উত্তর দিই শুন। ছাখ ভাই! তুমি যেরূপ বলিলে, ঐ শ্লোকের অর্থ ঐরূপই বটে, কিন্তু ভাব অন্যরূপ। সেই গভীর ভাব গ্রহণ করিতে না পারিয়া কিংবা ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ না করিয়া, অনেকে ঐ শ্লোকের দোহাই দিয়া অনেক অপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তুমি আমার কথাগুলি একটু মন দিয়া শুন, শ্লোকের প্রকৃত ভাব বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

রাম।—ভাই! তাহা হইলে আমি তোমার কাছে কত যে উপকার

পাইব, বলা যায় না। ঐ শ্লোকটা আমার মনে একটা মস্ত খট্‌কা বাধাইয়া রাখিয়াছে।

শ্যাম।—খট্‌কা আর রহিবে না; তুমি আমার কথা শুনিয়া যাও। প্রথমে তোমাকে একটা গল্প বলি শুন, তারপর শ্লোকের যথার্থ ভাব বুঝাইয়া দিব।

রাম।—বেশ ভাই তাই বল। আমি মন দিয়া শুনিতেছি।

শ্যাম।—এক হিন্দুস্থানী পালোয়ান ছিল। তার গায়ে ভারি জোর। একা একশতজনের মহড়া রাখিতে পারিত। তাহার সর্ব্বদা ইচ্ছা,—সে যে একজন মহা বলবান্ বীরপুরুষ,—তাহা জগতের সকলে জানিতে পারুক। কিন্তু সুযোগ আর ঘটে না। তাহার সঙ্গে যুঝিবার উপযুক্ত মল্ল ত' আর সহজে মিলে না, তাই তাহাকে মনের কথা মনেই চাপিয়া রাখিতে হইয়াছিল। একদিন হইল কি,—তাহার বাটীর অতি নিকটেই একটা মাঠ। পূর্ব্বরাত্রে সেই মাঠ দিয়া একজন ভারি জোয়ান ভোজপুরী পালোয়ান আসিতেছিল। তাহার সঙ্গে অনেক টাকা-কড়ি। ডাকাতে সন্ধান পাইয়া তাহার পাছু লইয়াছিল। ডাকাতরা অনেকে জোটপাট হইয়া অন্ধকার-রাত্রে বেকায়দায় ফেলিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে এবং টাকাকড়ি লইয়া চম্পট দেয়। পরদিন প্রাতঃকালে মুখে-মুখে সেই কথা প্রচার হইয়া পড়িল। হাজার-হাজার লোক সেই মৃত মল্লকে দেখিতে গেল। সকলেরই মুখে একই কথা,—ওঃ, এমন পালোয়ান আর দেখা যায় নাই;—এ যেন দ্বিতীয় ভীমসেন! কথায়-কথায় কথাটা গিয়া সেই জাহিরী-ভিখারী পালোয়ানের কাণেও পঁহুছিল। তাহার ধারণা,—তাহার মত বীর বুঝি এ জগতে আর নাই। তাই সে ভাবিল,—ভাল, একবার দেখিয়াই আসি না কেন, সে পালোয়ানটা কেমন?—আমার চেয়ে নিরেশ,—না, সরেশ? সে আর থাকিতে পারিল না,

বেশ সাজিয়া-গুজিয়া হেলিতে-দুলিতে—পৃথিবীকে যেন তৃণতুচ্ছ করিতে করিতে সেই মাঠে গিয়া হাজির হইল। গিয়া দেখে,—ভারি ভীড়, চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। সকলের মুখেই বিস্ময়ের চিহ্ন। সকলেই বলে,—"তাই তো, এ লোকটাকে মারিল কে,—না জানি সে-ই বা কেমন বলবান্?" সে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া ভিতরে গিয়া দেখে,—চারিদিকে পুলিশ-প্রহরী, মধ্যস্থলে সেই মৃত মল্লবীর; হিন্দুস্থানী দারোগা বাবু অবাক্ হইয়া বলিতেছেন,—"তাজ্জুব, ইস্‌কো কোন্ মারা?" মল্লের মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারও বিস্ময়ের সীমা রহিল না! সে ভাবিল,—এই ত আমার আপনাকে জাহির করিবার সোণার সুযোগ! এখন আমি যদি বলি যে, আমিই ইহাকে মারিয়া ফেলিয়াছি, তাহা হইলে জগৎ জুড়িয়া আমার নামটা ত' খুব জাহির হইয়া যাইবে। নামের লোভে অনেক পয়সাওলা লোক যেমন ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়াই সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসে, নামের লোভে পড়িয়া মূর্খ মল্লের দশাও তাহাই হইল। সে অমনি মহা লম্ফ ঝম্ফ করিয়া—হাতের গুলি ও পায়ের উরুতে ঘন-ঘন তাল ঠুকিতে ঠুকিতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"দারোগা সাহেব! হাম মারা হ্যায়।" এই কথা বলাও যা, আর অমনি দারোগার আদেশে তাহার হাতে হাত-কড়ি পড়িল, পায়ে ও কোমরে লোহার শিকলের বাঁধন পড়িল, আর শতশত পুলিশ-প্রহরী রুলের গুঁতা দিতে-দিতে তাহাকে থানায় লইয়া গিয়া গারদঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

এখন ভাবিয়া দেখ ভাই! সেই পালোয়ান ত' প্রকৃতপক্ষে কোন দোষেরই দোষী নয়,—সে ত' সেই ভোজপুরী পালোয়ানকে হত্যা করে নাই; তবে তাহার বন্ধন হইল কেন? অবশ্য বলিতে হইবে,—সে সেই ভোজপুরীকে বধ না করিলেও, সে যে গলাবাজি করিয়া বলিয়াছিল,—"হাম মারা হ্যায়",—সেই "হাম মারা হ্যায়"ই তাহার বন্ধনের কারণ।

এইরূপ ভাবিয়া দেখ ভাই, বস্তুপক্ষে জীবের নিজের কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই। অন্তর্য্যামী হৃষীকেশের নিয়োগ অনুসারেই সে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে; কিন্তু অজ্ঞানে অন্ধ জীব তাহা না দেখিয়া আপনার উপর বৃথা কর্ত্তৃত্বের আরোপ করিয়া থাকে,—অহঙ্কারে আত্মহারা হইয়া আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া পরিচিত করিতে ভালবাসে। একটু ভাবিয়া দেখনা কেন ভাই! বাস্তবিক যদি অন্তর্য্যামীই সমস্ত কার্য্য করাইতেছেন, তবে তুমি কেন বল—আমি গৌর আমি বধির, আমি কর্ত্তা আমি হন্তা, আমি বিদ্বান্ আমি গুণবান্? এই 'গাঁয়ে মানে-না আপনি মোড়ল' হইয়াই ত তোমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে! এই আমি—আমি—আমি করিয়াই তো তুমি যাচিয়া-সাধিয়া দুঃখের পশরা মাথায় লইয়াছ? তোমার এই অহঙ্কারই না তোমার বন্ধনের কারণ? হিন্দুস্থানী পালোয়ান কাহাকেও বধ না করিয়া—আপনাকে ঘাতক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, তাই তাহার বন্ধন হইল, আর জীব কোন-কিছু না করিয়াও অহঙ্কার করে বলিয়া—আপনাকে কর্ত্তা-রূপে জাহির করিতে যায় বলিয়া তাহার বন্ধন হয়, এ কথা ত' সোজাই পড়িয়া রহিয়াছে।

রাম।—হাঁ ভাই! তোমার গল্পটি বড় ভাল; স্বল্প কথায় মনের ময়লা ঘুচিয়া গেল। এখন আমার গীতার সেই শ্লোকটি মনে পড়িতেছে,—"অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" ঠিক ভাই! ঠিক, অহ-ঙ্কারের ঘোরে পড়িয়াই আমরা আপনাকে "কর্ত্তা" বলিয়া মনে করিয়া থাকি বটে।

শ্যাম।—কর্ত্তা সাজিলেই গোল। সংসারের ফাঁকে-ফাঁকে থাক, কোন বালাই নাই; 'কর্ত্তা' হইয়াছ কি অমনি বাঁধা পড়িয়া গিয়াছ। ভাই রে! আমরা যদি মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া—অহঙ্কারকে তাড়াইয়া দিয়া ভাবিয়া দেখি, দিব্য নয়নে দেখিতে পাইব,—প্রকৃতই আমাদের

কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই, অন্তর্য্যামী হৃষীকেশের প্রেরণাতেই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। আর ঐ কথাটা দৃঢ়রূপে বুঝিয়া যদি আমরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আর আমাদের পাপই বা কি—পুণ্যই বা কি? কর্ম্মের মূলে যখন অভিমান নাই, তখন সে কর্ম্মে বন্ধনও নাই। বন্ধনের কারণ যে ঐ অভিমান—ঐ হাম্ মারা হ্যায়।—বুঝ্লে?

রাম।—হাঁ ভাই! উত্তম বুঝিয়াছি। থাক্, আজ, আর অপর কথায় কাজ নাই, এই কথাটাই ভাল করিয়া প্রাণে-প্রাণে বসাইয়া লই।

এইরূপ কথোপকথনের পর রাম, শ্যাম এবং অন্যান্য সকলে আপন-আপন গৃহ অভিমুখে গমন করিল। আমিও আর সেখানে অপেক্ষা করিলাম না,—বাটী যাইতে উঠিয়া পড়িলাম। চলি-চলি সেই মন্ত্রের কথাই মনে পড়ে,—কেবলই মনে পড়ে—"দারোগা সাহেব! হাম্ মারা হ্যায়।"

[বঙ্গবাসী; ১৮ই ভাদ্র; ১৩১৭ সাল।]

দৈব ও পুরুষকার।

আজ আর রামও নয়, শ্যামও নয়, ভাগীরথীর তীরও নয়; আগা-গোড়াই আলাদা। সে-দিন সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় আমি বিডন-বাগানে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছি। হঠাৎ কাণে আওয়াজ আসিল,—একজন একজন। ঐ আওয়াজ ধরিয়া বাগানের পশ্চিম দিকে যাইয়া দেখি,—বরাহনগরের সেয়ারের গাড়ীর গাড়োয়ানগুলা ঐরূপ "একজন একজন" করিয়া গলাবাজি করিতেছে, আর আরোহী জুটাইয়া আনন্দমনে উত্তরের পথ ধরিতেছে। দেখিয়া কেমন মনে একটা ভাবের উদয় হইল। মনে হইতে লাগিল,—তাই ত, গাড়োয়ানেরা তো গাড়ীর ভিতরে চারি-জন, উপরেও অন্তত দুই তিন জন সোয়ারি না লইয়া গাড়ি ছাড়িতেছে না, তবে "একজন একজন" হাঁক ছাড়ে কেন? বুঝি বা "একজনকে" ডাকারই কিছু শক্তি আছে? তা না হ'লে ওরাই বা ডাকিবে কেন, আর যাত্রীই বা জুটিবে কেন? "পাঁচজন সাতজন" বলিয়া হাঁক ছাড়িলে, সে গাড়ীর ত্রিসীমায় বোধ হয় কোন যাত্রীই যাইবে না। কারণ ঐ ডাক শুনিয়াই তাহারা মনে করিবে,—ওঃ, এ যখন পাঁচ-সাত-জনকে ডাকিতেছে, তখন ইহার গাড়ীতে ঠিকানায় পৌঁছাইতে অনেক বিলম্ব হইবে। আর যে একজনকে ডাকে, তাহার গাড়ীতে হুড়হুড় করিয়া সোয়ারি জুটিয়া যায়। সকলেই ভাবে,—এ যখন একজনকে আহ্বান করিতেছে, তখন ইহার গাড়ীতে যাইলেই সত্বর বাড়ীতে হাজির হইতে পারিব। দেখিয়া-শুনিয়া আমিও একরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলাম,—গাড়োয়ানদের ঐ যাত্রী-ডাকা মন্ত্রই ঠিক। ডাকিতে হয় তো একজনকে

ডাকাই ভাল। ও ডাকায় লাভ বই লোকসান নাই, তা যে দিক্ দিয়াই দেখ। বলি, ঐ ডাকের গুণে যাত্রীদের সঙ্গে-সঙ্গে গাড়োয়ানও তো বাড়ীতে যাইয়া জিরাইতে পায়!

এইরূপ কত কি ভাবিতে-ভাবিতে আমি একটু পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়াছি। এমন সময় দেখি কি, আশেপাশে অনেক জায়গায় সবুজ-ঘাসের গালিচার উপর ছোট বড় অনেক মজলিস্ বসিয়া গিয়াছে, আর তাহাতে হরেক রকমের আলোচনা চলিতেছে। তার মধ্যে একটা খুব বড়গোছের মজলিসের কাছে আমি গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি, অধিকাংশই ইংরাজিশিক্ষিত নব্য যুবক। দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া তাহারা অনেক বড়-বড় দার্শনিক কথার আলোচনা করিতেছে। মধ্যস্থ কেহই নাই। ভোটেই প্রায় সকল বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যাইতেছে। প্রসঙ্গক্রমে রঙ্গঢঙ্গও যথেষ্ট চলিতেছে। তাহাদের সেই কথা শুনিতে আমার কিঞ্চিৎ কৌতূহল হইল। শুনিবার লোভ কিছুতেই সামলাইতে পারিলাম না।

কথায় কথায় কথা উঠিল—দৈব ও পুরুষকার লইয়া। একদল বলে,—দৈব বড়, অপর দল বলে,—পুরুষকার বড়। দুই দলই প্রবল, —কেহই হারিবার পাত্র নয়, আপন কথা সমর্থনের জন্য যুক্তি প্রমাণ দেখাইতে কেহই কম নয়।

পুরুষকারবাদীর প্রধান কথা,—পুরুষকার ছাড়া কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রাচীন পুরুষকারেরই নামান্তর দৈব। দৈব বলিয়া একটা স্বতন্ত্র কোন সামগ্রীই নাই।

দৈববাদীর প্রধান কথা,—দৈব ছাড়া পুরুষকার পুরুষকারই নয়। সে পুরুষকার একটা বৃথা নাম মাত্র। বিশেষত দৈবানুগ্রহ না হইলে পুরুষ-কার টুরুষকার কিছুই হইতে পারে না।

উভয় পক্ষের উহাই হইল বিবাদের মূল সূত্র। ক্রমশ ঐ সূত্রের টীকা ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল। প্রথম পক্ষ বলিল,—আরে রেখে দাও তোমার দৈব ; পুরুষকার পরিত্যাগ করিয়া তুমি একটা কিছু কর দেখি ? দৈব-টৈব ও-সব হ'লো কাপুরুষের কথা ;—"দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি"। এই কথার উপর একজন আবার টিপ্পনী কাটিয়া বলিল,—সাবাস্ ভাই ! বেশ ব'লেছ,—"ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ"—ঘুমন্ত সিংহের মুখে কখনও হরিণ আপনাআপনি আসিয়া প্রবেশ করেনা।

অপর পক্ষ বলিয়া উঠিল,—আরে থামো ভাই ! থামো; পুরুষকারই যদি সর্ব্বেসর্ব্বা হইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। তা হ'লে আর আকাট মুখ্যুগুলা গাদা-গাদা টাকা রোজগার ক'র্ত্তো না, আর বড়বড় লেখাপড়াজানা লোক-গুলো হা-টাকা যো-টাকা ক'রে মাথাকুটাকুটি ক'রে ম'র্ত্তো না। দৈব চাই ;—দৈব চাই ; দৈব ছাড়া সবই ছাই। "ন চ দৈবাৎ পরং বলম্"। দৈবের চেয়ে বল নাই।

এই ভাবে তরপে-তরপে উভয় পক্ষেরই কথার মাত্রা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। প্রথম পর্ব্বটা হাসিখুসির উপর দিয়া যাইতেছিল, দ্বিতীয় পর্ব্বে তাহা আর টিঁকিল না ; কথার সুর কিছু কড়া হইল, মুখের চেহারাও কিছু বিগড়াইয়া গেল। ক্রমে হাসিখুসির বদলে ঘুষাঘুষির উপক্রম হইয়া পড়িল। বেগতিক দেখিয়া একজন প্রবীণ ব্যক্তি মধ্যস্থ হইয়া উভয় দলের বিবাদ মিটাইতে অগ্রসর হইলেন।

তিনি হাসিতে-হাসিতে বলিতে লাগিলেন,—ছি বাবা ! তত্ত্ব-কথা লইয়া হাতাহাতি করিতে আছে কি ? তোমরাই তো বল,—"পাকাচুলোদের কথা বে-ওজর মান্য করিতে হয়।" তা দেখিতেই তো পাইতেছ, আমার মাথার একগাছি চুলও কালো নাই। সুতরাং তোমাদের কথাতেই তোমরা আমাকে মান্য দিতে বাধ্য,—আমার দু'টো কথা বিনা-আপত্তিতে তোমা-

দিগেকে শুনিতে হইবেই। তার পর লড়িতে হয় খুব লড়াই করিও, আমি তাহাতে আপত্তি করিব না।

বুড়া তো নয়, রসের গুঁড়া! তাঁহার সেই হাসিমাখা ভাব, তার উপর সেই টিপেটিপে একটি একটি মিষ্টিমিষ্টি কথা; ইহার কাছে উভয় দলই পরাজয় স্বীকার করিল। দুইটি পক্ষই ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল,—বেশ বেশ, আপনিই বলুন আপনিই আমাদের বিবাদের আগুন নিবাইয়া দিউন।

বৃদ্ধ তাহাদিগকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন,—দেখ বাবা! আকাশে ঐ যে পাখীগুলি উড়িতেছে, দেখিতেছ কি? ঐ পাখীদের দুইটী করিয়া পাখা আছে। দুইটী পাখা একজোট না হইলে একটি পাখা একাএকা কোন কাজই করিতে পারে না। ঐরূপ দৈবই বল, আর পুরুষকারই বল, ইহারা একা ভেকা। দুজনে মিলিয়ামিশিয়াই ইহারা আমাদের সকল কাজ করিয়া থাকে। তুমি দৈববাদী, তুমি গাছতলায় হাঁ করিয়া পড়িয়া আছ; তোমার মুখের মধ্যে টপ্ করিয়া একটি ফল পড়িয়া গেল; কিন্তু একটু পুরুষকারের আশ্রয় না লইলে—একটু কোঁক্ করিয়া ঢোঁক না গিলিলে আর তোমার ফলটি গলার তলায় যাইতেছে না। আর পুরুষকারবাদী তুমি, তুমি হয় তো পুরুষকার খরচ করিয়া গাছে চাপিয়াই ফল পাড়িয়া আনিলে, কিন্তু দৈব যদি তোমার একটু সহায়তা না করেন, তবে তুমি কিছুতেই তাহা খাইতে পারিবে না। হয় তোমার হাতের ফল হাতেই থাকিয়া যাইবে, না হয় কেহ বা কাড়িয়া লইয়া চম্পট দিবে। একটা-না-একটা ব্যাঘাত ঘটিবেই ঘটিবে। এ সম্বন্ধে তোমাদিগকে একটা গল্প বলি শুন। মন দিয়া শুনিলেই বুঝিতে পারিবে, এ দুয়ের কেহই কম নয়।

পশ্চিম-প্রদেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি ভারি পণ্ডিত। পণ্ডিতের আদর যত্নও যেমন করিতে হয়, করিতেন। তাঁহার সভায় সর্ব্বদাই শাস্ত্র-

প্রসঙ্গ চলিতেছে। তাহার আর বিরাম নাই। রাজার মনে দৈব ও পুরুষকার লইয়া কেমন একটা খট্‌কা বাধিয়া ছিল। তেমন তেমন পণ্ডিত পাইলেই ঐ কথা তুলেন। তাঁহাদের কথাও মন দিয়া শুনেন। কিন্তু মনের সন্দেহ আর মিটে না। একবার তিনি ঘোষণা করিয়া দৈব ও পুরুষকারবাদী অনেক পণ্ডিত একত্র করিলেন। উদ্দেশ্য,—বিচার করাইয়া যাহা হউক একটা সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া লইবেন। প্রায় একমাস ধরিয়া উভয় পক্ষের বিচার হইল। রাজাও শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু মনের ধোঁকা মন-ছাড়া হইতে চায় না। তিনি দেখিলেন,—উভয় পক্ষের কেহই কাহারও কথা সম্পূর্ণ অন্যথা করিতে পারেন না। কোন-না-কোন জায়গায় আসিয়া উভয়কেই ঠেকিয়া যাইতে হয়। অবশেষে একজন বিচক্ষণের উপদেশে তিনি দৈব এবং পুরুষকারের শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করিবার এক নবীন উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি করিলেন কি,—দৈব ও পুরুষকারবাদী দুইটী দলের দুইজন চাঁইকে লইয়া একটী অন্ধকারময় গৃহের মধ্যে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিলেন। সকালবেলাতেই এই কার্য্য করা হইল। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, দুইজন চাঁইএরও জঠরানল জ্বলিয়া উঠিল। দৈববাদী চুপচাপ যেখানকার সেখানেই বসিয়া রহিলেন। মনের ভাব,—যদি দৈব দেন তো এইখানে বসিয়াই আহার পাইব, না দেন তো উপবাসেই দিবস অতিবাহিত করিব। পুরুষকারবাদী কিন্তু স্থির হইয়া থাকিবার পাত্র নহেন। তিনি ঘরে ঢুকিয়া অবধি চারিদিকেই হাতড়াইয়া বেড়ান, কোথায় কি—কোথায় কি? ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় তিনি তো সেই ঘরটা যেন চালিয়া ফেলিতে লাগিলেন। যখন দেয়াল কিংবা মেঝের চারিদিকে হাতড়াইয়া কোথাও কিছু পাইলেন না, তখন তিনি তাঁহার মাথার পাগড়টী খুলিয়া ফেলিলেন। তাহার একপ্রান্তে একটা বড় গেঁট বাঁধিলেন। আর অপর প্রান্ত ধরিয়া উপর দিকে চারিধারে ছুড়িতে

আরম্ভ করিলেন। ছুড়িতে-ছুড়িতে সেই পাগড়ীর গেঁটটা যেন কিসে এক-বার আটকাইয়া গেল। তিনি অতি সন্তর্পণে পাগড়ীর গোড়া ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিলেন। আর অমনি উপর হইতে দমাস্ করিয়া একটা হাঁড়ী পড়িয়া গেল। তিনি অমনি বসিয়া পড়িলেন। হাতড়াইয়া দেখেন,—বাঃ, খাসা মিষ্টান্ন! তাঁহার আর আনন্দ দেখে কে? তিনি টপাটপ মিষ্টান্ন খাইয়া উদর পূর্ণ করিলেন।

এদিকে হইয়াছে কি? উপর হইতে জোরে হাঁড়ীটি পড়িয়া যাওয়ায় মিষ্টান্নগুলি অনেক দূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া গেল। সেই দৈববাদী যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখানেও কতকগুলা যাইয়া পঁহুছিল। তিনি আপন অঙ্গে কিসের স্পর্শ পাইয়া হাথ দিয়া দেখেন,—বাঃ, দৈব আমায় উত্তম আহারই পাঠাইয়াছেন! তিনিও সেই মিঠাই খাইয়া জঠরজ্বালা জুড়াইলেন।

মিষ্টান্ন তো খাওয়া হইল, কিন্তু পানীয় পাওয়া যায় কোথায়? অতি-রিক্ত মিষ্টান্ন ভোজনে উভয়েই পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন। দৈব-বাদী ভাবেন,—দৈব যদি যোগান, এইখানে বসিয়া-বসিয়াই পানীয় পাইব। আর পুরুষকারবাদী ভাবিলেন,—আমি তো পুরুষকার-প্রভাবেই এই আঁধারঘরে আহার সংগ্রহ করিয়াছি, তখন পুরুষকারের প্রভাবেই জলও জোগাড় করিব। এই ভাবিয়া তিনি সেই গেঁটবাঁধা পাগড়ীটি লইয়া উর্দ্ধদিকে—এদিকে ওদিকে ছুড়িতে আরম্ভ করিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপ করিতে-করিতে আবার যেন কিসের মধ্যে গিয়া তাঁহার সেই পাগড়ীর গেঁট আটকাইয়া গেল। তিনি আবার সাবধানে পাগড়ীর গোড়া ধরিয়া টান দিলেন। আর অমনি উপর হইতে ধপাস্ করিয়া একটা জলপূর্ণ কলসী পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ছিট্‌কানির জল গায়ে লাগিবামাত্র তিনি অম্‌নি তাড়াতাড়ি বসিয়া পড়িলেন এবং ভাঙ্গা খোলা হইতে জল পান করিয়া পিপাসা মিটাইলেন।

এদিকে সেই দৈববাদী যেখানে বসিয়া আছেন, সেই ভাঙ্গা কলসীর জল সেইখানে গড়াইয়া গিয়া তাঁহার গাত্রে ঠেকিল। তিনি অমনি মাথা হেঁট করিয়া সেই জল আকণ্ঠ পূরিয়া পান করিলেন। এইরূপে উভয়েরই ক্ষুধা-পিপাসার শান্তি হইয়া গেল। একজন পুরুষকারের, অপর জন দৈবের জয়জয়কার দিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন।

নিশার অবসান হইয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে নরনাথ পাত্রমিত্র-প্রভৃতির সহিত আসিয়া সেই গৃহের চাবি খুলিয়া ফেলিলেন। যদিও তিনি সেই ঘরে উভয়ের আহারের উপযুক্ত প্রচুর মিষ্টান্ন ও জল উপরের তাকে রাখাইয়া দিয়াছিলেন, তবুও কি জানি কি হইল,—দুইজন নিরীহ ব্যক্তি হয় তো উপবাসে কতই না ক্লেশ পাইতেছেন, ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ঘরের দরোজা খুলিয়া তাঁহার সে চিন্তা অন্তর্হিত হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন,—দুইজনেই আনন্দমনে বসিয়া রহিয়াছেন।

রাজা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সভামধ্যে আগমন করিলেন। দুইজনকেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেমন, আপনারা কল্য কিছু খাইতে-টাইতে পাইয়াছেন কিনা? দৈববাদী বলিলেন,—হাঁ মহারাজ! দৈব-প্রসাদে প্রচুর মিষ্টান্ন এবং পানীয় বসিয়া-বসিয়াই পাইয়াছি। পুরুষ-কারবাদীও বলিয়া উঠিলেন,—হাঁ মহারাজ! পুরুষকারের প্রভাবে আমি প্রচুর মিষ্টান্ন এবং পানীয় সংগ্রহ করিয়াছি।

উভয়ের বিশেষ বিবরণ অবগত হইয়া মহারাজের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সেই দিন হইতে তাঁহার মনের খট্‌কা মিটিয়া গেল। তিনি প্রাণে-প্রাণে বুঝিলেন যে,—দৈব ও পুরুষকার উভয়েই সমান—উভয়েরই প্রভাব অতুলনীয়।

বৃদ্ধের বাক্য শুনিয়া উভয়পক্ষের বিবাদ মিটিয়া গেল। সকলে তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া বিদায় লইলেন, আমিও সেই গাড়োয়ানদের কথা ও এই বৃদ্ধের কথা অন্তরে অন্তরে আলোচনা করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগত হইলাম।

[বঙ্গবাসী ; ২৩শে পৌষ ; ১৩১৭ সাল।]

বুড়ার বড়াই।

আজ আবার সেই রাম-শ্যাম, আবার সেই ভাগীরথীতীর, আবার সেই তাহাদের তত্ত্বকথা। ঠাণ্ডা পড়িয়া অবধি গঙ্গাতীরে আর বড় যাই না, এদিন প্রাণটা কেমন করিতে লাগিল, অনেকটা বেলা থাকিতেই গঙ্গাতীরে গিয়া বাবুঘাটে বসিয়া আছি। রেঙ্গুণ হইতে একখানি জাহাজ আসিল। পাশেই চাঁদপাল ঘাট; সেই ঘাটের জেটিতে জাহাজখানি ভিড়াইতে লাগিল। জেটিটা লোকেলোকে ভরিয়া গিয়াছে,—কেহ বা বন্ধুকে স্বাগত করিতে আসিয়াছে, কেহ বা মনিবের মন যোগাইতে আসিয়াছে; তার উপর মুটে-মজুর গাড়োয়ান-সহিস তো আছেই। এদিকে তাহাদের হৈহৈ রব, ওদিকে জাহাজের উপর আরোহীদের নামিবার আয়োজনে বেজায় গোলমাল বাধিয়া গিয়াছে। ইহারই ভিতর হইতে কাপ্তেনসাহেবকে কি ভাবে কোথায় দড়ি-শিকল বাঁধিয়া—চরকি কল ঘুরাইয়া ধীরেধীরে জাহাজখানিকে জেটির গায়ে জুড়িয়া দিতে হইবে, তাহার উপদেশ খালাসীগণকে দিতে হইতেছে। তিনি করিয়াছেন কি? একটা বড় বাঁশী—দেখিতে ঠিক গ্রামোফোনের সেই ধুতূরাফুলের ধরণের চোঙার মত,—সেই বাঁশীটি মুখে দিয়া যাহা যাহা বলিবার বলিয়া যাইতেছেন, আর খালাসীরা সেই বাঁশীর ভাষা ধরিয়া খাসা বাঁধন-ছাঁদন সকল কাজ সাধন করিয়া ফেলিতেছে। দেখিয়া আমার কেমন মনে হইতে লাগিল,—কাপ্তেন সাহেব যদি বাঁশীতে কথা না কহিয়া কেবল মুখেই কথা কহিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কথা হয় বাতাসেই ভাসিয়া যাইত,—না হয় গোলেমালেই মিশিয়া যাইত, খালাসীদের কাণে আর তাহা পঁহুছাইত

না। তা গোলমালের জমাটীর মাঝে আপন কথা জানাইতে হইলে বাঁশীর কথাই চাই। তাই কি, আমাদের দেহ-জাহাজের কাপ্তেন-টিও বাঁশীতেই কথা কয়,—বটে? এ জাহাজ জেটির গোলমাল আর কতটুকু গোলমাল? যে গোলমালে আমরা পড়িয়া আছি, তাহার কাছে এ তো কিছুই নয়। সেই গোলমাল ভেদ করিয়া আমাদিগকে তাঁহার কথা শুনাইতে গেলে তো বাঁশরীই চাই। ভাল রে ভাল, ঐ যে কলেকলে বড়-ডাকে বাঁশী বাজে, সে-ও তো ঐ কোলাহলভেদী ভৃত্যবর্গের আহ্বান? সমরপ্রাঙ্গণে কামান-বন্দুকের তুমুল রোল ভেদ করিয়া কমাণ্ডারের বিগল-বাজনাও তো সেনাগণের পরিচালনের জন্য? এইরূপ কতকি ভাবিতে-ভাবিতে একটু অন্যমনস্কভাবে বসিয়া আছি, এমন সময়ে অদূরে সেই রাম-শ্যামের পরিচিত কণ্ঠস্বর আমার অন্যমনস্কতা ভাঙ্গাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি চাহিয়া দেখি—ঘাটের উপরে চাঁদনিতে মহা মজলিস বসিয়াছে। রাম ও শ্যামে কথা-কাটাকাটি চলিতেছে, শ্রোতাও অনেকগুলি জুটিয়াছে। 'বাঁশীর কথা'র কথাটা তখনকার মত অন্তরে ঢাকিয়া রাখিয়া আমি তাহাদের কথা শুনিতে চাঁদনি-অভিমুখে চলিলাম। গিয়া দেখি,—আজিকার তর্কটা বুড়াদের বড়াই লইয়া। তাহার একটু পরিচয় দিই।

রাম লইয়াছে বুড়াদের পক্ষ, শ্যাম হইয়াছে তাহাদের বিপক্ষ। রাম বলে,—আমাদের দেশে ছেলে-পুলেরা যে দিন-দিন জাহান্নমে যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে—বৃদ্ধদের বচন অমান্য করা,—তাঁহাদের উপদেশ উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেওয়া। পূর্ব্বে কিন্তু এমনটি ছিল না। তুমি যে কোন ইতিহাস, পুরাণ বা প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে—সেকালে বৃদ্ধের সেবা না করিলে বিদ্যা অর্জ্জন বৃথা হইয়া যাইত,—বহুদর্শিতা-লাভ কল্পনার পথেই বিচরণ করিত, অধিক কি, যে বৃদ্ধসেবা না করিবে, ভদ্র-সমাজে তাহার আসন পাওয়া দুষ্কর

হইয়া উঠিত। তাই বাধ্য হইয়া সকলকেই বৃদ্ধের পদতলে বিনীত শিষ্যের মত আশ্রয় লইতে হইত। কিন্তু এখনকার শিক্ষার প্রভাব, কিংবা কালেরই প্রভাব, যাহার প্রভাবেই হউক, আজকালকার ছেলে-পুলেরা আর বুড়াদের মানিতে নিতান্ত নারাজ। তাহাদের কাছে এখন অতিবড় পণ্ডিত বুড়াও—মূর্খের মূর্খ মহামূর্খ। বাছাধনেরা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, বুড়াদের পুঁজিতে যে অভিজ্ঞতা যে ভূয়োদর্শনটুকু রহিয়াছে, বার্দ্ধক্যের সীমায় আসিয়া না পঁহুছিলে সেটুকু পাইবার নয়। অথচ বৃদ্ধের উপদেশ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শুনিলে অনায়াসেই তাহা আয়ত্ত করা যাইতে পারে। বরং এ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে বৃদ্ধকে যে ক্লেশ যে উদ্বেগ পাইতে হইয়াছিল, মাঝে হইতে সেটুকুও বাঁচিয়া যায়। সেই জাননা, একজনের পিতা মরিবার সময় তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন,—দেখ বাবা! আমি ত চলিলাম, তা তোমরা আমার এই কয়টী আদেশ পালন করিও, কখনই ক্লেশ পাইবে না। প্রথম কথা—তে-মাথার কাছে উপদেশ লইবে, দ্বিতীয়—বাড়ীতে হাট বসাইবে, তৃতীয়—চামর দিয়া ঘর ছাওয়াইবে, চতুর্থ—গরাসে-গরাসে মাছের মুড়া খাইবে।

পিতা তো মরিলেন। পুত্রের বয়স অল্প, তার উপর বুদ্ধি অপরিপক্ক। সে পিতার উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া প্রথমটি বাদ দিয়া অপরগুলির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। অনেক টাকা খরচ করিয়া বাড়ীতে হাট বসাইল। পূর্ব্বে যাহাদের হাট ছিল, তাহাদের সহিত দাঙ্গাহাঙ্গামা করিয়া মামলা-মকদ্দমায় অনেক অর্থ নষ্ট করিয়া ফেলিল। প্রকৃত চামর দিয়া ঘর ছাওয়াইল। তাহাতেও অনেক ব্যয় হইয়া গেল। আর বড়মানুষী-চালে বড়বড় মাছের মুড়া দিয়া আগাগোড়া ভাত খাইয়া-খাইয়াও প্রচুর পয়সা খরচ করিয়া দিল। ফলে অল্প দিবসেই তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল। শেষ সে চিন্তা করিতে লাগিল,—তাই ত, বাবার উপদেশে চলিয়া তো

সর্ব্বস্বান্ত হইলাম, এখন উপায় কি ? ভাল, তে-মাথার কাছে উপদেশটাই একবার লওয়া যা'ক না কেন ? তা তে-মাথাটা কি ? তে-মাথা তো তিনটা রাস্তার একসঙ্গে মিশামিশি ? সে আমায় কি উপদেশ দিবে ? আচ্ছা, ঐ যে বুড়াগুলো দুইটি হাঁটুতে ও মাথাতে এক করিয়া বসিয়া থাকে, উহারাই কি তে-মাথা ? এ কথাটা একজন বুড়াকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যা'ক না কেন ? এই ভাবিয়া সে একজন বৃদ্ধকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হাঁ মহাশয় ! আমার বাবা মারা যাবার সময় আমায় কয়েকটি উপদেশ দিয়া যান ; তাহাতে তো আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি ;—কেবল একটা উপদেশের কিছুই করিতে পারি নাই। সেটা হইতেছে—তে-মাথাদের কাছে উপদেশ লওয়া। আপনি আমার অপরাধ লইবেন না, বলি,—জিজ্ঞাসা করি,—আপনারাই কি তে-মাথা ? বৃদ্ধ বলিলেন,—হাঁ বাবা, ঠিকই ঠাওরাইয়াছ,—আমরাই তে-মাথা ; তা তোমার পিতা কি কি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন বল দেখি ? সে সেই চারিটি উপদেশের কথাই বলিল। শুনিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—এই দেখ বাবা, তোমার বাবার প্রথম উপদেশ হইল,—আমাদের কাছে মতলব লওয়া ; তা তুমি তাহা না লইয়া আপনার খেয়ালের বশে চলিয়াছিলে, তাই সর্ব্বনাশও করিয়া ফেলিয়াছ। যাহা হইবার তাহা তো হইয়া গিয়াছে ; এখনও সময় আছে, এখনও যদি আমাদের উপদেশমত চল তো আবার উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। সে বিনয়-বচনে বলিল,—মহাশয়, আপনি আদেশ করুন, যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। বৃদ্ধ বলিলেন,—দেখ বাবা ! বাড়ীতে হাট-বসান কি জানো ? উহার অর্থ হইতেছে—বাড়ীতে পাঁচটা গাছপালা শাক-শব্জী আজ্জান। চামর দিয়ে ঘর ছাওয়াটা হচ্ছে,—উলুখড় দিয়া ঘর ছাওয়াইয়া লওয়া। আর গরাসে-গরাসে মাছের মুড়া খাওয়ার মানে—চুণাচানা ছোট মাছ—অল্প দরে যাহা মিলে, তাহা

দিয়াই অন্নগুলি উদরস্থ করা। বুঝিলে বাবা! এই ভাবে চলিলে আর তোমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না। আগে আমাদের কাছে আসিলে আমরাও এই কথাই বলিয়া দিতাম।

বলিতে কি, বৃদ্ধের উপদেশে সে অল্পদিনের মধ্যেই মানুষের মত মানুষ হইয়া উঠিল,—গার্হস্থ্য-সুখে যথার্থই সুখী হইতে পারিল। এখন ভাই! বুড়াদের মাহাত্ম্যটা একবার বুঝিয়া দেখ।

শ্যাম আজ আর বড় রামের কথার প্রতিবাদ করিবার অবকাশ পাইতেছিল না। রামের কথা থামিবামাত্র একটু মুখ টিপিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিয়া উঠিল,—তোমার ও বোস্‌পুরাণো কথা রাখিয়া দাও। বুড়া হইলেই বাহাত্তুরে ধরে, বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পায়, ইন্দ্রিয়সকল বিকল হয়, কি বলিতে কি বলে, কি করিতে কি করিয়া বসে, তখন তাহাদের কথা কি আর গ্রাহ্যের ভিতর আনিতে আছে?

রাম বলিল,—বটে? তাই সেই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অবসানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শোকবিহ্বল যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে লইয়া কুরুদের বুড়া পিতামহ ভীষ্মের নিকটে গিয়াছিলেন,—না? যুধিষ্ঠিরের যে শোক কেহ নিবারণ করিতে পারিলেন না, এমন কি ভগবান্ পর্য্যন্ত হার মানিয়া গেলেন, সেই শোক ভীষ্ম বুড়াই দূর করিয়া দিয়াছিলেন। হউক বুড়ার দেহ অচল, হউক বুড়ার ইন্দ্রিয় বিকল, কিন্তু তাহার জ্ঞান থাকে টনটনে। সংসারের পিচ্ছিল পথে চলিবার পরামর্শ দিতে, বিপদের বেড়া-আগুন নিবাইবার মতলব বলিয়া দিতে, অশান্ত প্রাণে শান্তি আনিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে, বুড়ার মত মন্ত্রী আর মিলিবার নয়। একটা রহস্যের কথা বলি। একবার একজনদের মেয়ের বিয়ে। বর বিদেশ হইতে আসিবে। তাহারা বরেদের বলিয়া দিল,—তোমরা বরযাত্রের সঙ্গে বুড়া আনিতে পারিবে না। তাহারাও রাজি হইল। মুখে রাজি

হইলেও কিন্তু তাহারা বর লইয়া যাইবার সময় বুড়া লইয়া যাইতে ছাড়িল না। তাহারা একটা বড় পেঁটরার মধ্যে একজন বুড়াকে পূরিয়া লইয়া গেল। কোনের বাড়ী গিয়া দেখে,—ভারি জমকাল আসর, চারিদিকে ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো, সাদা ধপধপে জাজিম-ঢাকা বিছানা, সাজানো-গোজানো যেমন হইতে হয়। বর্ষাকাল, পল্লীর পথ, সকলেরই এক-পা কাদা; পা না ধুইয়া কেহই বিছানায় বসিতে পারিতেছে না; অথচ পা ধুইবার জলটলের কোন বন্দোবস্তই নাই। তাহারা বড় মুস্কিলেই পড়িয়া গেল। অনেক চাওয়াচাওয়ীর পর একজন চাকর একপাত্র জল আনিয়া হাজির করিল। সে পাড়াগাঁয়ে এঁটেল মাটির কাদা, একপাত্র জলে তাহার কি হইবে? তাহাতে একজনের পায়ের বুড়া-আঙ্গুলের কাদা ঘুচানো ভার। তাই তাহারা বারবার জলের জন্য জোর তলব করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফল ফলিল না। ঘণ্টাখানেক পরে মাত্র আর একপাত্র জল তাহাদের সমক্ষে আনিয়া রক্ষিত হইল। সকলে দেখিল,—বিষম বেগতিক। করা যায় কি? পথশ্রমেও তো না বসিয়া থাকা যায় না। তখন তাহারা কাতরভাবে সেই প্যাঁটরায়-পোরা বুড়ার কাছে গিয়া যথাকথা বিজ্ঞাপিত করিল। বুড়া বলিল,—তার আর কি? তোমারা এক কার্য্য কর, চারিদিকেই তো বাঁশের বেড়া, বাঁশের ছাউনি, ঐ বাঁশের চিয়াড়ি কিছু সংগ্রহ কর। সেই চিয়াড়ি দিয়া একেএকে পায়ের কাদাগুলি চাঁচিয়া ফেল, তার পর সামান্য জল দিয়া পা ধুইয়া ফেলিলেই সকল লেঠা চুকিয়া যাইবে। তা ঐ দুই-পাত্র জলে দুইশত জনেরও পা ধুইতে ভাবিতে হইবে না। তাহারা তখন বৃদ্ধের বচনই কার্য্যে পরিণত করিল। ফলে লজ্জা চিন্তা ও ক্লেশের দায়ে অব্যাহতি পাইয়া ভদ্রলোকের মত সেই বিছানায় যাইয়া বসিল। তখন সেই কন্যাপক্ষের লোকেরা ধরিয়া বসিল,—বার কর, কোথায় আছে বার

কর, তোমাদের সঙ্গে বুড়া আছেই আছে। অনেক খোঁজাখুঁজীর পর তাহারা মহা হাস্যকোলাহলের মধ্যে সেই প্যাঁটরার ভিতর হইতে বুড়াকে টানিয়া বাহির করিল!

বুঝলে ভাই শ্যাম! বুড়াদের উপদেশের জোর কত? তা আজ অনেকটা রাত্রি হইয়া গিয়াছে; নচেৎ তোমাকে এ সম্বন্ধে আরও দুইচার কথা শুনাইয়া দিতাম। আজ এইখানেই 'ইতি' করিতে হইতেছে।

শ্যামও বলিল,—আজ কথাটা তবে জাঁকড়ে চাপাই থাক। বাদবাকী কথা শুনিয়া পাকাপাকি করা যাইবে। কিন্তু আমিও সেদিন তোমাকে দুইটা কথা না শুনাইয়া ছাড়িব না।

বেশ বেশ তাহাই ভাল, বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল, আমিই বা আর থাকিয়া করিব কি, আমিও চলিয়া আসিতে লাগিলাম; কিন্তু বুড়া ও বাঁশরীতে আমার অন্তরে এমন সমর বাধাইয়া দিল যে, কাহাকে রাখিয়া কাহাকে লই, কিছুই ঠিক করিতে পারি না। শেষ কোথাকার এক কিশোরের বাঁশরীই যেন বুড়াকে জয় করিয়া ফেলিল। আমি তাহাকেই লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

[বঙ্গবাসী; ১৪ই মাঘ; ১৩১৭ সাল।]

ছোঁড়ার বড়াই।

সেদিন তো জলিবোটের কথাতেই কাটিয়া গেল, বুড়ার প্রসঙ্গ বলাই হইল না। আজ কিছু বলি। শ্যাম সেদিন রামের কথার উতোর গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে,—বুড়ার বদলে ছোঁড়ার গুণ গাহিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। শ্যামের কথা,—তুমি ভাই! যা বলো যা কও, আমি কিন্তু তোমার মত ঐ বুড়াদের ঢালোয়া প্রশংসা করিতে প্রস্তুত নহি। আমার মতে—প্রশংসা করিতে হয় তো বরং ছোকরাদের। তুমি যদি জিদ বজায় রাখিবার আগ্রহ ছাড়িয়া আমার কথাগুলি শুন, বোধ হয় তুমিও আমার সহিত একমত হইতে পারিবে। বলি ভাই! আজকালের বুড়ারাই না প্রায় ছোঁড়াদের মাথা খাইতেছে? তাহারা আপন আদর্শ বিগ্‌ড়াইয়া দিয়া আর পাঁচজনকেও না বিগড়াইয়া ফেলিতেছে? এই দেখনা কেন, বুড়া তামাক খাইবে, চাকরবাকর না থাকে না হয় নিজেই সাজিয়া খা, তা নয়—হুকুম করিবে কিনা সেই কচি ছেলেকে। ছোট ছেলে, সে আর অত শত কি জানে বল, পাঁচদিন বাবাকে সাজিয়া দিতে দিতে একদিন তাহার তামাক খাইতে লোভ হইল। ভাবিল—বাবা যখন খান, তখন আমিই বা খাইব না কেন? এইরূপে তামাক হইতে ক্রমশ সিদ্ধি গাঁজা আফিম চরস প্রভৃতিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতে লাগিল। ক্রমেক্রমে জাহান্নমে যাইতে তাহার আর বড় বিলম্ব হইল না। বাছাধন 'বিশকর্ম্মার বেটা বিয়াল্লিশকর্ম্মা' হইয়া বসিল। তারপর আরও দেখ, বুড়া সন্ধ্যাবন্দনা করিবে না, সদাচারের একটীও প্রতিপালন করিবে না, আহারবিহারের বিচার করিবে না, এ অবস্থায় তাহার দৃষ্টান্তে তাহার ছেলেপুলেরা কখনও ভাল হইতে পারে কি?

নীতির মাথায় লাতি মারিতেও বহু বুড়া বেশ মজপুত। পাওনাদার আসিয়া বুড়াকে ডাকাডাকি করিতেছে, বুড়া করিল কি,—ছেলেকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল,—যা বোলে আয়—বাবা বাড়ীতে নাই। শিশু তো যাহা দেখিবে, তাহাই শিখিবে ? কাজেকাজেই সে শিখিয়া ফেলিল,—পাওনাদার আসিলে এইরূপই বুঝি বলিতে হয়, মিথ্যা কথা বলিলে বুঝি দোষই হয় না। বল ভাই রাম, তুমিই বল, আজিকালিকার কয়টা বুড়া ছেলেপুলেদের মুখের দিকে তাকাইয়া আপনাকে স্বধর্ম্ম-সংরত ও সংযত করিয়া থাকে ? করে না বলিয়াই তো তাহাদের কৃত কর্ম্মের ফলে পরিণামে হাড়েহাড়ে জ্বলিতে হয়। জ্বালা কেবল এই লোকে নয়, পরলোকেও যাইয়া পঁহুছায়। তখন আর তাহার দুঃখ রাখিবার স্থান থাকে না। তাহার হাতে গড়া বিষবৃক্ষের ফল তাহাকেই উপভোগ করিতে হয়।

ভাইরে, এ সংসারে আদর্শ হইতে হইলে অনেক সংযমসাধনের আবশ্যক। অনেক প্রলোভন হইতে আপনাকে বাঁচাইতে না পারিলে আর অপরের শিক্ষকের আসন গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজিকালি অনেক পিতা বা অভিভাবক শ্রেণীর বৃদ্ধগণ এ কথাটা চিন্তা-পথেই আনেন না। ফলও সেইরূপই হইতেছে। ছেলেরা সব অধার্ম্মিক ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এই বুড়ারাই আবার দুঃখ করিয়া বলেন,—ছেলেগুলা মানুষ হইল না। হইবে কোথা হইতে ? তোমরা যে নিজেই মানুষ হইলে না,—মানুষ হইতেও শিখাইলে না ? হাঁ ভাই রাম! তুমি কি এই বুড়াদেরও আরাধনা করিতে বল ?

রাম আর আজ বড় কিছু বলিতেছে না, কেবল ফিক্‌ফিক্ করিয়া হাসিতেছে, আর এক আধবার বলিতেছে—হাঁ হাঁ, ব'লে যাওনা ব'লে যাওনা, তারপর যা ব'লবার ব'লব এখন। এইবার কিন্তু সে শ্যামের কথার প্রত্যুত্তরে বলিল,—আচ্ছা ভাই, তোমার মতে বুড়ারাই না হয় যত দোষের

দোষী হইল, তাহাতে ছোঁড়াদের প্রশংসার বিষয় কি আছে? সেটা শুনাইয়া দাও দেখি, তারপর আমার যাহা বক্তব্য বলিতেছি।

শ্যাম বলিল,—তাহাদের প্রশংসার বিষয় তো চক্ষের সম্মুখেই পড়িয়া রহিয়াছে। বুড়াদের এত অসৎ আদর্শ সত্ত্বেও তাহারা এখন অনেক বুড়ার অপেক্ষা অনেক ভাল। এই দেখ না কেন, দেশের হিতকর সকল কর্ম্মেই এখন ছোক্‌রারাই বেশী উদ্‌যোগী। ধর্ম্ম বা সাহিত্য প্রভৃতি লইয়া যতকিছু সভাসমিতি, প্রধানতঃ ছেলেরাই তাহার অনুষ্ঠাতা। পল্লীগ্রামের অনেক বৃদ্ধ প্রায় কাজের মধ্যে তাস দাবা পাশা লইয়া চণ্ডীমণ্ডপ গুলজার করেন, না হয় পরচর্চ্চা পরকুৎসা লইয়া ঘোঁটমঙ্গল করেন, আর না হয় মামলামোকদ্দমার সল্লাপরামর্শেই কালক্ষেপ করেন। আর বহু সহুরে বুড়া প্রায় অনেকে গোঁপে-চূলে কলপ মাখিয়া নটবরবেশে হাওয়া খাইয়া বেড়ান, বাগান-বাগিচায় গিয়া আমোদ-প্রমোদ করেন, না হয়, আবগারিমহলের কিংবা ছোট বড় হোটেলগুলির শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নপর হন। ধর্ম্মচর্চ্চা যেন তাঁহাদের করিতে নাই, কে যেন মাথার দিব্য দিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া আমার সেই কবির কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া মনে হয়।

রাম বলিল,—কবির কথা আবার কি রকম? শ্যাম বলিল,—বোধ হয় তুমি জানো, তবু বলি শুন। একবার কলিকাতার একটা দুরন্ত লোকের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। যমদূতেরা আসিয়া হাজির। কিন্তু তাহার সহিত তাহারা পারিয়া উঠিল না, প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেল। তাহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া যম জিজ্ঞাসিলেন,—কি হে, তোমরা শুধু-শুধু ফিরিয়া আসিলে যে? কই—সে লোকটা কই? দূতেরা বলিল,—হুজুর, তাহাকে আনা আমাদের কার্য্য নয়, দেখুন আপনি নিজে যাইয়া যদি কিছু করিতে পারেন। আমরা কিন্তু আপনার সঙ্গেও সেখানে আর যাইব না, ইচ্ছা হয় আপনি একাকীই গমন করিতে পারেন। যম কি করেন, অগত্যা

একাই তাঁহাকে যাইতে হইল। কলিকাতার পশ্চিমদিকে গঙ্গার পরপারেই শাল্‌কে। ঐখানেই আসিতে আসিতেই যমরাজের রাত্রি হইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, লোকটা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত, এই অন্ধকার রাত্রে আর তাহার কাছে যাইয়া কাজ নাই, আজ এই শাল্‌কের মাঠে ঐ যে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষটা রহিয়াছে, উহার উপর রাত্রিযাপন করা যাউক, তাহার পর প্রাতে উঠিয়া যাওয়া যাইবে এখন। এই ভাবিয়া তিনি গাছের তলায় মহিষটীকে বাঁধিয়া রাখিয়া গাছের উপর উঠিয়া বসিলেন। কত কি ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার একটু তন্দ্রার আবেশ আসিয়াছে, এমন সময় তাঁহার কাণে লাখ-লাখ কোকিলের কুহুরব লাখ-লাখ পাপিয়ার পিউধ্বনি, লাখ-লাখ কত-কি পাখীর কলকাকলী আসিয়া প্রবেশ করিল। অমনি তিনি চমকভাঙ্গা হইয়া চাহিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন,—কি আশ্চর্য্য, চারিদিকেই আলোয়-আলো, কারা যেন নাচিতেছে-গাহিতেছে, আর ভর্‌ভরে ফুলের গন্ধে প্রাণ যেন তর করিয়া দিতেছে! দেখিতেদেখিতে এক দিব্য মূর্ত্তি তাঁহার নয়ন-সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিস্ময়েবিস্ময়ে দেখিয়া বলিলেন,—কে-ও, মদন দাদা নাকি? যেন কত রাগরাগিণীর আলাপচারীর মত আগন্তুকের মুখে একটি মোলায়েম মিষ্ট কথা বাহির হইল,—হঁা দাদা। আহা, তাঁহার ফুলধনুর অনুচর মধুকরগুলার গুঞ্জন যেন ঐ গানের সনে বাজনা বাজাইয়া দিল।

উভয়কে দেখিয়া উভয়ের বিস্ময়ের সীমাপরিসীমা নাই। যমরাজ জিজ্ঞাসিলেন,—দাদা, তুমি এখানে? মদন বলিলেন,—দুঃখের কথা বলিব কি দাদা, কলিকাতায় একটা বড়লোকের মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে, সে বিলাস-ব্যসন ছাড়িয়া ধর্ম্মকর্ম্মে মনোযোগী হইয়াছে; কোম্পানীর কাগজ কেনা আর পরিবারের গহনাগড়ানোর পরিবর্ত্তে দানধ্যান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আমার অনুচরদের—মোসাহেব গণিকা প্রভৃতির বেশে

বারংবার পাঠাইয়াও তাহাকে বশে আনিতে পারি নাই; তাই আজ স্বয়ংই যাইতে হইতেছে; তা দাদা, তুমি এত রাত্রে এখানে কেন? যমরাজ বলিলেন,—আমারও দুঃখের কথা বল কেন, আমারও ব্যাওরা তোমারই মত। আমাকেও একটা দুরন্তলোককে আনিতে সারেজামিনে যাইতে হইতেছে। তা বেশ দাদা বেশ, আজ রাতটা তুমিও এখানে থাক, কথায়-বার্ত্তায় কাটাইয়া দেওয়া যা'ক।

তাহাই হইল। দুইজনে নানা কথায় রাত্রি যাপন করিয়া ফেলিলেন। প্রাতঃকাল হইবামাত্রই উভয়ে আপনআপন কার্য্যে গমন করিলেন। প্রথমে যাইলেন যমরাজ। যাইবার ব্যস্ততায় তিনি আপনার দণ্ডগাছটী লইতে মদনের ফুলধনুটি লইয়া চলিয়া গেলেন। রাত্রে দুইজনেই দণ্ড ও ফুলধনু একই স্থানে রাখিয়া দেওয়ায় এই গোল বাধিয়া গেল। মদন আপন ধনু লইতে গিয়া দেখেন—কি সর্ব্বনাশ, ধনুর বদলে যমের দণ্ড রহিয়াছে! কি করেন, একটা কিছু অস্ত্র-শস্ত্র তো সঙ্গে চাই; তাই সেই যমের দণ্ডগাছটি লইয়াই বিষণ্নমনে গমন করিলেন। ঐদিন হইতেই যম ও মদনের অস্ত্র-বিনিময় হইয়া গেল। ফলে হইল কি? বুড়ারা হইল যমের অধিকৃত, সেই যমের হাতে পড়িল—মদনের ফুলধনু; তাই সেই পর্য্যন্ত বুড়াদের রসও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের ঠাটঠমক যুবাদের উপচাইয়া গেল। আর ছোকরারা হইল মদনের অধিকৃত, সেই মদনের হাতে পড়িল—যমের দণ্ড; তাই যত ছোকরার দল সেই পর্য্যন্ত বাবু-বেশ ছাড়িয়া থানচাদর চটিজুতা সার করিতে আরম্ভ করিল—ধর্ম্ম-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। বুঝলে ভাই বুঝলে?

শ্যামের কথা শুনিয়া রাম তো হাসিয়াই অস্থির। শ্যামের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল,—বেশ ভাই! বেশ, তুমি যে-শ্রেণীর বুড়াদের নিন্দা করিতেছ, আমিও তাহাদের প্রশংসা করি না। তবে কি জান ভাই,

তোমার ও ছোঁড়াদেরও কতকগুলা, সভাসমিতির দোহাই দিয়া যেরূপ অকাল-পক্কতার পরিচয় দেয়, তাহাও আমি পছন্দ করি না। দোষ দুই দিকেই হইয়াছে; দুই দিকেই সংশোধন চাই। বুড়াদের উচিত,—ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আপনাকে ঠিক করিয়া রাখা এবং তাহাদিগকে আপনাদের প্রতি আকৃষ্ট করা, আর ছোকরাদেরও কার্য্য হইতেছে,—কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহাদিগকে ভক্তিশ্রদ্ধা করা এবং তাঁহাদের সদ্‌গুণের অনুসরণ করা। নিন্দিত আচরণ কিংবা তাহার অনুকরণ কোন পক্ষেই কল্যাণকর হইতে পারে না।

রামের কথায় শ্যাম আর কোন প্রতিবাদ করিল না। ফলে এদিনকার বুড়ার প্রসঙ্গ এইখানেই সাঙ্গ হইয়া গেল। তাহারা হাত-ধরাধরি করিয়া বাটীর পথ ধরিল, অন্যান্য সকলেও চলিয়া গেল, আমিও যম ও অনঙ্গের রঙ্গ-প্রসঙ্গ প্রভৃতি ভাবিতেভাবিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

[বঙ্গবাসী; ১৮ই চৈত্র; ১৩১৭ সাল।]

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম

কি স্বাধীনতার হাওয়াই দেশে চ'লেছে, পরাধীন আর কেহই থাকিতে চায় না! কুলের রমণী অবরোধে থাকিতে নারাজ,—দুগ্ধপোষ্য শিশু মাতাপিতার শাসনে থাকিতে অনিচ্ছুক,—বর্ণী ও আশ্রমীরাও বর্ণাশ্রমের বাঁধনে থাকিতে একান্ত অনভিলাষী। অশান্তির আগুনও তাই চারিদিকে দাউদাউ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সকলকেই সেই আগুনে জ্বলিয়া-পুড়িয়া খাঁক্ও হইতে হইতেছে। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথাটাই বলি। বর্ণাশ্রমধর্ম্মটা যেন আজকাল কুলীনের ঘরের আইবুড়ো ধেড়ে মেয়ের মতন,—কতক্ষণে বিদায় করি, কতক্ষণে বিদায় করি। শিক্ষিত নাই, অশিক্ষিত নাই, কি জানি কেন প্রায় সকলেরই ধারণা হোয়ে পোড়েছে,—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বেড়াটা ভাঙ্গিতে পারিলেই যেন আমরা স্বাধীন হইয়া যাইব,—চরম উন্নতির সুবর্ণসিংহাসন অধিকার করিয়া ফেলিব।

একথার প্রতিবাদ করিতে গেলে অপ্রতিভ হইতে হয়। গীতা আজকাল পকেটে-পকেটে। একথার প্রতিবাদ করিতে গেলে কি আর রক্ষা আছে? অমনি তাঁরা ফোঁস্ কোরে গোর্জ্জে উঠে,—গীতাখানি খুলে দেখাবেন;—এই দেখ, ভগবান্ কি বোল্‌ছেন?—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"—ভগবান্‌ই যখন স্বয়ং বোল্‌ছেন যে, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ কোরে আমার শরণাগত হও, তখন ও বালাই বর্ণধর্ম্ম বা আশ্রমধর্ম্মগুলো চুলোর দোরেই ফেলে দেওয়া দরকার।

বহুৎ খুব। ভাই! তোমাদের কথাই মেনে নিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা

করি, তোমরা কি ভগবান্-টগবান্ মানো? না, তাঁর সকল কথা মানিয়া থাক? যদি মানো, তাহা হইলে, তাঁহার—"কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ" (কর্ম্মরাহিত্যের চেয়ে কর্ম্ম বড়), "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে" (কর্ম্ম না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হয় না), "শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ" (কর্ম্ম না করিলে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়াও কঠিন) ইত্যাদি কর্ম্মপ্রতিপাদক বাক্যের মর্ম্মটা একবার আমাকে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাও দেখি?

ভাই রে! অধিকার লইয়াই কথা। যাহার যেমন অধিকার, সে সেই-রূপ ধর্ম্মই আচরণ করিবে, ইহাই হইল সকল শাস্ত্রের সার কথা। আর আমাদের দেশের ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিশেষত্বও এইখানে। এদেশের ধর্ম্ম প্যাটেণ্ট ঔষধ নয়। যদি অধিকার হইয়া থাকে, সেই এক অদ্বিতীয় ভগবান্‌কে চিনিতে পারিয়া থাক তো সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ কর, ক্ষতি নাই। আর না হইয়া থাকে,—অল্পাধিকারী তুমি, সাধনরাজ্যের শিশু তুমি, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানই তোমার শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায়। এ অবস্থায় তুমি তোমার বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তোমাকে 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হইতে হইবে। চলচ্ছক্তিহীন শিশুর পক্ষে জননীর অঙ্কই উৎকৃষ্ট আশ্রয়, তথায় থাকিয়া বলসমৃদ্ধ হও,—তারপর বাহিরে যাইলেও পড়িবার ভয় থাকিবে না। পায়ের বল জন্মাইতে-না-জন্মাইতে—মায়ের কোল-ছাড়া হইলে পদেপদে পতন-যাতনা সহ্য করিতেই হইবে। এ কথা যেন স্মরণ থাকে।

অপুষ্ট অজাতসার বৃক্ষের জন্যই বেষ্টনের ব্যবস্থা। তখনই তো ছাগল-গোরুর ভয়। আল্‌গা পাইলেই তারা এসে গাছটিকে মুড়িয়ে খেয়ে যাবে। কিন্তু বেড়ার ভিতর থাকিলে গাছের আর সে ভয় থাকে না। 'সে ধীরে-ধীরে বেড়ে উঠে। তাহার অন্তরে সার জন্মায়। তখন বেড়া থাকুক

আর না-ই থাকুক, তাহাতে বড় এসে যায় না। তখন শতসহস্র ছাগল-গোরুতেও আর তাহার কিছু করিতে পারিবে না। গাছের ভিতরে সার জন্মাইলেই গুঁড়ি মোটা হয়, বেড়াও আপনা-আপনি ভেঙ্গে যায়; তখন আর যত্ন কোরে ভাঙতেও হয় না। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ধরণটাও ভাই! এই ধাতের। একটু ভাবিয়া দেখিও।

বলদেখি ভাই! খিলানটা পাকাপোক্ত হইবার পূর্ব্বেই কালবুতটা খুলিয়া লওয়া কি ভাল? বিষ নামিবার আগে-ভাগেই তাগার বাঁধনটা ছুটাইয়া দেওয়া কি কল্যাণকর? গাছের বেগুনটা পুষ্ট হইবার পূর্ব্বেই তাহার মুখের ফুলটি খসাইয়া ফেলা কি লাভজনক? খিলানটার আঁট বাঁধিয়া গেলে কালবুত ভাঙ্গিয়া ফেল, ক্ষতি নাই। বরং রাখিলে বাহার মাটি, তখন ভেঙে ফেলাই দরকার। রোজার মন্ত্রে বিষ নামিয়া গেলে তাগার বাঁধন আপনি খুলিয়া যাইবে, তাহাকে আর যত্ন কোরে খুল্‌তে হয় না। বেগুনটা সুপুষ্ট হোলে মুখের ফুল আপনা-আপনি খোসে পোড়বে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অবস্থাও অনেকটা এইরূপই জানিবে। জোর কোরে ছাড়াতে গেলেই মুস্কিল। যখন যাবার আপনিই যাইবে। ফল, সেই অধিকার বা উপযুক্ত সময়েরই দরকার করে।

আর একটা কথা বলি। এটা হচ্ছে এক পরমহংসবাবাজীর কথা। গত ১৩১০ সালের ফাল্গুনমাসে আমি দ্বিতীয়বার শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করি। শ্রীগোবিন্দের দোলযাত্রা ফুরাইয়াছে। শেঠেদের বাটীর মেলা চলিতেছে। সেদিন বাজি পোড়ানো। ভারি ধুম। লোকে লোকারণ্য। সন্ধ্যার পূর্ব্ব-ভাগে শেঠেদের বাগানের একস্থানে অনেকগুলি আধুনিক শিক্ষিত যুবক ও প্রবীণ সেকেলে লোকের খুব কথাকাটাকাটি মুখের লড়াই চোলেছে। মহা হুলস্থূল কাণ্ড। ব্যাপারটা কি, দেখিবার জন্য আমি সেখানে যাইলাম। গিয়া দেখি,—এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধেই তুমুল আন্দোলন হইতেছে। এক

পক্ষের—অবশ্য আধুনিক শিক্ষিত পক্ষের কথা,—বর্ণাশ্রমধর্ম্মটা কিছু নয়, ওটা ছেড়ে দেওয়াই দরকার, অপর পক্ষ অর্থাৎ সেকেলে প্রবীণ পক্ষের কথা,—না, ত্যাগের অধিকার না হওয়া পর্য্যন্ত উহাকে অতি সন্তর্পণে রক্ষা করাই প্রয়োজন। উভয় দলই প্রবল, হার আর কেহই মানিতে চাহেন না। এমন সময় একজন অতিবৃদ্ধ পরমহংস-বাবাজী সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। তিনি হাসি-হাসি-সম্ভাষণে তাঁহাদিগকে বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উভয় পক্ষেরই কথা সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়া হাসিতে-হাসিতেই বলিতে লাগিলেন,—বাবা! আমি আগে তোমাদিগকে গুটিকতক কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তাহার উত্তর দিতে হইবে।

সকলে।—বেশ, জিজ্ঞাসা করুন।

পরমহংস।—আচ্ছা বাবা! আজ এখানে কিসের এত ধূম লেগেছে?

সকলে।—আজ্ঞে, বাজি পোড়ানোর।

পরমহংস।—বাজি পোড়ানোর? বেশ বেশ। তা বাবা! এ বাজিগুলো পোড়াবার জন্যই হোয়েছে?

সকলে।—আজ্ঞে হাঁ।

পরমহংস।—তা বাবা! ঐ বাজির চারিদিকে সেপাই শান্তিরিগুলো ও কি কোর্‌ছে?—ঐ যে কি বোল্‌ছে,—বাঁচো বাঁচো,—হটো হটো?

সকলে।—আজ্ঞে, ওরা বাজিগুলোকে রক্ষা কোর্‌ছে।

পরমহংস।—কি থেকে রক্ষা কোর্‌ছে বাবা?

সকলে।—আজ্ঞে, আগুন থেকে।

পরমহংস।—সে কি কথা বাবা! আগুন লাগাবার জন্যই তো বাজির সৃষ্টি? এই তোমরাই তো বোল্লে যে, পোড়াবার জন্যই বাজিগুলো প্রস্তুত হোয়েছে। তবে আবার আগুন থেকে বাঁচানো কেন?

সকলে।—আজ্ঞে পোড়াবার সময় তো এখনও হয় নাই।

পরমহংস।—কখন হবে বাবা?

সকলে।—আজ্ঞে, এই সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজী আসিলেই।

পরমহংস।—ভাল কথা, উত্তম কথা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে,—শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীর শুভাগমন হইলেই বাজিগুলো পোড়ান হইবে। কেমন বাবা?

সকলে।—আজ্ঞে হাঁ।

পরমহংস।—আর শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীউর আসিবার আগেই যদি বাজিগুলোতে আগুন লাগানো যায়, তাহ'লে কি হয় বাবা?

সকলে।—আজ্ঞে, তাহ'লে বাজির বাহার টাহার সকলই মাটী,—ও বাজিগুলোই মাটী।

পরমহংস।—বেশ বেশ। ভাল কথাই বোলেছো, রঙ্গনাথজী আসিবার আগে আগুন লাগালে ও বাজিগুলোই মাটী বটে। (হো-হো হাসিয়া) তা বাবা! তোমাদের কথাতেই তোমাদের কথার উত্তর হোয়ে গেল।

সকলে—সে কি রকম?

পরমহংস।—রকম আর কি? তোমরাও তাহ'লে যতক্ষণ না সেই রঙ্গনাথের সাক্ষাৎকার লাভ কোরছো,—যতক্ষণ না তিনি তোমাদের এক অদ্বিতীয় আরাধ্য দেবতারূপে অন্তরের রত্নাসনে এসে আসন গ্রহণ কোর্ছেন, ততক্ষণ আর বর্ণাশ্রমধর্ম্মে আগুন লাগাইও না; বরং যতদিন না তিনি আসেন,—হৃদয়ের দেবতা হৃদয়ে এসে দেখা না দেন, ততদিন পর্য্যন্ত সতর্ক প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া দাও, যাহাতে তোমার এই বর্ণ-ধর্ম্মে বা আশ্রম-ধর্ম্মে বাহিরের আগুনের সামান্য ফিন্‌কীও না লাগে। সময় আসিলে, বাজিকরের হুকুমে, যাহারা আগুন লাগাইবার

ভিতর হইতে তাহারাই বাজিতে আগুন লাগাইবে; সেই অগ্নিক্রীড়া দর্শনে স্বয়ং রঙ্গনাথ প্রীত হইবেন, সঙ্গেসঙ্গে সহস্রসহস্র দর্শকও আনন্দ অনুভব করিবেন। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে, তোমাদেরও ভিতরের রশ্মিতেই—আন্তর তেজেই সকল ধর্ম্মের অনল-সংকার হইয়া যাইবে। তাহা দেখিয়া সেই পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণও সুখী হইবেন, আরও যাহারা দেখিতে জানে, এমন কত লোকেও অমিত আনন্দলাভ করিবেন। কিন্তু বাবা! বার-বার বলি, এই বৃদ্ধের কথা মনে রাখিও, অসময়ে আগুন লাগাইয়া লোক হাঁসাইও না,—বাজিকরের বাজি তোমরা, আপনাদের শুদ্ধ মাটী করিও না।

এই বলিয়া সেই রমণীয়মূর্ত্তি পরমহংসবাবাজী চপলার বেগে চলিয়া গেলেন। সকলেও কেমন চমকিয়া উঠিলেন। বিবাদেরও অবসান হইয়া গেল।

এ সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক। বলিতে হয়, বারান্তরে বলিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু ভাই! মহানুভব বাবাজী মহারাজের এ কথাটা কি তোমরা একবার ভাবিয়া দেখিবে না?

[বঙ্গবাসী; ২৩শে মাঘ; ১৩১৬ সাল।]

নকলে সকল নষ্ট।

কালেরই প্রভাব বলিতে হইবে, আজকাল চারিদিকেই কেবল নকলের ছড়াছড়ি। নকলের আপ্লাবনে আসলকে গা-ভাসান দিয়া পলায়নেরই পথ ধরিতে হইয়াছে। নকল নাই কোথায়? ধর্ম্মে নকল, কর্ম্মে নকল, আহারে নকল, ব্যবহারে নকল; যে দিকে চাও, সেইদিকেই দেখিবে,—নকল আসিয়া ধীরে ধীরে আসলের স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে। যেরূপ দ্রুতগতিতে নকলের প্রসার বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, অল্পদিবসের মধ্যেই আসলকে অস্তিত্বহারা হইয়া অতীত ইতিহাসের অঙ্কে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতে হইবে।

সে জিনিস নয়, অথচ দেখিতে যেন ঠিক তাহারই মত, তাহাকেই বলে 'নকল'। এই লক্ষণ লইয়া মিলাইয়া দেখ দেখি ভাই! কয়টা জিনিস আর আসল আছে? মনে কর, তুমি হিন্দু; তোমার সনাতন ধর্ম্মের মূল হইতেছেন বেদ, সেই বেদের দুই দশটি মাত্র বুক্‌নি লইয়া, ঐ যে কদাচারী কদাহারীর দল মৌখিক বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার করিতে বসিয়াছে, তাহাদের ধর্ম্মকে কি তুমি তোমার 'সনাতন ধর্ম্ম' বলিবে? ঐ যে কপটীর দল বিরক্তোচিত বিবিধ সাজে সাজিয়া মায়ামৃগের মত তোমার মন ভুলাইতে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদিগকে কি তুমি ত্যাগী মহাপুরুষ বলিবে? ও সব নকল ভাই! সব নকল। উহারা কেবল উপর-উপর আসলের বরণ-ধরণ বজায় রাখিয়া নকল ধর্ম্মের দোকান খুলিয়া বসিয়া আছে। আসলের চেয়ে নকলের চটক আরও বেশী, তাই ওদের ফাঁদে অনেককেই যাইয়া পড়িতে হয়। ওদের দায়ে ক্রমে ঘর সাম্‌লানো ভার হইয়া পড়িতেছে।

যে শালগ্রাম শিলা লইয়া তুমি পূজা করিতে বসিবে ভাই! তাহা আর আসল মিলা ভার। পূর্ব্বে শালগ্রামের ক্রয়-বিক্রয় ছিল না, সাধু-সন্ন্যাসীর কাছেই তাহা পাওয়া যাইত। আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা অমনিই তাহা দিয়া যাইতেন। এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। আমাদের সে সেবাও নাই, তাঁহাদেরও শুভাগমন নাই, কাজেই শালগ্রাম শিলা আর বিনামূল্যে পাওয়া যায় না; ক্রমে তাহার ক্রয় বিক্রয়ের প্রচলন হইল। অতটুকু নুড়ির অত দাম, প্রতারকের দল কি আর লোভ সংবরণ করিতে পারে? অমনি তাহারা নকল শিলা তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিল। ডিপার খোলের মত দুইটী কোষ্ঠিপাথরে চক্র খুদিয়া পুটিং দিয়া বেমালুম জুড়িয়া, উপরে একটু সোনাটোনা ঘসিয়া খাসা শালগ্রাম প্রস্তুত করিতে লাগিল। এখন সাজা সন্ন্যাসীর কাছেই হউক, আর ব্যবসাদার বামুন-ঠাকুর বা দোকানদারের কাছেই হউক, আমরা ঐরূপ শালগ্রামই পাইয়া থাকি। পূজার অঙ্গ—জপের কিংবা গলার মালারও গোল বাধিয়াছে। স্ফটিক বল, রুদ্রাক্ষ বল, আর প্রবাল কিংবা তুলসীর মালাই বল, সকলেরই আসল-নকল চিনিয়া লওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছে। সাজা সাধু সন্ন্যাসীরা যে আমাদের বাড়ীবাড়ী আসিয়া, কৃপা করিয়া,—অবশ্য উচিৎ মূল্যের অপেক্ষা কৃপার মূল্য অনেক বেশী আদায় করিয়া, আমাদের যে,—দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ, একমুখী রুদ্রাক্ষ বা কুশের মূল প্রভৃতি গছাইয়া যান, তাহার আগাগোড়াই নকল! হায় হায়, সাধনরাজ্যের সকল সামগ্রীই নকলে ভরিয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশে নীলের চাষ ছিল, নীলের ব্যবসায় এদেশের লোক দু'পয়সা উপার্জ্জনও করিত; জমীর খাজনা বাবদ জমীদারদিগের আয়ও অল্প ছিল না; এখন বিদেশী নকল নীলের প্রভাবে আসল নীলকে

লীলাসংবরণ করিতে হইয়াছে। আগে এদেশে আসল বরফ আসিত, এখন নকলের প্রচলনে তাহার আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, আসলের উপকারিতা নকলে না মিলিলেও আর উপায় নাই; দায়ে পড়িয়া নকলেরই আদর করিতে হয়। ম্যাজেণ্টা দিয়া রং-করা এরারুটগুলা এখন 'আবীর' বলিয়া বাজারে বিকাইতেছে। এই নকল আবীরের উৎপাতে আসল আবীর নিপাতে গিয়াছে। সিন্দূরের দশাও আবীরের মত, তাহারও আসল দুষ্প্রাপ্য। ইমিটেসন ডায়মণ্ড বা নকল হীরা আসল হীরাকে হারাইয়া দিয়াছে। নকল চুনি নকল পান্না জলুষে আসল চুনি-পান্নার উপর চড়িয়াছে। নকল মুক্তা ও আসল মুক্তার পার্থক্য নিরূপণ করিতে এখন অনেক পাকা জহুরীকেও অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। কেমিকেল সোণা এবং জর্ম্মাণ রূপার কথা তো কাহারও জানিতে বাকী নাই, তাহাতো এখন ঘরে-ঘরে। সুতরাং বলিতে হয়, এখন সকল দিকে নকলেরই জয়জয়কার।

তার পর বিলাস-সামগ্রীর কথা বলি। বিলাতি জুতা না হইলে আজকাল অনেক বাবুর মন উঠে না। চাঁদনীবাজারের আমদানী অনেক বিলাতি জুতার বার্নিশকরা কালো আবরণটি চামড়া, না অয়েলক্লথ, তাহা নূতন অবস্থায় নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। পাটগাছের গোড়ার দিকের পাট হইতে যে সকল 'সিল্ক' প্রস্তুত হইতেছে, আসল সিল্ক কি তাহার কাছে দাঁড়াইতে পারে? বাজারে এখন এই সিল্কেরই কাটতি ষোল আনা। তোমার ঢাকাই বল, শান্তিপুরে বল, আর বেণারসীই বল, কোন্ কাপড়ের চটকদার নকল বাহির না হইয়াছে? কাশ্মীরি বা অমৃতসরের শাল-দোশালারও নকল এখন দোকানে দোকানে। দেশী-কাজ-করা বিলাতী নকল আলোয়ান এখন তো দেশী বলিয়াই বিক্রীত। মহিষশৃঙ্গের বা গজদন্তের নির্ম্মিত

চিরুণী, ছাতার বাঁট ও ছড়ি প্রভৃতির হুবহু নকল কে না দেখিয়াছে? এসেন্‌স কেশতৈল প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের তো কথাই নাই, শিশির ভড়ঙেই কিস্তী মাৎ!

তাহার পর আমাদের জীবনরক্ষক মহৌষধগুলিরও জঘন্য নকল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঐ যে সস্তার সস্তা চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি ঔষধগুলি বিজ্ঞাপনের হেঁপায় পড়িয়া কিনিয়া শেষে হতাশ হইয়া তোমরা ঔষধেরই নিন্দা করিতে বসিয়া যাও, তাহা কি চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় ঔষধের দোষ, না, তোমার আসলের বদলে নকল ঔষধ ক্রয় করিবার দোষ? উৎকৃষ্ট বংশলোচন, উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত, উৎকৃষ্ট মধু, উৎকৃষ্ট তিলতৈল, উৎকৃষ্ট আমলকী প্রভৃতি তোমার ঐ চ্যবনপ্রাশে আছে কি না, তুমি তাহা দেখিলে না, কেবল উপর উপর চ্যবনপ্রাশের মত চেহারাখানা দেখিয়াই তুমি তাহা কিনিয়া ফেলিলে। এ ক্ষেত্রে তোমাকে পস্তাইতে না হইবে কেন? কেবল চ্যবনপ্রাশ কেন, সকল শাস্ত্রীয় ঔষধই তুমি সুচিকিৎসকের কাছে লইয়া দেখ দেখি, ফল পাও কি না?

ঔষধেও যেমন, রোগীর পথ্যেও তেমনিই গোল বাধিয়াছে। সাগুদানায় চাউলের খুদ, বার্লির মধ্যে চাউলের গুঁড়া বা ময়দা মিশানো, গো-দুগ্ধের তো কথাই নাই। দুধ কত রকমের;—ফুঁকা দেওয়া আছে, মহিষের দুধে জল ও বাতাসা-মিশানো আছে, গো-দুগ্ধে এরারুট ও চিনি মিশানো আছে, আরও রকম-বেরকম কত কি মিশানো আছে। চারি আনায় এক সের দুধ, তা-ও খাঁটী পাবার যো নাই। কিছু-না-কিছু মিশানো-গুসানো থাকিবেই থাকিবে। এখন দুধ বলিতে—দুধের সাদা রংটুকু-ওলা তরল বস্তুই বুঝিতে হইবে। তার উপর টিনের কৌটায় পোরা 'কণ্ডেন্‌সড মিল্ক'—জমাটবাঁধা দুধ তো আছেই। এত নকল পথ্যেও কখনও রোগী নিরাময় হইতে পারে?

যখন খাদ্য দ্রব্যের কথা উঠিয়াছে, তখন তাহার কথা একটু বিশেষ করিয়াই বলি। যে বিশুদ্ধ খাদ্যের উপরই আমাদিগের স্বাস্থ্য-সুখ এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম-কর্ম্ম নির্ভর করে, হায় হায়, তাহার সকলটাই নকলে ভরিয়া গিয়াছে। আটা-ময়দায় জোয়ারা বজরা ও একপ্রকার সাদা পাথরের গুঁড়া মিশাইয়া দেওয়া হয়। সরিষার তৈলে সোরগোঁজা, মাঠবাদাম, তুলার বীজ প্রভৃতি কতকির তৈল, তার উপর আবার খনিজ বুলুম অএল বা ব্যাচ অএল মিশানো। বাদামের তৈল মিশ্রিত চর্ব্বীই এখন ঘৃতের আসন টানিয়া লইয়া বসিয়াছে। অথচ এই ঘৃতই হইতেছে আমাদের আয়ু ও ধর্ম্ম-কর্ম্মের প্রধান সহায়। হরিদ্রা দিয়া দাগ করা যে-সে ঘৃতই এখন গব্যঘৃত বলিয়া বাজারে বিক্রীত। যে মাখন হইতে ঘৃত করিবে, তাহাতেই ভেজাল আরও বেশী বেশী। শুনিতে পাই, তাহাতে নারিকেলের মাখন থাকে, চর্ব্বীও থাকে। তাই আর মাখন জ্বাল দিবার সময় সদ্গন্ধে বাড়ী ভরিয়া যায় না; মাখনমারা ঘৃতেও তেমন খোষবয় পাওয়া যায় না। খুব গাঢ় চিনির রস এখন মধু বলিয়া বিক্রীত হয়। চিনির তো কথাই নাই। তুমি দেশী চিনি খাইতে চাও, কিন্তু ঠিক খাঁটি পাওয়া কঠিন। দেশী চেহারার অনেক বিদেশী চিনির আমদানী হইয়াছে। চিনি দেশী কি বিদেশী, চিনিয়া লওয়া ভার। তার উপর কলিকাতায় কএকটী কল বসিয়াছে, তাহার মধ্যে কোথাও কোথাও দশ আনা বারো আনা দেশী ও ছয় আনা চারি আনা বিদেশী চিনি মিশাইয়া পেশাই হইতেছে। ইহার নাম পিটীচিনী। এ চিনী দেখিতে দেশীর মত, ইহার গন্ধও দেশীর মত, সুতরাং দেশী বলিয়াই বিক্রীত হইতেছে। আর এক রকম কম দামের চিনিও দেশী বলিয়া বিক্রীত হয়। মিছরীর সুঁট অর্থাৎ মিছরী জমিয়া যাইবার পর মিছরীর কুঁদাগুলি উপুড় করিয়া দিলে তাহা হইতে যে অজমা রসটুকু বাহির হইয়া আসে, সেই মিছরীর সুঁট এবং 'যাভা সুগার'

আগুনের উপর কড়ায় চাপাইয়া জ্বাল দিয়া জমাট বাঁধাইয়া পরে বড় বড় কাঠের বারকোসের উপর ফেলিয়া বড় বড় কাঠের নোড়া দিয়া সেগুলিকে বাটিয়া লওয়া হয়। এই চিনির নাম—বাটা চিনি। তারপর, নকলের জ্বালায় আসল গুড়কেও এখন পাত্তাড়ি গুটাইতে হইয়াছে। কলির সকলি উল্টা। আগে গুড় হইতে চিনি হইত, আর এখন হইতেছে চিনি হইতে গুড়। আজকাল বাজারে যাহা একোগুড় বলিয়া বিক্রীত হয়, অনেক স্থলে তাহা দেখিতে ঠিক গুড়ের মত হইলেও খাঁটি গুড় নহে, উহা এক কৃত্রিম পদার্থ। আমি সেদিন সিমলার বাজারে গুড় কিনিতে গিয়া এই গুড়ের গূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছি। আমরা কলিকাতায় যে সকল কলসীতে জল-টল রাখি, গুড়ের কলসী বা নাগরীগুলি তাহার মতন নয়, কিন্তু আজকাল বাজারে যাইলেই দেখিতে পাইবে যে, আমাদের জলটল রাখিবার কলসীতেই এখন গুড় রাখা হইতেছে। ইহার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করায়, দোকানদার বলিল,—মহাশয়! জানেন না, আজকাল তো আর আসল নাগরী গুড় পাইবার যো নাই, এসকল গুড় যে এখন এখানেই—এই কলিকাতাতেই তৈয়ারি হইতেছে; এই গুড় তৈয়ারির চোটে এখন আমাদের জল রাখিবার কলসী মেলা ভার হইয়া পড়িয়াছে। শুনিয়া আমি তো আর নাই। নকল চিনির জ্বালায় গুড়ই একমাত্র ভরসার স্থল ছিল, সর্ব্বনাশ! তাহাতেও ভেজাল চলিল, ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলাম এবং আজকালকার গুড়ের প্রস্তুতপ্রণালী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। দোকানদার বলিল,—মহাশয়! পশ্চিমদেশ হইতে কোৎলা-গুড়ের ধরণের একপ্রকার কালো একোগুড় আসে, সেই গুড়ের রস জ্বাল দিয়া, এই সকল কলসীর ভিতর যাভা-সুগার পূরিয়া, সেই রস গরমগরম কলসীর মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। আট সের চিনিতে দুই সের গুড়ের রস হইলেই যথেষ্ট। সেই গুড়ের রস ও চিনি জমাইয়া এই সকল একো

গুড় প্রস্তুত হইতেছে। ঐ কালো গুড়ের রস সাদা চিনির সঙ্গে মিশিয়া একটু ফিঁকা হইয়া সোণার বর্ণ ধরিয়াছে, গুড়ের গন্ধটুকুও বজায় আছে, করকরে চিনিতে গুড়ও বেশ দানাদার দেখাইতেছে। গুড়ে-বাতাসারও ঐ গুড়ের দশা। তাহারও জমি যাভার চিনি। খালি চেহারা দেখিয়া খরিদ্দারে আসল কি নকল, কি বুঝিবে বলুন।• যে-সে খরিদ্দার যাহাই বুঝিতে হয় বুঝুক; আমি তো শুনিয়া হতভম্ব হইয়া গেলাম। জানি—অনেক ধর্ম্মভীরু মহাত্মা এখন গুড় বা গুড়ে বাতাসা ছাড়া আর কিছু মিষ্টান্ন স্পর্শও করেন না। হায় হায়! তাঁহাদের দশা কি হইবে? এ তত্ত্ব কি সকলে জানেন? আমার আর গুড় লওয়া হইল না, অধিক মূল্য দিয়া বিশুদ্ধ দেশী চিনিই আনিতে বাধ্য হইলাম।

ঘৃত-চিনি-গুড়ের দশা যা, লবণের দশাও তা-ই। যাই এ দেশের লোক লিভারপুল লবণ ছাড়িয়া করকচ বা সৈন্ধব লবণ বেশী বেশী ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল, অমনি সঙ্গেসঙ্গে তাহার নকল লবণেরও আমদানি আরম্ভ হইল। এই যে এখন বাজারে করকচ লবণ বলিয়া যাহা পাওয়া যায়, অনেক স্থলে তাহা আসল নয়,—নকল, তাহা এদেশী নয়,—বিদেশী। শুনিতে পাই, বাজারে সৈন্ধব-লবণেরও ঠিক নকল—'হাম্বার্গ সল্ট' নামক একপ্রকার জমাটবাঁধা লবণেরও নাকি আমদানী হইয়াছে। এখন আসল নকল চিনিয়া কিনি কি প্রকারে? যে সরিষা দিয়া ভূত ছাড়াইব, সেই সরিষায় ভূতে ধরিলে কি আর রক্ষা আছে?

স্থূলদেহের খাদ্যের কথা গেল,—এইবার সূক্ষ্মদেহের কথাও কিছু বলি। সৎ-সাহিত্য ও সঙ্গীতই হইতেছে তাহার প্রধান আহার। এই দুইটি জিনিসও নকলে নষ্ট হইতে বসিয়াছে। সাহিত্যের নকল নানা প্রকার। হয় তো কেহ সৎ-সাহিত্যের নামে অসৎ গ্রন্থ প্রচার করিতেছে, কেহ বা তোমার বহু চিন্তাপ্রসূত সামগ্রী আত্মসাৎ করিয়া তোমারই মত আর

একখানি গ্রন্থ আপন নামে প্রকাশ করিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া তোমার কেমন ঘৃণা জন্মিল, তোমার আর সে অধ্যবসায় রহিল না, ফলে লোকেও আর তোমার বহু চিন্তাপ্রসূত সামগ্রী উপভোগ করিতে পাইল না, এইরূপে সুচিন্তিত সৎসাহিত্যের প্রচারও ক্রমশ কমিয়া আসিতে লাগিল। ফলে এই নকলের দায়ে আসলও লোপ পাইতে বসিল। ক্রমে নকলের নকল তস্য নকলে আসল খাস্ত হইয়া গেল। সঙ্গীতের নকল বা অনুকরণযন্ত্র গ্রামোফোনেও আমাদের এদেশী সঙ্গীতের পিণ্ডলোপের বন্দোবস্ত করিতে বসিয়াছে। কেন? তাহা বলি। পূর্ব্বে এদেশের বিষয়ী লোকে অনেকে নিজে গানবাজনা শিখিতেন। কাজেকাজেই তখন তাঁহাদের কাছে গায়কগুণীর আদরমর্য্যাদাও যথেষ্ট ছিল। আলস্যই কলিকালের প্রধান লক্ষণ। কালপ্রভাবে এদেশের বিষয়ীরা যতই অলস যতই আয়েসী হইয়া পড়িতে লাগিলেন, গায়কগুণীর আদরও ততই কমিয়া আসিতে লাগিল। যতই আদর যত্ন করিবার—গানবাজনা শুনিয়া পুরস্কৃত করিবার লোকের অভাব হইতে থাকিল, ততই সঙ্গীতের চর্চ্চাও হু হু করিয়া কম হইয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময় এদেশে হারমোনিয়াম-যন্ত্রের আমদানি হইল। বীণা, সুরবাহার, রবাব, সেতার প্রভৃতির মত হারমোনিয়মে আর তত কসরতের দরকার হয় না, তার উপর বাঁধা সুর; সুর বাঁধিবার আয়াস স্বীকার করিতে তো আসলেই হয় না; আয়েসী আমরা তাহাতেই মজিয়া গেলাম। বাঁধা সুরের ধাঁধায় পড়িয়া সুরজ্ঞানও হারাইতে বসিলাম। ফলে ধীরে ধীরে রাগ-আলাপ বা ধ্রুবপদ গান প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীতের পরিবর্ত্তে ঠুংরি-টপ্পারই অধিকতর প্রচলন আরম্ভ হইতে লাগিল। এদিক্ ওদিক্ খুঁজিয়া পাতিয়া যা-ও বা একটু আধটু উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের ক্ষীণ কাতর কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হইতেছিল, এইবার বুঝি তাহাও ফুরাইয়া যায়। এখন শ্রমকাতর বিলাসী বাবুর দল

আর গানবাজনা শিখিবার পরিশ্রম স্বীকার করিতে একেবারেই নারাজ; তাঁহারা নয়ন মুদিয়া গড়গড়ার নল মুখে দিয়া—তাকিয়ায় মাথা রাখিয়া গড়াইতে গড়াইতে গ্রামোফোনের গান শুনিতেই তৎপর। হায় হায়! এই স্রোত এই ভাবে আর কিছু দিন চলিলে কি আর আসল গানের কদর থাকিবে,—না, গাহিলেও কেহ বুঝিতে পারিবে? নিশ্চয়ই তখন এ দেশের অতুলনীয় সঙ্গীতকে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইবে।

আমার মনে পড়ে,—আমাদের বাটীর পার্শ্বে গয়ালীঠাকুরদের বাড়ী। সঙ্গীতশাস্ত্রের অদ্বিতীয় অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ এসরাজ-বাদক ৺কানাইলাল ঢেঁড়ি গয়ালীঠাকুর তখন জীবিত। তাঁহার বৈঠকখানায় সর্ব্বদাই বড়বড় ওস্তাদ আসিতেন, গানবাজনাও হরদম চলিত। একবার ঢেঁড়িজীরই গুরুভাই হনুমানদাসজী আসিয়া কিছুদিন ঐ বাটীতে অবস্থান করেন। তাঁহার মত রাগ-আলাপী এবং খেয়াল-গায়ক এখন পশ্চিম-প্রদেশেও বড় বিরল। তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করিবার জন্য অনেক দূরদূরান্তর হইতে লোকজন সর্ব্বদাই আসেন। তাঁহারও গানের আর বিরাম নাই। কিন্তু আমাদের একজন প্রতিবেশী বন্ধু,—ইনি গানবাজনার একটু আধটু ধার ধারিলেও থিয়েটারি টপ্পাটুপ্পির উপর বড় উঠিতে পারেন নাই; তিনি একদিন বলিয়া উঠিলেন,—দেখ ভাই! আজ কয়েকদিন হইল ঢেঁড়িজীর বাড়ীতে কে একটা পাগলা এসেছে, এমন বেয়াড়া পাগোল কখনও দেখি নাই। আমি বিস্ময়সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম,—সে কেমন? তিনি বলিলেন,—আরে ভাই! পাগোলটা রাত না পোহাইতে পোহাইতে তানপূরায় সুর বাঁধিয়া 'ওয়াক্ ওয়াক্' করিয়া বমি করিতে বসে। আমি ত শুনিয়া হাসিয়াই খুন। মহানুভব হনুমানদাসজীর যে রাগ-আলাপ এবং খেয়ালের তানে গীতজ্ঞমাত্রেই মুগ্ধ, আজ উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের জ্ঞানহীন বন্ধুর কাছে তাহাই হইল কিনা,—সুর-মিলাইয়া বমি-করা! এই সঙ্গীতের

অনুকৃতিযন্ত্র গ্রামোফোনের কল্যাণে আমরা থাকিতে থাকিতেই হয় তো দেখিতে পাইব যে, সঙ্গীতবিশারদের বিশুদ্ধ রাগালাপ ঐরূপ বাতুলের বমন বলিয়াই উপেক্ষিত হইতেছে, আর আলাপকারী বিদ্রূপের তীব্র হাস্য-সহকৃত:গলহস্ত পুরস্কার পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছেন।

হায় হায়, কি বলিব, কতই বা বলিব; নকলেই আমাদের সকল নষ্ট করিয়া দিল ভাই! সকল নষ্ট করিয়া দিল।

[বঙ্গবাসী; ১৯শে ভাদ্র; ১৩১৬ সাল।]

নুড়ীর আওয়াজ

অনেক দিনের কথা, আমরা একবার শ্রীশ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করিব বলিয়া ৺গয়াধামে গিয়াছিলাম। প্রতিদিনই আমরা শ্রীপাদপদ্ম দেখিয়া,—ফল্গুনদীর তীরে তীরে ঘুরিয়া,—পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া, সাধুসজ্জনের চরণধূলি লইয়া আমোদে মাতিয়া উঠিতাম। দিনরাত যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইত, কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। একদিন আমরা বাজারের ধার দিয়া শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে যাইতেছি; যাইতে যাইতে হঠাৎ একটা দোকানের দিকে নজর পড়িয়া গেল। দেখি,—দোকানে ভারি ভীড়, বচসাও খুবই চলিতেছে। ব্যাপারখানা কি, বুঝিবার জন্য নিকটে যাইয়া দেখি,—দোকানখানা পাথরের জিনিষের, এবং দোকানদারে আর খরিদদারেই বচস' বাধিয়াছে। অল্পক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর আমরা বচসার রহস্য জানিতে পারিলাম। খরিদদারগণ বাঙ্গালী, আর দোকানদার হিন্দুস্থানী। আমাদের বাঙ্গালী দেখিয়াই খরিদদারগণ আমাদিগের নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগের দুঃখের কাহিনী আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন; সুতরাং রহস্য উদ্ভেদ করিতে আমাদিগকে আর অধিক প্রয়াস পাইতে হইল না।

ব্যাপারটা এইরূপ,—খরিদার কয়টী পূর্ব্ববঙ্গবাসী নিরীহ ভদ্রলোক। তাঁহারা উক্ত দোকানদারের নিকট হইতে কতকগুলি পাথরের বাটী খরিদ করিয়া লইয়া যান। বাটীর খন্‌খনে আওয়াজে ও রঙ্গের চটকে বিমুগ্ধ হইয়াই তাঁহারা বাটীগুলি ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু বাসায়

আসিয়া বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, বাটীগুলির আর সে আওয়াজ টাওয়াজ কিছুই নাই,—ও হরি! সমস্ত বাটীগুলিই রংকরা ও মেটে পাথরের! পয়সাগুলি সবই জলে পড়িয়াছে! তখন তাঁহারা আর কি করেন, অগত্যা বাটীগুলি বদ্‌লাইয়া ভাল বাটী লইবার জন্য সেই দোকানদারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটী বদ্‌লাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই দোকানদার বেজায় চটিয়া উঠিল। ইঁহারাও পয়সা দিয়া জিনিষ লইয়াছেন, সহজে ছাড়িবেন কেন? কাজে-কাজেই উভয় পক্ষের বাদ-প্রতিবাদে বিষম ব্যাপার বাধিয়া গেল। দোকানটী রাস্তার ধারেই; তাই একটী দুইটী করিয়া অনেক লোক জমিয়া ব্যাপারটা আরও জঁাকাইয়া তুলিল। কত লোকে কত অনুরোধ উপরোধ করিল, অবশেষে আমরাও কত সাধ্য-সাধনা করিলাম, কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী'—দুষ্ট দোকানদার কাহারও কথা কাণে তুলিল না, অধিকন্তু তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের উদ্দেশে নানা প্রকার অপূর্ব্ব খাদ্যের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া এবং প্রত্যেকের গলদেশে এক-একটী সুমিষ্ট ও সুখস্পর্শ 'ধাক্কা' প্রদানপূর্ব্বক দোকান হইতে দূর করিয়া দিল; আমরাও 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি' ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

আমরা ব্যাপারটা দেখিলাম, শুনিলাম, কিছু কিছু বুঝিলামও বটে, কিন্তু সকলটুকু বেশ বুঝিতে পারিলাম না। অর্থাৎ সেই সুচতুর দোকানদার কি প্রকারে খাঁটী মাটীর বাটীগুলি পাথরের বলিয়া বিক্রয় করিল, এইটুকু আমাদের অজ্ঞাত রহিয়া গেল। বাটী বিক্রয় ব্যাপারটা বুঝিবার জন্য আমাদিগকে সে-দেশবাসী এক বৃদ্ধের শরণাগত হইতে হইয়াছিল। তিনি আমাদিগকে ব্যাপারটি বেশ ভালরূপেই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা এই,—একদিন তিনি আমাদিগকে একটি

দোকানে লইয়া গিয়া বলিলেন,—দেখ বাবা! বাটীওয়ালার ডান হাতে একটি বড় লম্বা-ধরণের নুড়ী আর বাঁ হাতে একটি বাটী দেখিতেছ কি?

আমরা।—আজ্ঞে হাঁ।

বৃদ্ধ।—আচ্ছা, ঐ যে দোকানদার বাটীটির গায়ে নুড়িটী মারিতেছে, আর টং টং ঠং ঠং আওয়াজ হইতেছে, ঐ আওয়াজ কিসের বল দেখি, বাটীর,—না নুড়ীর?

আমরা।—আজ্ঞে বাটীর।

বৃদ্ধ।—এই ত বাবা! বুঝ্‌তে পারলে না? আচ্ছা, আবার দেখ দেখি, বেশ ভাল ক'রে দেখ দেখি, কি বোধ হয়?

আমরা আবার দেখিলাম, সেই দোকানদার বাঁ হাতটি একবার এদিক্ একবার ওদিক্ করিয়া হাতের বাটীটির উপর ঘনঘন নুড়ীর ঘা মারিতেছে, আর টং টং ঠং ঠং করিয়া আওয়াজ হইতেছে। বেশ বিচার করিয়াই দেখিলাম, কাণ পাতিয়া আওয়াজটিও শুনিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের বেশ বোধ হইল যে, আওয়াজটি বাটীরই। তাই সেই বৃদ্ধকে বলিলাম,—আওয়াজ বাটীরই বটে। তখন সেই বৃদ্ধ বলিলেন,—"বাবা! যাহারা ঐ নুড়ীটির তত্ত্ব জানে না, তাহাদের ঐরূপই বোধ হয় বটে, কিন্তু নুড়ীটীর ভিতরের কথা জানিলে আর ওরূপ ভুল হয় না। দেখ বাবা! ঐযে নুড়ীটি দেখিতেছ, ওটি লোহিয়া-পাথরের। তুমি যে-কোন মেটে বাটীর উপর ঘা মার না কেন, টং টং ঠং ঠং ক'রে আওয়াজ হইবেই হইবে। ঐযে টং টং ঠং ঠং আওয়াজ শুনিতেছ, উহাও ঐ নুড়ীরই আওয়াজ,—বাটীর নহে। যাহারা ঐ নুড়ীর তত্ত্ব না জানিয়া বাটী কিনিতে আইসে, প্রায়ই তাহাদিগকে আওয়াজে ভুলিয়া প্রতারিত হইতে হয়; আর যাহারা নুড়ীর রহস্য জানিয়া, অথবা কোন জানাশুনা

লোককে সঙ্গে লইয়া বাটী কিনিতে আইসে, তাহারাই খাঁটি বাটী কিনিতে পারে। এস বাবা! আমার সঙ্গে এস, ঐ দোকানদারের সহিত আমার খুব আলাপ পরিচয় আছে, আমি এখনই তোমাদিগকে নুড়ীর গুণ দেখাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি আমাদিগকে সেই দোকানের ভিতরে লইয়া গেলেন এবং সমস্ত ব্যাপারটা বেশ বুঝাইয়া দিলেন, আর যাইবার সময় বারবার তিনবার বলিয়া গেলেন,—"দেখ বাবা! এই সংসার-বাজারটাও বড় ভীষণ স্থান, খুব সাবধানে সওদা করিও, দেখো যেন কেবল ফাঁকা আওয়াজ বা বাহিরের রংএর চটকে ভুলিয়া সম্বল হারাইও না। যখন বুঝিতে না পারিবে, তখন আমাদের মত বুড়োর কাছে তুটো কথাও জিজ্ঞাসা করিয়া লইও, তাহা হইলেও ঠকিবার সম্ভাবনা খুব অল্প। দেখো বাবা! এ বুড়োর কথাটা মনে রেখো—ভুলো না।" আমরাও তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম।

৺গয়াধামের উক্ত ঘটনা অনেক দিনের হইলেও, বৃদ্ধের কথাগুলি আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে এমনি গাঁথা হইয়া গিয়াছে যে, সে আর ভুলিবার নয়। কেবল তাহাই নহে, ৺গয়াধামে গুটিকতক পাথরবাটীওয়ালা দোকানদার দেখিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু বৃদ্ধের উপদেশের কৃপায় এখন দেখিতেছি যে, সারা সংসারটাই ঐরূপ পাথরবাটীওয়ালা—আর ঐরূপই দোকানদার। তাহারাও ঐরূপ চটকে ভুলাইতে চায়, তাহারাও ঐরূপ নুড়ীর মধুর আওয়াজে মোহিত করিতে চায়। আর কত শত অচতুর খরিদদার যে তাহাদের ঐ আওয়াজে মজিয়া—চটকে ঠকিয়া যথাসর্ব্বস্ব হারাইতেছে, তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা সুকঠিন।

ঐযে উপধর্ম্মীর দল তাহাদের চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে চটকওয়ালা ধর্ম্মের বাটীগুলি বাজারে বসিয়া বিক্রয় করিতেছে, বিচার করিয়া দেখিলে তাহাও সেই বেদরূপ নুড়ীরই জোরে। বেদের তুই চারিটা বড় বড় কথা

আওড়াইয়াই না উহারা উহাদের ধর্ম্ম বিক্রয় করে? কেবল ধর্ম্মের কথা তুলিয়া ইঙ্গিত করিলাম মাত্র, চক্ষু চাহিয়া দেখিলে চারিদিকেই এইরূপ দোকানদারীই দেখিতে পাইবে। না দেখিতে পাও তো কোন জ্ঞানবৃদ্ধের শরণাপন্ন হও—সদ্‌গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় কর, নচেৎ ঠকিতে হইবেই হইবে।

[বঙ্গবাসী ; ২৯শে কার্ত্তিক ; ১৩২০ সাল।]

চাতক-সম্ভাষণ।

হাঁরে ক্ষুদ্র পক্ষি! জলভরে ঢলঢল মেঘ দেখিলেই তুই অমনতর হ'য়ে যাস্ কেন বল্ দেখি? জলদের গর্জ্জন, বিদ্যুতের উন্মেষণ কিংবা ঝঞ্ঝা সমীরণে কি তোর প্রাণে একটুও ভয় হয় না?—তুই কেবল কালো মেঘের কোলেকোলে কলতান ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াস্?

পাখি! তুই ওই মেঘের মধ্যে কি দেখিস্ বল্ দেখি?

"ফটী-ইক-জল!"

ছিঃ, ও কথা কি ব'ল্তে আছে? ওতো গেল কল্পনাপ্রিয় কবির কথা। সোণার পৃথিবী; এখানে স্ফটিকস্বচ্ছ সলিলের কিছু অভাব আছে কি? সাগর-পোরা, নদ-নদী-ভরা, তড়াগ-দীঘি আরও কত কি বোঝাই-করা জল র'য়েছে, কই পাখি! তুই তো তাদের দিকে একবার নীচু-মুখে চাহিয়াও দেখিস্ না; সদাই চঞ্চু উঁচু করিয়াই আছিস্। সে কি কেবল ঐ এক ফোঁটা জলের জন্য? এ কথা বিশ্বাস করিবেই বা কে? ধরণীর রাশিরাশি অযাচিত বারি পরিত্যাগ করিয়া কেবল এক বিন্দু জলের জন্য জলদের কাছে যাচকতা করিতে যাওয়া, অমূল্য জীবনকে শতশত বিপদের সম্মুখীন করিতে যাওয়া তো বাতুলেরই কর্ম্ম। সাধ করিয়া এ কার্য্য কেহ করে কি?

পাখি! আমার বোধ হয় তা নয়। তোর ঐ মেঘের কাছে ঘুরে-বেড়ানোর আরও কিছু মর্ম্ম আছে। কবি কালিদাস ব'লেছিলেন,—"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ"—মেঘ দেখিলে প্রিয়-সঙ্গমে সুখী জনেরও মন আর-একরকম হ'য়ে উঠে। হাঁ পাখি, তোরও কি

তাই হয়? জলধর দেখিলে তোরও কি চিত্ত কেমন কেমন হ'য়ে উঠে? হয়,—হউক। কিন্তু কিসের জন্য? বলিবি—প্রিয়ের জন্য। ভাল, তাহাই হইল। কিন্তু পাখি! তুই মেঘের মধ্যে প্রিয়ের কি নিদর্শন দেখিতে পা'স্ বল্ দেখি? মেঘের সঙ্গে আর তোর প্রিয়ের সঙ্গে কিছু-না-কিছু মিল তো আছেই? বল্ রে চাতক বল্, তোর সে প্রিয় কে? নিশ্চয়ই তিনি সামান্য কেহ হইবেন না। যাঁর সাহসে খুদে পাখী তোর এত সাহস। পাখি! না জানি তুই তাঁর কাছে কি এক সামগ্রী পেয়েছিস্, কি এক মন্ত্র শিখেছিস্, যার বলে তুই পৃথিবীর কিছুই স্পর্শ করিস্ না। বাসা করিস্—তা-ও নিজেরই পালকে। বৃক্ষ-বল্লরীতে বসিস্‌ও না; আকাশে-আকাশেই উড়িয়া বেড়াস্। প্রাণে স্ফূর্ত্তিই বা কত? গানটি মুখে লাগিয়াই আছে। জলদের গর্জ্জন-বর্ষণে তোর স্ফূর্ত্তি যেন আরও বাড়িয়াবাড়িয়াই উঠে। কার্ সাহসে তোর এত সাহস রে পাখি? তার কথা একবার বল্ দেখি রে।

"চিরির্—চির্ চির্—চিরির্!"

ও কি বলিলি রে পাখি,—ও তোর কোন্‌দেশী ভাষা? শিশুর অস্ফুট ভাষার মত তোর ভাষাও যে বড় মিষ্ট লাগিল; কিন্তু ভাব তো কিছু বুঝিলাম না। কি বলিস্ রে পাখি! তোরে সুধাই;—ঐ মেঘের মাঝে তুই কি সেই নবঘনশ্যাম নয়নাভিরাম রামচন্দ্রকে দেখিস্, আর আনন্দে অধীর হইয়া ঘুরিয়া বেড়াস্? আহা, তিনি যে দয়ার সাগর! তাঁর কাছে ছোটবড় নাই, পশু পক্ষী নাই; তিনি সকলকেই কোল দেন, সকলকেই ভাল বাসেন। আহা, তিনি গুহক চণ্ডালকে কোল দিয়াছেন, শবরীর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছেন, বনের বানরকে বন্ধু বলিয়াছেন, ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীর গাত্রে পদ্মহস্ত বুলাইয়াছেন। আর পক্ষিপ্রীতি তো তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি। গৃধ্ররাজ জটায়ুই তো তাহার

সাক্ষী। তাই বুঝি পাখি! তুই মেঘের মধ্যে তাঁহার চিরদিব্য মূর্ত্তি দেখিয়া ভালবাসার ভিখারী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াস্? ভীষণ বজ্রধ্বনি বুঝি তাঁহার ধনুকের টঙ্কার বলিয়াই তোর মনে হয়? বিজলীর বিকাশ বুঝি তাঁহার আগ্নেয় অস্ত্র বলিয়াই তোর বোধ হয়? তাই বুঝি আর ভয়ও হয় না? বল্ পাখি! বল্, তাই নয় কি?

"চিরির্ চিরির্—চির্ চির্ চিরির্!"

কি বলিস্ রে পাখি! তোর ও কথার মর্ম্ম কি বুঝিব? তবে কি তুই আর কাউকে দেখিতে পা'স্? আহা বুঝেছি বুঝেছি, তুই ঐ মেঘের মাঝে আমার শ্যামা মাকেই দেখিতে পা'স্। মাকে পেয়েই বুঝি তোর স্ফূর্ত্তি অত বেড়ে বেড়ে উঠে। আহা, মার আমার সন্তানের প্রতি কতই করুণা। তুমি মার প্রতি দক্ষিণ হ'ও—উন্মুখ হ'ও, মা-'ও তোমার প্রতি দক্ষিণা—বরাভয়করা। করুণাময়ী মা আমার দুষ্টদলনীও বটে। তুমি মার প্রতি বাম হ'ও—বিমুখ হ'ও, মা-ও তোমার প্রতি বামা—খড়্গ-মুণ্ড-ধারিণী। পাখি! তুই বুঝি সেই মুক্তকেশী মার আমার রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখেছিস্? দেখেছিস্ বুঝি,—তাঁর চরণে যে আসিয়া পড়িতেছে, সে-ই শিবত্ব লাভ করিতেছে? তাই বুঝি সেই অভয়ার পাদপদ্ম-আশেই তুই ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বেড়াইতেছিস্? মেঘের প্রচণ্ড গর্জ্জন বুঝি তোর ভীমাভৈরবীর অট্টহাস্য বলিয়াই বোধ হইতেছে? বিদ্যুদ্বিকাশ বুঝি তাঁহারই হাস্যচ্ছটা কিংবা অসির আস্ফালন বলিয়াই মনে হইতেছে? পিতামাতার হুঙ্কার-গর্জ্জনে সিংহশিশুর আনন্দই বাড়িয়া উঠে। তাই বুঝি মায়ের সন্তান মনে করিয়া তোরও প্রাণে এত আনন্দ? বল্‌রে পাখি! বল্, সেই অভয়ার পায়ে প্রাণ সঁপিয়াই কি তুই অভয় হ'য়েছিস?

"চির্ চির্—চিরির্ চির্—চিরির্!"

আবার কি বলিস্ রে পাখি! তুই যে আমায় পাগল করিলি দেখিতেছি। আমিও সুধাইতে ছাড়িব না, তুইও বলিতে ছাড়িবিনি। অথচ তোর ঐ দেবভাষার ভাবও কিছুই বুঝিয়া উঠা যায় না। বড় মুস্কিলেই পড়িতে হইল। এই যে বৃষ্টিও আসিল, ভিজিবই বা কতক্ষণ? বল্ ভাই! তবে আর কি দেখিস্? তবে কি তুই মেঘের মাঝে সেই অধরে মুরলীধর নবজলধরবর্ণ ব্রজনাগরকে দেখিতে পা'স? বোধ হয় তাহাই হইবে? তা না হ'লে তুই অত মনমাতান গান শিখিলি কোথা হইতে? সে যে গান বড় ভাল বাসে, তাই বুঝি তুই তারে হেরে গানের তানে সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিস্? ঐ ইন্দ্রধনু দর্শনে তোর বুঝি তাঁরই মাথার ময়ূরপাখার মোহনচূড়া মনে হইতেছে? ঐ বকপংক্তি দেখিয়া তাঁরই গলার শ্বেতগুঞ্জার মালা বোধ হইতেছে? ঐ সৌদামিনীর ছটা দেখিয়া তাঁরই পীতবসন বলিয়া মনে হইতেছে? মনে হইতেছে বুঝি, এখনই তিনি লীলামৃত বর্ষণ করিবেন, আর আকণ্ঠ পূরিয়া তাহা পান করিবি? এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, পাখি! তোর এত আনন্দ কিসের? বুঝিলাম,—ঐ আনন্দের নেশাতেই তোর ভয়ভাবনা দূরে গিয়াছে; জগতের সামগ্রীই তুচ্ছ বলিয়া মনে হইয়াছে। তাই নয় কি পাখি! তাই নয়? ঐ দেখ্ পাখি! আর কঠোর বজ্রনির্ঘোষ নাই, গুরুগুরু মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইয়াছে। এ গর্জ্জনে আর হৃদয়ের দুরুদুরু স্পন্দন হয় না; বরং আনন্দেই তাহা আন্দোলিত হইতে থাকে। ব্যাপারটা কি বুঝিয়াছ কি? ঐ বিজয় বাজনা বাজিল,—রাসলীলারম্ভের মুরজ-মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিল। আর ঐ দেখ, শ্যামল মেঘের মাঝে মাঝে চপলার খেলা! দেখিতেছ কি ভাই? হায়, আমি কি পাগল; আমি আবার পাখীকে দেখাইতেছি! ও লীলা না দেখিলে কি আর পাখী অত আত্মহারা হইতে পারিত? হায়, পাখীরা বুঝি ঐ রকমই দেখিতে পায়। শুক-

দেবের সহিত পাখীর একটু সম্পর্ক ছিল বলিয়াই বোধ হয় তিনিও বলিয়া গিয়াছেন,—"তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ"—(রাসমণ্ডলে গোপিকাগণ যেন মেঘচক্রে বিদ্যুতের মত শোভা পাইয়াছিলেন)। হাঁ ভাই পাখি! সত্য করিয়া বল্ দেখি, তাই কি তোর এত আনন্দ? সেই লতায়-পাতায় প্রেমদাতার প্রেম অধিকার করিয়াছিস্ বলিয়াই কি তোর আর বাহিরের কিছুই প্রয়োজন হয় না?

"চিরির্ চিরির্—চির্ চির্—চিরির্ চিরির্!"

ও বিহঙ্গম! আবার কি বলিস্? ঐ দেখ্ সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, জলদজাল ভেদ ক'রে রবির রাতুল রশ্মি ফুটে উঠেছে, এখনই এখান থেকে চ'লে যেতে হবে যে ভাই! যদি ব'লতে হয় তো এই বেলাই স্পষ্ট ক'রে ব'লে ফেল ভাই! ব'লে ফেল। তোর কাছে হদিস পেয়ে আমিও তোকে ওস্তাদ ব'লে মেনে নিয়ে ঘরে চ'লে যাই, আর তোর মত কারুর তোয়াক্কা না রেখে স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইতে চেষ্টা করি। না ভাই! তোর কথা কিছু বুঝা গেল না। তোর ও ভাষার ভিতর প্রবেশ করা আমার সামর্থ্যেও কুলাইল না। তবে আমি ঘরেই চলিয়া যাই। কি বলিস্ পাখি! কি বলিস্?

"চিরির্ চিরির্ চির্ চির্—চির্ চির্ চিরির্!"

চাতক! এইবার তোর কথা যেন বুঝেছি-বুঝেছি বোধ হ'চ্ছে। তুই তো ঐ বিদ্যুতের ছটায় ঢাকা কালো মেঘের মাঝে আমার সেই বিদ্যাদ্‌বরণীর ভাবকান্তি-মাখা প্রভুকে—ঐযে সেই অন্তরে কৃষ্ণ বাহিরে গৌর—প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গকে,—ঐযে যাঁর "দামিনীদাম-দমন রুচি দরশনে" কন্দর্পের রূপ-দর্প দূর হইয়া যায়, সেই মনোমোহনকে দেখিতেছিস্? ঐযে অস্তোন্মুখ তপনের লোহিত কিরণ তাঁহার গৈরিক বসনের ন্যায় শোভা পাইতেছে না? ঐযে জলধরের মৃদু মধুর গর্জ্জন প্রেমোদ্দাম

প্রভুরই হুহুঙ্কার-গর্জ্জনেরই মত শুনা যাইতেছে না! ঐযে বিন্দু বিন্দু বারি বর্ষণ, তাঁহারই প্রেমাশ্রুপাতের ন্যায় দেখাইতেছে না? আহা, সেই যেচে-যেচে প্রেমবিলানো ঠাকুরকে দেখিয়াই বুঝি তোর এত আনন্দ? পাখি! তোর এ চিরির্‌চিরিরের মর্ম্ম আমি এতক্ষণে বুঝিলাম। তাঁরই মুখে প্রেমেমাখা হরিনাম কীর্ত্তন শুনিয়া তুই হরিকীর্ত্তন করিতে শিখিয়াছিস্, আর তাঁরই মত বন্ধুবান্ধব সঙ্গে লইয়া নানা রঙ্গে মধুর মধুর হরিকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছিস্। তাই নয় কি চাতক! তাই নয়? সেই অনর্পিত প্রেমের আভাস না পাইলে আর ক্ষুদ্র পক্ষীর অত সাহস অত আনন্দ আসিবে কোথা হইতে?

এবার পাখী আর কিছুই বলিল না। কেবল একবার 'চিরির' করিয়া কাণের কাছ দিয়া চোঁচাঁ কোথায় চলিয়া গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। আমিও তাহার অপেক্ষা না করিয়া ঘরেই চলিয়া আসিলাম। কেবল মনে হইতে লাগিল যে, চাতক যেন বলিয়া গেল,—তুমি আমার মত বন্ধুবান্ধব লইয়া একপ্রাণে একতানে হরি-কীর্ত্তন কর, আমারই মত তুমি নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারিবে, আমারই মত তুমি সমগ্র জগৎকে তুচ্ছ বোধ করিতে পারিবে, আর আমারই মত তুমি পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারিবে।

[বঙ্গবাসী ; ১৫ই শ্রাবণ ; ১৩১৬ সাল।]

পিঞ্জরের কোকিল।

আমাদের একটা পোষা কোকিল আছে। তাহাকে লইয়া আমি বিষম জ্বালাতেই পড়িয়া গিয়াছি। ভাবনা,—বুঝি বা পাগলই হই।

পোড়া কোকিল কাছে গেলেই কুক্ কুক্ কুক্ কুক্, কুঁক্ কুঁক্ কুঁক্-কুঁক্, কুকুক্-কুকুক্ প্রভৃতি বুলি আওড়াইয়া কত যে সোহাগ জানায়, ভালবাসা জানায়, তাহা আর কি বলিব। সে খাঁচার কাঠির ফাঁক দিয়া ঠোঁট গলাইয়া গলাইয়া দেয়। তুমি হয় ত বলিবে,—ও পাখী ঠোকরাইবার জন্যই ঠোঁট বাড়াইতেছে, কিন্তু আমার মনে হয়—তা নয়। ওর তো পুঁজির মধ্যে ওই ঠোঁট দুখানি; সোহাগ জানাইতে বা আদর জানাইতে হইলে ওই ঠোঁট ছাড়া উহার আর গতি কি আছে? তাই সে ওই সোহাগের বুলি আওড়াইয়া ঠোঁট বাড়াইয়া আদর-সোহাগই প্রকাশ করিয়া থাকে। কোকিলের এই ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার কত কথাই মনে হয়। হায়, এই পিঞ্জরের অভ্যন্তরে ইহাকে সোহাগ শিখাইতে কে আসিল? কাহার্ ইঙ্গিতেই বা কোকিল এত সোহাগের বুলি আওড়াইতে শিখিল?

একদিন রাত্রিকাল। গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন। মহাপ্রলয়ের অবসানের ন্যায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নিস্তব্ধ। অকস্মাৎ সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া আকাশে একটা শব্দ শুনা গেল—

ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ ক্যাঁক্!

আর যায় কোথা, আমার ঘুমন্ত কোকিলটা অমনি ঝটপট্ করিয়া জাগিয়া উঠিল। তাহার প্রাণের ভিতরটা তথন কিরূপ করিয়া উঠিল বলিতে পারি না, সে যেন কেমন-কেমন কেমন-একতর হইয়া—

শরীরের সকলটাই যেন স্বরের মধ্যে মিশাইয়া দিয়া, যতদূর সম্ভব গলা ছাড়িয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

কার্য্য-অনুরোধে আমায় ঐ সময় উঠিতে হইয়াছিল। কোকিলের কাণ্ডকারখানা আমার নজরে পড়িয়া গেল। ভাবিলাম,—এ কি? পরে অনুসন্ধানে বুঝিলাম,—একটী কোকিলা ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া আকাশে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর তাহার সেই ডাক শুনিয়াই কোকিলটা অমনতর করিয়া উঠিয়াছে। বাহিরের ব্যাপারটা বু'ঝলাম বটে, কিন্তু ভিতরের ব্যাপার যে কি, তাহার অন্ধিসন্ধি খুঁজিয়া পাইলাম না। কেবলই মনে হইতে লাগিল,—আকাশের ওই ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ স্বর যে কোকিলারই কণ্ঠস্বর, তাহা এ পিঞ্জরের কোকিলকে কে বলিয়া দিল? বলিতে কি, আমার এ কোকিল ত আবাল্য ব্রহ্মচারী,—কোকিলার মুখও কখনও দেখে নাই, তাহার কথা কখনও কাণেও শুনে নাই। আমার কোকিল, আমি ত জানি, ওতো সেই ডানা উঠিতে-না-উঠিতে—কুহূস্বর ফুটিতে-না-ফুটিতে ঠোক্করে ঠোক্করে বায়সের বাসা হইতে বিদায় প্রাপ্ত কোকিল? আর তারপর হইতেই না সে আমার এই পিঞ্জরের মধ্যেই অবরুদ্ধ? তাহাকে এ কোকিলার কথা কে-ই বা বলিয়া দিল?

আরও মনে হইতে লাগিল,—কোকিল পরভৃত। কাকেই তাহাকে মানুষ করে। সে এ জগতে আসিয়া যদি মাতা পিতা বলিয়া কাহাকেও বুঝিয়া থাকে, তাহা সেই কাকই। সে যদি মাতাপিতার স্নেহমমতার সম্ভাষণ কিছু শুনিয়া থাকে, তাহা সেই কাকেরই কা কা রব। যদি সে স্বজাতীয় মহিলা কিছু দেখিয়া থাকে, তাহা কোকিলা নয়—কাকেরই কামিনী। তাহার জননীর সহিত সম্বন্ধ—বায়সের বাসায় চুরি করিয়া ডিম্বত্যাগ পর্য্যন্ত। তাহার পিতার সহিত সম্বন্ধ—রেতঃসেক পর্য্যন্ত। তবে

তাহাকে কোকিলার কণ্ঠস্বর কে পরিচিত করিয়া দিল? আর তাহাকে পাইবার জন্য তাহার প্রাণের মধ্যে এ ব্যাকুলতাই বা কে জাগাইয়া দিল? এ প্রহেলিকার উত্তর ভাই, তোমরা দিতে পার কি? দিবেই বা কি;—পূর্ব্বজন্মের সংস্কার,—না তাহার জাতিগত স্বভাব,—না সময়ের গুণ,—না আর কিছু?

কল্পনাজীবি কবির দল কোকিলের ভাষার কত ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। কেহ বলেন,—কোকিল কুহূ কুহূ ডাক ছাড়িয়া—বিরহিণীদের উপকারের জন্য—কুহূ শব্দের অর্থ অমাবস্যা—সেই অমাবস্যাকেই ডাকিতেছে। পূর্ণিমার চাঁদ দেখিলে বিরহিণীদের বিরহবিকার বাড়িয়া যায় কিনা? কেহ বা তাহার বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া বলেন,—বিরহিণীর প্রাণ হু হু করিয়া জ্বালাইবার জন্যই—তাহাদিগকে উহু উহু ডাক ছাড়াইবার জন্যই—কোকিল কুহু কুহু ডাক ছাড়িয়া থাকে। কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমচন্দ্র ত সাফ জবাবই দিয়া গিয়াছেন,—কোকিলে কুহূ বলিয়া ডাকে না, সারা সংসারটাকেই কু বা কুৎসিৎ প্রতিপন্ন করবার জন্যই কুঁচ-চোকো কালো কোকিল কু-ও কু-ও করিয়া ভ্যাংচাইয়া থাকে। আমার কিন্তু তাহা মনে হয় না।

তুমি বৈজ্ঞানিক, তোমার বিজ্ঞানের মতে না মিলিতে পারে, তুমি তার্কিক, তোমার তর্কের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারে, তুমি মামলাবাজ তোমার মতে আপীলেও না টেঁকিতে পারে, কিন্তু আমার কথাটা আমি তোমাদিগকে শুনাইতে ছাড়িব না—ভাবিয়া দেখিবার অনুরোধ করিতেও ছাড়িব না।

প্রাণের কথা খুলিয়া বলিলেই লোকে বলে পাগল। তা বলে বলুক, ক্ষতি নাই। বরং এ পাগল বদনামে সুখীই হইব। ভাই রে, বলিব কি, আমারও পিঞ্জরের পাখী—হৃদয়পিঞ্জরে পঞ্চকোষ-পিঞ্জরে অবরুদ্ধ বিহঙ্গম,

—এ সেই বৈদিক "দ্বা-সুপর্ণা" জাতীয় পক্ষী কিনা জানি না,—কেবল ওই পিঞ্জরের কোকিলের মত ব্যাকুলতাভরে আকুল প্রাণে আনচান করিয়া নীরব গভীর চীৎকার করে বলিয়াই তাহাকে 'পাখী' বলিয়া বলিতেছি,—আমার সেই পিঞ্জরের পাখী, কি জানি কাহার জন্য,—অজানা অচেনা সেই কাহার—কাহার—কাহার জন্য,—সেই বলি-বলি বলা-যায়-না, মরিমরি আহা-মরি কাহার জন্য,—সেই মধুর-মধুর বড়ই-মধুর কাহার জন্য, কেমনকেমন করিয়া উঠে। মাঝেমাঝে বুকের মাঝে কাহার যেন সাড়া পাইয়া মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়া বসে। আর আমার ওই পিঞ্জরের কোকিলেরই মত সেই অজানা অচেনা স্বর ধরিয়া আপন স্বরের লহরী ছুটাইতে থাকে।

বলি হাঁগা, তুমি কেগা? তুমি রসিক বট; কিন্তু সংসারের তীব্রতাপে যাহাদের সকল রস শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাদের সহিত এরূপ সাংঘাতিক রসিকতা—নির্ম্মম নিষ্ঠুর রসিকতা কি ভাল,—না করিতেই আছে? তুমি কে গা? তুমি আড়াল থেকে সাড়া দিয়া পাশ কাটাইয়া স'রে পড়; ধরা-ছোঁয়াও দাও না। প্রাণে কেবল বাসনা জাগাও,—উদাস করিয়া উধাও করিয়া দাও, অবশেষে হতাশ্বাসের উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে দগ্ধ বিদগ্ধ করিয়া ফেল;—তুমি কে গা?

তুমি যেই হও, তোমাকে না পাইয়া যত যাতনাই অনুভব করি না কেন, কিন্তু সে যাতনাও রতন-জড়িত অমৃতপ্লাবিত,—বড় সুন্দর, বড় মধুর! এই যাতনাই যাতনা-অবসানের যাতনা, শেষ যাতনা কি না জানি না, কিন্তু এই নব বসন্ত সমাগমে যখন প্রকৃতি দেবী ফুল্ল ফুল-সাজে সাজিয়া মোহিনী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হন, সেই সময়টাতেই ওই যাতনা যেন আরও বাড়িয়া বাড়িয়া উঠে,—'কি জানি কি ছিল, হায় কোথায় গেল' ভাবে বুকটা যেন কেমন খালিখালি ঠেকে,—আর না-

জানি কাহার মিলনের আশে লক্ষ্যহীন নয়ন শূন্যেশূন্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। সেই 'না জানি কে'-ই কি আমার তুমি? হায় হায়! এ প্রশ্ন কাহাকেই বা শুধাই, কে-ই বা উত্তর দেয়!

পোড়া কোকিলটাও এই সময় কিছু বেশী-বেশী জ্বালায়। তাহার গলাবাজির মাত্রাটা এই সময় যতদূর চড়িবার চড়িয়াই উঠে। কবি বলেন,—সে পঞ্চমে তান ধরে। কিন্তু আমার মনে হয়,—পঞ্চম তো পঞ্চম, তাহার ডাক সপ্তমও ছাড়াইয়া যায়,—পার্থিব-গীতিরাজ্যের সকল গ্রাম অতিক্রম করিয়া সে আর কোন্ গ্রামে চলিয়া যায়।

বোধ হয়, এটা এই বসন্ত সময়েরই গুণ হইবে। এই সময় সকলের প্রাণেই কেমন একটা মিলনের আশা জাগিয়া উঠে। কোকিলের কোকিলা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। সে তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ মিলনের আশাব্যঞ্জক উচ্চভাষা প্রকাশ করে। সে ভাষাকে তোমরা কুহুই বল, কুহুই বল, আর কুওই বল। আমি কিন্তু বলি,—আমার হৃৎপিঞ্জরের পাখীর কথায়-কথায় মিল হয় বলিয়াই বলি,—কোকিল কলকণ্ঠে কেবল বলে,—পিও পিও পিও,—অর্থাৎ প্রিয় প্রিয় প্রিয়। অথবা কোকিল যাহার সাড়ায় জাগিয়া উঠিয়াছে, দেখি-দেখি করিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইয়া শূন্যে আঁধারে লক্ষ্য করিয়া কেবল বলে,—কোই কোই কোই?—ওগো! আমার মন-ভুলানো প্রাণ-মাতানো কোথায় তুমি,—কোই কোই কোই?

হায়, পিঞ্জরাবদ্ধ অবোধ কোকিল! তোর কেবল ডাকাই সার। কোথায় প্রিয়, কোথায় কে? না, না, আয় আয় ভাই, আমি তোকে পিঞ্জর-মুক্ত ক'রে দেই। যা যা ওই শূন্যে শূন্যে মহাশূন্যে চলিয়া যা,—এ বিচ্ছেদমিশ্র, স্বার্থমিশ্র জ্বালা-মাখা মিলনের রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া দূরে দূরে—বহুদূরে চলিয়া যা, আর তোর প্রিয়ের সেই আকর্ষিণী মনোহর্ষিণী

ধ্বনি ধ'রে তাঁহার সহিত মিলিত হ'। যা-যা কোকিল, এই তোকে ছেড়ে দিলাম। যা ভাই কোকিল যা; কেবল একটা কথা ব'লে দিই, সেইটুকু মনে রাখিস্। ছাখ ভাই কোকিল, একবার আমার দিকে—বাহিরে নয় ভিতরের দিকে চাহিয়া ছাখ,—আমিও ঐরূপ মরমে মরিয়া তোরই মত প্রিয়-প্রিয় করিয়া কতই না কাতর চীৎকার করিতেছি। সম-দুঃখী না হ'লে তো অন্তরের বেদন বুঝানো যায় না; তাই তোকেই এই দুঃখের কথাটা জানাইয়া রাখি। যখন তোর প্রিয়ের সহিত মিলিত হইবি, তখন এই পিঞ্জরমুক্তির কথাটা মনে কোরে আমাকে প্রাণ ভোরে আশীর্ব্বাদ করিস্;—আমিও যেন পিঞ্জরমুক্ত হোয়ে তোরই মত প্রিয়ের সহিত সঙ্গত হইতে পারি। কিন্তু হায়, এ হতভাগ্য আবদ্ধ জীবের পিঞ্জরের অবরোধ কে মুক্ত করিয়া দিবে? হায়, প্রিয়! হায় প্রিয়! হায় প্রিয়! তবে কি মিলন হোলো না?

কোকিলকে পিঞ্জরের বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু হায়, চিরদিন পিঞ্জরের মধ্যে অবরুদ্ধ থেকেথেকে তাহার পাখার জোর কমিয়া গিয়াছিল। তাই সে উড়িতে গিয়া উড়িতে পারিল না, বুকভরা ব্যাকুলতা লইয়া আমার বুকের উপর পড়িয়া গেল। উঃ, বুকে যেন বাজের মত বিষম বাজিল। করি কি, আমিও খাঁচার পাখীকে খাঁচায় পূরিয়া রাখিয়া দিলাম। কিন্তু প্রাণে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। আমি সেই ক্লেশের অসহ্য বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া উদাসপ্রাণে সেইখানেই বসিয়া পড়িলাম। সঙ্গেসঙ্গে সংজ্ঞাও বিলুপ্ত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে প্রাণের ভিতর হইতে বাঁশীর স্বরে কেবল এই কয়টি কথা শুনিতে পাইলাম,—তুমি বৃন্দাবনের পাখী; তুমি সেই মিলনের মূল কেন্দ্র বৃন্দাবনে—রাধারাণীর প্রেমের বনে বৃন্দাবনে মনেমনে উড়িয়া যাও। এখানে তোমার বৎসরে একবার বসন্ত বই তো নয়;—সেখানে তুমি বারমাস

বসন্ত পাইবে। বারমাসই তথায় প্রকৃতিরাণী ফুলসাজে সাজিয়া আছেন। বারমাসই তথায় যামুনজলকণবাহী ধীর সমীরণ সঞ্চালিত, বারমাসই তথায় কেলিকুঞ্জকুটীর কোকিল-কলনাদে মুখরিত। বারমাসই তথায় অন্তরের আশা জাগাইতে পারিবে। বারমাসই তথায় বিরহ-বিধুরতা বাড়াইতে পারিবে। যাই প্রাণভরা ব্যাকুলতা প্রস্তুত হইয়া যাইবে, আর তোমার মিলনের ভাবনা নাই। তোমার সেই বাঞ্ছিত ধন বনমালা পরিয়া সেই বনে-বনেই ঘুরিয়া বেড়ান; তোমার সেই চরম-সীমাপ্রাপ্ত ব্যাকুলতা দেখিলেই তিনি আপনি এসে তোমার পাশে দাঁড়াইবেন। আর হেসে-হেসে সোহাগের ভাষে তোমার সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিয়া বুকে তুলিয়া লইবেন!

[বঙ্গবাসী ; ৫ই চৈত্র ; ১৩১৬ সাল।]

বায়স-কোপ।

ভাই! যা মনে ক'চ্ছো তা নয়। সেই হেঁয়ালিগুলো জান ত,—'যা ভাবো তা নয়', এ-ও তা-ই,—যা ভাবো তা নয়। এ সেই এলফিন্‌ষ্টোনের বায়স্কোপ নয়, রয়েল বায়স্কোপ নয়, ইণ্ডিয়ান বায়স্কোপও নয়।

ব্যাপারখানা খুলিয়াই বলি;—কর্ত্তা বড় রেগেছেন। কর্ত্তাটি কে,—বুঝেছ ত? ইনি হ'চ্ছেন সেই 'বায়স'—কালো কিট্‌কিটে কাক্। এই কাকের কোপে পোড়ে আমার প্রাণ যায়যায়।

কয়েকদিন হইতে দেখিতেছি,—দুপুর বেলা আমি যাই আহারান্তে একটু বিশ্রাম করি, অমনি তিনি কোত্থেকে এসে বারাণ্ডায় ব'সে তাঁহার সাধা গলায় কেঙ্কতের ঝঙ্কার আরম্ভ করিয়া দেন; সে রাগরাগিণীর আলাপচারিই বা কত। আঃ, কাণ তো ঝালা-পালা—প্রাণও যেন পালা-পালা!

রোজই এই কাণ্ড; ব্যাপার কিছুই বুঝি না। কত তাড়াই, কত তিরস্কার করি, কিন্তু তিনি আর নড়েন না,—সুর ভাঁজিতেও ছাড়েন না। আমি আর করি কি; পড়িয়া-পড়িয়া সেই হরেক রকম বুলি আওড়ানো শুনি; মাঝেমাঝে ভাবি—তাইতো শ্রীমান্ ভুষুণ্ডি-বংশধরের এত বাড় বাড়িল কেন?

দুই চারি দিন তো অমনি-অমনি কাটিয়া গেল; শ্রীল 'কা-কা' ঠাকুরের কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তারপর অনুক্ষণ সেই কথার অর্থানুসন্ধান করিতে করিতে একদিন অকস্মাৎ অন্তরে অর্থের স্ফূর্ত্তি হইল। ইহাকে তোমরা 'শ্রবণ'-সাধনের ফল বলিলেও বলিতে পারো; কেননা,—"ইত্থং বাক্যৈস্তদর্থানুসন্ধানং শ্রবণ-

স্তু তৎ” (পঞ্চদশী)। ফল,—বায়স মহাশয়ের বাক্যের অর্থ বারংবার অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলাম,—তিনি আমার উপর ভারি রাগিয়াছেন। সেই যে সেদিন কোকিলের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়াছি, তাতেই তাঁহার এত রাগ। এই কয়দিনের কথা হইতে তাঁহার কোপের কারণ যাহা কিছু বুঝিতে পারিয়াছি এবং সেই কোপ যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।—

অথ কাকের কোপোক্তি,—

বলি হাঁগা! তোমরা কেবল কোকিলই চিনেছ। সংস্কৃত কলেজের সেকেলে বুড়ো যদুপণ্ডিত তাঁর কেতাবে লিখ্‌লেন কি,—

“কালো বো'লে কাক নও কোকিল সমান।
পাথর'ও ত কেহ নুড়ি কেহ শালগ্রাম॥”

ব'য়ের নামও যেমনি—‘বাবু থ্রি পাইস্‌’; লেখবার ভঙ্গীও তেমনি। বলি কেন, কালো ব'লে আমরা চোরের দায়ে ধরা প'ড়েছি নাকি? আমাদের কি কোন গুণই নাই? আর তোমাদের কোকিলেরই যত গুণ? আমাদের চোখে ত ওর কোন গুণই ঠেকে না; ওর আগা-গোড়াই দোষ। চাল নেই, চুলো নেই, পর-ভেতো, পরঘোরো, অকৃতজ্ঞ নেমক-হারামের একশেষ। এর উপর আবার নবাবি কত? বুক ফুলিয়ে গলাবাজি ক'রে, এ-বন সে-বন বেড়িয়ে বেড়াবার ধূম দেখে কে? তোমরা বল,—‘কুও কুও’; আমরা বলি,—ওরা মদগর্ব্বে দুনিয়াটাকে ‘দুও দুও’ দিয়ে বেড়ায়। ঐজন্যই ত আমরা ওদের উপরে এত হাড়ে চটা। আমরা কালো এত ভালবাসি যে, কালোবর্ণেরও অপমান সহ্য করিতে পারি না। কেউ কতকটা কালোরঙ্গের নেকড়া লইয়া নাড়াচাড়া করিলেও আমরা “খা-খা” করিয়া তাহার মাথার উপর উড়িয়া বেড়াই,—ঠোকরাইতে যাই। কিন্তু কারুর বে-চাল দেখিলেই বুদ্ধি বিগ্‌ড়াইয়া যায়। হতচ্ছেরে কোকিলের বে-চাল

নয় কি? আমরা তা-দিয়া তার ডিম ফুটাইলাম, নিজের বাসায় রাখিয়া খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া মানুষ করিলাম, আর সে কিনা আমাদের শিখান বুলি না বলিয়া আর কার বুলি আওড়াইতে আরম্ভ করিল? সেই জন্যই ত আমরা তাকে বাসা থেকে তাড়াইয়া দিই,—সেই জন্যই ত তাকে আমরা দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারি না। জান ত, আমাদের কাকের রাজা-কাক—দাঁড়কাক, তাদের একজনের দুর্বুদ্ধি হ'য়েছিল, কতক্‌গুলো ময়ূরের পাখা ন্যাজে জুড়ে ময়ূর সেজে ব'সেছিল। তাকেই আমরা ঠোক্করে-ঠোক্করে কোথায় উড়াইয়া দিলাম,—এ তো আমাদের ঘরভেতো কোকিল। বলি হাঁগা ভালমানুষের ছেলে! বল দেখি, তোমাদের কারুরও এইরকম বে-চাল দেখ্‌লে তোমরা চটো কি না? বাপ-মা তোমরা, ছেলেপুলেদের মুখে বেয়াড়া বুলি শুনিলে, তাদের বেগড়ান চাল-চলন হাব-ভাব সাজগোজ দেখিলে, হাড়েহাড়ে চটিয়া যাও কিনা?

সেকেলে আর একটা বুড়ো কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখ্‌লেন কি,—

"অরসজ্ঞ কাক চূষে জ্ঞান নিম্বফল।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুল॥"

বায়াত্তুরে বুড়ো—বুড়োর ভীমরতি ধ'রেছিল, তাই অমন কথা লিখে গিয়েছে। আমরা হ'লুম অরসিক, আর কোকিল হ'লেন রসিক! বলি গোঁসাইজি! একবার আমাদের ঠোঁটদুখানি নিয়ে নিম্বফলটী ঠোকরাইতেন তো জানিতেন যে, আমরা রসজ্ঞ কি না? আর তোমার শুখ্‌নো আম্রমুকুলে ছাই রসটাই বা আছে কি? যাক্‌, তুমি বোষ্টম মানুষ, তোমায় বেশী কিছু ব'লবো না, তোমার রসিক কোকিলকে লইয়াই তুমি থাক। আমরা তোমাকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করি।

তোমরাও ত সব ভাগবতের ভারি ভারি ব্যাখ্যাতা, বল দেখি, তোমরা ভাগবতের এই জায়গার মর্ম্মটা কি বুঝেছ?

"তদ্‌বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা।
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্‌ক্ষয়াঃ॥" (১।৫।১০)

টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখেছেন,—

"বায়সং তীর্থং—কাকতুল্যানাং কামিনাং রতিস্থানম্‌।"

তোমরা ইহার অর্থ কি করিবে? কাকতুল্য কামীর রতিস্থান, না আর কিছু? শ্রীধর স্বামী ঐ শ্লোকের টীকাতেই আরও একটু লিখেছেন,—"হংসাঃ ত্যক্তবিচিত্রান্নাদিযুক্তে উচ্ছিষ্টগর্ত্তে কাকক্রীড়াস্থানে ন রমন্তে ইতি শ্লেষঃ।" এই শ্লেষার্থটুকু লইয়া ব্যাখ্যা কর দেখি, ব্যাখ্যাটা দাঁড়ায় কি? কামুকের যেমন উচ্ছিষ্টগর্ত্তেই প্রীতি, কাক আমরা, আমাদেরও তেমনি উচ্ছিষ্টগর্ত্তে প্রীতি। এ প্রীতিও তোমাদের মঙ্গলের জন্য, সে কথা পরে বলিতেছি; কিন্তু আমরা যে কামুক, এ কথা কিছুতেই মানিতে পারিব না। তা এর জন্য আমরা তোমাদের সঙ্গে সপ্তাহবিচার করিতেও প্রস্তুত আছি।

প্রথম দেখ, আমরা বৎসরের মধ্যে একবার কামক্রীড়ায় আসক্ত হই, তা-ও যদি তোমাদের ছেলেপুলেদের হস্ত হইতে বাঁচাইয়া বাসাটী প্রস্তুত করিতে পারি। নচেৎ আবার এক বৎসরের জন্য, কি কয়েক বৎসরের জন্য তাহা ঢাকা রহিল। এই ইন্দ্রিয়দমনশক্তি আমাদের আছে বলিয়াই না আমরা এত দীর্ঘজীবী? কখনও ঝড়-ঝাপ্‌টাটা না হ'লে আর বড় একটা আমরা মরি না। তা তোমরা সেই মরণটাকে পেচকের শাপই বল, আর যা-ই বল। এ-ত তোমাদেরই কথা,—

"কাক মৈল ঝড়ে।
পেঁচা বলে আমার শাপ লাগ্‌লো হাড়ে হাড়ে॥"

তা তোমরা যাই বল, আমরা কিন্তু কামুক নই। তবে আমরা নাকি তোমাদের বিনাট্যাক্সের মিউনিসিপালিটী, তাই ঐ উচ্ছিষ্টগর্ত্তের অপবিত্র সামগ্রীগুলি আমোদ করিয়া উদরস্থ করিয়া ফেলি। তা-ও তোমাদের মত

একাএকা কিংবা স্বামি-স্ত্রীতে বসিয়া খাই না, কাহাকেও বখ্রা দিবার ভয়ে দরজা বন্ধ করিয়াও দিই না, আমরা স্বজাতি পাঁচজনে মিলিয়া-মিশিয়াই আনন্দে ভোজন করি। কিন্তু হইলে কি হয়, আমরা যে কালো, কালোর ভালোটা কারুর নজরে পড়ে না,—দোষ গাইতেই সকলে মজ্বুত। জান ত, তোমাদের ঠাকুর কৃষ্ণ কালো, তিনি কবে ছেলেবেলায় খেলাধুলা ক'ত্তেক'ত্তে ব্রজবালার না-কি বসন চুরি ক'রেছিলেন, তাই নিয়ে তাঁর কলঙ্ক কত, কিন্তু রাজসভার মাঝে দুরন্ত দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ক'রে বিবস্ত্র ক'রতেছিল,—তখন যে সেই কৃষ্ণই দ্রৌপদীর বসন হ'য়ে তাঁর লজ্জা নিবারণ ক'রলেন, এটা আর কারুর চোখে প'ড়লো না। তা ও কালোরই কপাল ছাড়া কি ব'লব? যতই ভাল কাজ করুক না কেন, সুখ্যাতির ভাগ্যটা কালো-জাতির একেবারেই নাই।

হয় তো তুমি রামায়ণ * হইতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ জয়ন্তের কথা তুলিয়া আমাদিগকে কামুক প্রতিপন্ন করিতে যাইবে। তাহার ভিতরের কথা বলিলে তাহাও পারিয়া উঠিবেনা। কেননা, জয়ন্ত পক্ক দাড়িম্ব ভ্রমেই সীতাদেবীর স্তনে আঁচড় পাড়িয়াছিলেন মাত্র। নচেৎ পক্ষিজাতির কি কখনও মানবী বা দেবীর উপর কামচেষ্টা হইতে পারে? তা শ্রীরামচন্দ্র যে তাঁহাকে দণ্ড দিলেন, তাহার উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধরণকে সাবধান করা ছাড়া আর কিছুই নয়। জগতের শিক্ষাগুরু এই ব্যাপারে জগৎকে শিক্ষা দিলেন,—পররমণীর উপর কামচেষ্টার অনুকরণে বা আভাসেই যখন ঈশ্বর-হস্তে এত দণ্ড ভোগ করিতে হয়, তখন প্রকৃত ব্যাপারে না জানি কতই অপরাধ কতই গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা। সুতরাং অবোধ পক্ষিজাতি

* কৃত্তিবাসী রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, শ্রীরামচন্দ্রের ভরদ্বাজ-আশ্রম হইতে চিত্রকূট-গমনের প্রসঙ্গ দেখ।

জয়ন্তের দৃষ্টান্তে অবোধ মানবের এইরূপ কার্য্য হইতে সাবধান থাকাই কর্ত্তব্য। সুতরাং যে দিক দিয়াই দেখ, কিছুতেই আমরা কামুক বদ্-নামের যোগ্য নহি।

তারপর দেখ, আমরা যে বৎসরে বৎসরে বাসা করি, সে-ও তোমাদের উপকারের জন্য। এক হিসাবে আমরা তোমাদের মিনি-মাইনের মালী। তোমাদের বাগানের ছোটছোট ফুল ফল বা বাহারি-গাছের কাটাই-ছাঁটাই কিংবা কেয়ারি করিবার জন্য মোটা মোটা মাহিনা দিয়া তোমরা মালী নিযুক্ত কর, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সেই বনমালীর এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড-বাগানের অথবা তোমাদের বাগানের যে বড় বড় গাছপালা আছে, তাহার শুক্নো ডাল ভাঙ্গিয়া তাহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার মালী কেহ আছে কি? সে সকল গাছের মালীগিরি ত আমরাই করিয়া থাকি? আমরা যেমন মিউনিসিপাল ট্যাক্স আদায়ের জন্য দুর্ব্বাসার অবতার বিল-সরকার তোমাদের দ্বারে পাঠাই না, সেইরূপ এই মালীগিরির মাহিনা বাবদে কোন প্রকার দাবি-দাওয়াও করি না। অথচ সেই সকল ফল ফুল উপ-ভোগ কর তোমরাই। সেদিন তোমার দু'টা ঝাঁটার কাঠী ভাঙ্গিয়াছিলাম বলিয়া তুমি আমার উপর বেজায় বেজার হইয়াছিলে; দুইটা বেছুট্ গালা-গালিও দিয়াছিলে, কিন্তু সে কাজটাও যে আমরা তোমাদের উপকারের জন্য করিয়া থাকি, তাহাও তোমাকে একটু বুঝাইয়া দিই। লোকে বলে,—"দশ রূপেয়া দেনা তো আক্কেল নেহি দেনা।" আমরা তোমাদের ওই দুইটী ঝাঁটার কাঠী লইয়া তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যের আক্কেল দিয়া থাকি, তাহা কি তোমরা জাননা? ও ঝাঁটার কাঠী লওয়া একটা উপলক্ষণ মাত্র। তোমাদেরই দার্শনিকগণ এই উপলক্ষণের দৃষ্টান্তে আমাদের কথারই অবতারণা করিয়াছেন,—

"কাকেভ্যো দধি রক্ষতাম্"—

কাক সকল হইতে দধি রক্ষা কর। অর্থাৎ কি না—'কাক সকল হইতে' এটা একটা কথার কথা। যাহাদের যাহাদের মুখ হইতে দধি রক্ষা করা উচিত, তাহাদের তাহাদের মুখ হইতে দধি রক্ষা কর। এটা যেমন একটা উপলক্ষণ, আমাদের ঝাঁটার কাঠী লওয়াটাও তেমনি আর একটা উপলক্ষণ মাত্র। অর্থাৎ এই উপলক্ষে আমরা তোমাদিগকে শিক্ষা দিই যে, তোমরা যেখানে-সেখানে ফাঁকেফোঁকে যে-সে সামগ্রী ফেলিয়া রাখিও না; তাহা হইলে এই ঝাঁটাগাছটার মতন সে সকল সামগ্রীও কাহারও-না-কাহারও দ্বারা নষ্ট হইবেই হইবে। বলি, তোমাদের ঘরের ভিতর ঐ যে ঝাঁটাগাছটা রহিয়াছে, তাহার কাঠী অপহরণ করিবার ক্ষমতা কি আমাদের আছে, না তাহা লইতে আমরা যাই? ফলে, অসাবধান তোমাদের সাবধান করিয়া দিবার জন্যই আমাদের এই ঝাঁটার কাঠী গ্রহণ করা। নচেৎ ভগবানের রাজ্যে আমাদের বাসা করিবার কাঠীকুটির কিছু অভাব ছিল না।

দেখ, তোমরা আমাদের কদর না জান, কিন্তু তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের কথা বুঝিতেন, আদরও যথেষ্ট করিতেন। দার্শনিক বড় বড় কথা বুঝাইবার জন্য তাঁহারা যে সকল লৌকিক ন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন,—'কাকাক্ষিগোলক' এবং 'কাকতালীয়' ন্যায় তাহার অন্যতম। আমরা জিতেন্দ্রিয় বলিয়া অনেকটা সার্ব্বজ্ঞসিদ্ধি আমাদের আছে। অনেক অনাগত বিষয় পূর্ব্ব হইতেই আমরা জানিতে পারি, আর বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য নানা প্রকার স্বরে তাহা প্রকাশিত করিয়া থাকি। তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তি মনীষিগণ আমাদের এই স্বর ধরিয়াই 'কাকচরিত্র' শাস্ত্রের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তোমাদের দেশের কাকের কথা তোমরা মানিবে কেন? তাহার কথায় কি আছে না আছে, দেখিবে কেন? তোমাদের ঝোঁক যে এখন বিদেশের দিকে। বিদেশীরাই এখন তোমাদের

দেশের যাহা কিছু লইয়া বাহাদুরী দেখাইবে; আর তোমরা কেবল ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া থাকিবে।

তোমাদের দার্শনিক পণ্ডিতগণ নানা প্রকারেই আমাদের আদর-মর্য্যাদা বাড়াইয়া গিয়াছেন। তাহার আর একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। 'স্বরূপ' আর 'তটস্থ' লক্ষণ দুইটা দর্শনশাস্ত্রের বড় বড় কথা। 'তটস্থ' লক্ষণের দৃষ্টান্ত দেখাইবার অনেক সামগ্রী থাকিলেও তাঁহারা কিন্তু আমাদের কথাই বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

"স্বরূপং তটস্থং দ্বিধা লক্ষণং স্যাৎ
স্বরূপে প্রবেশাৎ স্বরূপেঽনিবেশাৎ।
স্বরূপস্য সিদ্ধির্দ্বিধা লক্ষণাভ্যাং
যথা কাকবন্তো গৃহাঃ খং বিলঞ্চ॥"

আরও দেখ, তোমাদের পণ্ডিতচূড়ামণি চাণক্যও আমাদের কাছে পাঁচটী বিষয় শিক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাহার খবর রাখ কি?

"আকারেঙ্গিতগূঢ়ত্বং কালে কালে চ সংগ্রহঃ।
অপ্রমাদমনালস্যং পঞ্চ শিক্ষেত বায়সাৎ॥"

প্রাচীনেরা ত এখন তোমাদের কাছে Old fool; তাঁহাদের কথা তোমরা কাণে তুলিবে কেন?

তোমাদের দার্শনিক পণ্ডিতগণই যে কেবল আমাদের আদর করিয়াছেন, তাহা নয়, দেবতারাও কত কদর করিতেন, তাহাও দেখাই। জগদারাধ্যা দশমহাবিদ্যার অন্যতমা দেবী ধূমাবতী। তিনি আপন রথের ধ্বজে এই কালো কাককেই স্থান দিয়া রাখিয়াছেন। তোমরা এখন সাধনভজনের খবর ত রাখ না, রাখিলে আমাদের আদর-কদর

বুঝিতে পারিতে। দেবীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তোমাদের হৃদয়ের একটু ধার অধিকার করিতে পারিতাম। সাধন-ভজন ত দূরের কথা, তোমরা এখন গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্ম পঞ্চযজ্ঞও পরিত্যাগ করিয়াছ। পঞ্চ যজ্ঞের মধ্যে 'ভূতযজ্ঞ' একটী। সংহিতাকারগণের মতে—"বলির্ভৌতঃ।" অর্থাৎ জীবজন্তুকে লক্ষ্য করিয়া বলি বা অন্নাদি আহার্য্য উপহার প্রদানই 'ভূতযজ্ঞ'। প্রধানত আমরাই নিত্য তোমাদের দত্ত 'বলি' আহার করিয়া থাকিতাম বলিয়াই আমাদের একটী নাম 'বলিভুক্'। উদরসর্ব্বস্ব তোমরা এখন 'বলি' বলিতে কেবল জীববলিই বুঝিয়া থাক, এ বলির খবর আর রাখ না। তাই আমরা যে তোমাদের ধর্ম্মকর্ম্মের নিত্য সহচর, তাহা মনেও কর না। এখন তোমরা বৎসরান্তে নবান্নের দিনে দুইটা নূতন চাউলের লোভ দেখাইলে আমরা আর যাই না কেন? কাজেকাজেই ঐ দিনটায় আমাদের একটু আক্রা হইতে হয় বই কি?

তার পর দেখ, তোমরা এখন স্বদেশীর নিশান হাতে ধরিয়া তর-বেতর বিদেশী ফেসানে চুল ছাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছ, কিন্তু তোমাদের দেশী দেবতা—রামচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি, কিংবা বড়বড় রাজারাজোয়াড়া প্রভৃতি যে স্বদেশী ফেসানে চুল ছাঁটিতেন, তাহার নামও বোধ হয় তোমরা জাননা। জানিবে কোথা হইতে, শাস্ত্রে তো তোমাদের শ্রদ্ধা নাই, যেমন করিয়া পড়িতে হয়, তেমন করিয়াও তো পড় না? তোমাদের চুল ছাঁটার খাঁটী স্বদেশী ফেসান হইতেছে—কাকপক্ষ,—এই স্বদেশী কালো কাকের পাখার নামেই তাহার নাম,—তাহার আদর্শেই তাহার রচনা-বিন্যাস,—বুঝ্‌লে।

আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা আমাদিগকে এত অপবিত্র মনে কর কেন? স্বীকার করি, আমরা অনেক অপবিত্র বস্তু আহার

করি। কিন্তু তোমাদের মত লুকাইয়া চুরাইয়া নয়; প্রকাশ্যভাবেই আহার করি। তা-ও জাতীয় রীতি বলিয়া। কিন্তু তোমরা ও অপবিত্র বস্তুগুলো গেলো কি করিয়া? তা ছাড়া, তোমরা মুখে বল এক, কার্য্যে কর আর। তোমরা মুখে বল—'কাকে সকলের মাংস খায়, কিন্তু কাকের মাংস কেহ খায় না।' মিথ্যা কথা। এই তোমরাই বাগে পাইলে তা-ও ছাড়িয়া কথা কও না। তোমাদের কাকমাংসভোজী কাকুমারারাও তো মানুষ? সত্য কথা বলিতে কি, আমরা তোমাদের মত কপট নহি। বোধ হয় সেই কারণেই এই অপবিত্র উচ্ছিষ্টভোজী আমাদের বিষ্ঠা হইতে পরম পবিত্র বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। জান ত—

"উচ্ছিষ্টং শিবনির্ম্মাল্যং বমনং শবকর্পটম্।
কাকবিষ্ঠাসমুৎপন্নং পঞ্চৈতেঽতিপবিত্রকাঃ॥"

উচ্ছিষ্ট হইয়াও দুগ্ধ অতি পবিত্র, শিবের নির্ম্মাল্য হইয়াও গঙ্গা অতি পবিত্র, মধুমক্ষিকার বমন হইয়াও মধু অতি পবিত্র, মৃত গুটীপোকার বস্ত্র হইয়াও পট্টবস্ত্র অতি পবিত্র, তেমনি অমেধ্য অপবিত্র উচ্ছিষ্টভোজী বায়স যে আমরা, সেই আমাদের বিষ্ঠা হইতে জন্মায় কি না,—"অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং"—সেই গীতাপ্রোক্ত পরম পবিত্র অশ্বত্থবৃক্ষ। এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ, তোমরা আমাদের যতটা হেয় ও অপবিত্র মনে কর, শর্ম্মারা তাহা নয়।

'শর্ম্মারা' শুনিয়া হাসিলে যে? কেন, 'শর্ম্মা' বলিবার অধিকার কি আমাদের নাই? তোমরা বুঝি সেই উড়িয়া কবির কঁড়মড় কথাটা ধরিয়া রাখিয়াছ?—

"কাক চাণ্ডাল যেউপরি।
উত্তম দ্রব্য ভ্রষ্ট করি॥"—দার্ঢ্যভক্তি।

আমরা ও মূর্খ উড়িয়ার উড়ো কথা চুমকুড়ি দিয়াই উড়াইয়া দিই।

কবি তো জানেন না যে, শাস্ত্রে আমাদের দ্বিজত্বের 'ডকুমেণ্ট' আছে। তার উপর, আমরা কথায়-কথায় 'কমিটি' করিতে জানি। ধূর্ত্তপণার 'ডিপ্লোমা'-ধারীও বটি। সকলের উপর, অদম্য উদ্যম এবং অসাধারণ অধ্যবসায়ও ধরিয়া থাকি। বাসা-তৈয়ারি-ব্যাপারেই ত তাহার পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত। তখন চাণ্ডাল হইলেই বা আমাদের ঠেকায় কে? 'শর্ম্মা' হইতে আর আমাদের কতক্ষণ লাগে? জান তো, পণ্ডিতের আড়ন ভাটপাড়ার পাশেই কাকনাড়া; সেখানে আমাদের বড় বড় পণ্ডিত কাক আছে, পাবনা-জেলার কাকখোলাতে আছে, কলিকাতার বাগানে-বাগানেও (যথা—বাদুড়বাগান, নেবুবাগান, হাতীর বাগান প্রভৃতি) আছে, তখন ব্যবস্থার জন্যই বা আমাদের ভাবনা কিসের?

শেষ একটা কথা বলিবার আছে যে, আমাদের কণ্ঠস্বর বড় কর্কশ। 'যে যাকে না দেখিতে পারে তার চলন বাঁকা',—কাজেই কর্কশ। তোমরা যদি একটু সহৃদয়ের দৃষ্টি লইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিতে, তবে এই কালোর ভিতরেই কত সুন্দর কালো রূপের আলো দেখিতে পাইতে, আর এই কর্কশ স্বরের মধ্যেও কত মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারিতে। এ জগতে কোকিল, ভীমরাজ, ফিঙ্গে, বুল্‌বুল্ প্রভৃতি কত কালো পাখী থাকিলেও সহৃদয় কবির দল কালোর বর্ণনায় চিরকাল কাক-পংক্তিরই উল্লেখ করিয়াছেন। "কা কালিঃ কা মধুরা" ইত্যাদি শ্লোক তো তোমাদের জানাই আছে? তারপর আমাদিগের প্রাভাতিক 'কা' 'কা' 'কোবা' 'কোবা' রবও সাধকের কর্ণে বীণা-রবাবের সুশ্রাব্য স্বরলহরী অপেক্ষা সুমধুর বলিয়া অনুভূত হয়। কাকের কর্কশ কথা বলিয়া উপেক্ষা করিও না,—অনুরোধ করি, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, আমরা 'কা' 'কা' কিংবা 'কোবা' 'কোবা' বলিয়া আগে জাগিয়া উঠিয়া তোমাদের কর্ণে ঐ স্বর না শুনাইলে তোমরা নিদ্রা হইতে উত্থিত হও

কিনা? জানিয়া রাখ, এই নিদ্রাই কি, আর সেই অজ্ঞান-নিদ্রাই কি, সকল নিদ্রা ভাঙ্গাইবার একমাত্র মূল মন্ত্র হইতেছে—এই 'কা' 'কা' 'কোবা' 'কোবা' রব।

ভগবান্ অনন্ত। তাঁহার নাম গুণ লীলা সকলই অনন্ত। তাঁহার সেই অনন্ত নামের মধ্যে একটী নাম হইতেছে 'কিম্'। বিষ্ণুসহস্রনামে দেখিয়া থাকিবে,—

"একো নৈকঃ সবঃ কঃ কিং যত্তৎপদমনুত্তমম্"।

ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন,—"সদা প্রশ্নার্হত্বাৎ ভগবতঃ একং নাম কিম্ ইতি" ভগবান্ সর্ব্বদাই প্রশ্নার্হ অর্থাৎ প্রশ্নের যোগ্য। সর্ব্বদাই সকলে তাঁহার সম্বন্ধে কেবল প্রশ্নই করে,—সে কি বস্তু। এ প্রশ্ন আজ বলিয়া নয়, কাল বলিয়া নয়, চিরকালই চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু অদ্যাবধি কেহই নিরূপণ করিতে পারিলেন না,—সে কি বস্তু। আমরা প্রতিদিন প্রভাতে, সেই বলিবলি-বলা-যায়-না—ধরি-ধরি-ধরা-যায়-না—পুরুষ কি নারী নিরূপণ হয় না—কেমন বরণ কেমন ধরণ অবধারণ করা যায় না—সেই কি-বস্তুর কথাই 'কা' 'কা' 'কোবা' 'কোবা' রবে তোমাদের প্রাণে জাগাইয়া দিই। এ-ঘুম-ভাঙ্গার সঙ্গেসঙ্গে সে-ঘুম-ভাঙ্গার মন্ত্রটী জানাইয়া দিই। কিন্তু তোমরা ত তাহা শুনিয়াও শুন না। বুঝিয়াও বুঝ না। আমরা আর তার কি করিব বল?

'কেন' উপনিষদের প্রথম মন্ত্রে এই 'কিম্' শব্দের প্রতিপাদ্য বস্তুই নিরূপিত হইয়াছেন। তোমাদের অজ্ঞাননিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য এই মহামন্ত্রই প্রচারিত হইয়াছেন। সে কি বস্তু গো কি বস্তু, যাহার প্রেরণায় এই আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয়, সকল মন, সকল প্রাণ আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত হয়? কই,—সে কে গো কে? এই কি-বস্তুর সাড়া না পাইলে তো আর তোমরা জাগিবে না? তাই তোমাদের

হিতের জন্য, শত তিরস্কার, শত অপমান, শত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও প্রতিদিন নিশি না পোহাইতে পোহাইতে তোমাদিগকে 'কা' 'কা' 'কোবা' 'কোবা' রবে আমরা জাগাইয়া থাকি। সে ঘুমঘোরের জাগানর কথা তোমাদের প্রাণে না পঁহুছাইতে পারে, কিন্তু এই জাগরণকালের জাগানর কথা, যেন ভুলিও না। কাকের কর্কশ "ক্রেঙ্কার" বলিয়া অগ্রাহ্য করিও না। বিশেষত হিতসাধক উচিত-বক্তার কথা কিছু কর্কশই হয়। জানই তো,—"হিতং মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ।" অতঃপর বলাই বাহুল্য যে, দুইটা বিচি-পট্‌পটে আটা-চট্‌চটে পাকা বেল যদি আমরা না-ই খাইতে পাইলাম, তা বলিয়া আর আমরা জাহান্নমে যাইব না, তোমাদের কাছে অধিক অবজ্ঞাতও হইব না।

[বঙ্গবাসী ; ২৬শে চৈত্র ; ১৩১৬ সাল।]

জলি-বোট।

আমার কেমন একটা রোগ আছে। সময় সময় যাহাকে তোমরা জড়-জগৎ বল, সেই জড় জগতের সামগ্রী দেখিতে দেখিতে আমি যেন কেমন একতর হইয়া যাই, আর তোমাদের সেই জড়-পদার্থগুলি যেন কেমন সচেতন হইয়া উঠে,—বেশ মানুষের মত হাসিখুসি কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দেয়। সেটা তাদের গুণ কি আমার অবস্থার গুণ, ঠিক বলিতে পারি না। তবে নাকি তোমরা তাহাদিগকে জড়ই বলিয়া থাক, তাই আমাকেও বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে জড়-পদার্থ বলিতে হইতেছে; নচেৎ আমার ধারণায় জড় বলিয়া একটা কিছু আছে বলিয়াই আসে না।

সেদিন আমি রাম-শ্যামের 'বুড়া'র প্রসঙ্গ শুনিব বলিয়া আগে আগে বাবুঘাটে গিয়া বসিয়া আছি। সম্মুখে এক খানি প্রকাণ্ড জাহাজ। জাহাজের উপর অনেকগুলি জলিবোট সারি দিয়া সাজান রহিয়াছে। দেখিলেই মনে হয়, যেন যতটা যত্ন সমস্তই ওই বোট ক'খানির উপর ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে আমার কেমন মনে হইতে লাগিল;—এত বড় মস্ত জাহাজ, সে ওই খুদে খুদে বোটগুলিকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছে কেন? ছোট ছোট ছেলেপুলেকে যেমন লোকে ভাল বাসে, আদর করিয়া বুকে রাখে, মাথায় রাখে, এ-ও কি জাহাজের সেই রকম ছোট বোটকে ভালবাসা,—আদর করিয়া মাথায় রাখা, না, এ প্রীতির ভিতর অপর কথা কিছু ছাপা আছে?

কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দেখিলাম কি, এক-খানি 'জলি-বোট' যেন নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে আমার

ও তাহার মধ্যের ব্যবধান টুকু বিলুপ্ত হইয়া গেল। এ সংসারে সে ও আমি ছাড়া যেন আর কিছুই রহিল না। অমনি সেই কাঠের কঠোর মূর্ত্তি ভেদ করিয়া তাহার এক সৌম্য হাস্য-প্রফুল্ল-মূর্ত্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সে আমাকে পরম আত্মীয়ের মত কত-কি কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আর আমি অবাক্ হইয়া তাহার সেই কথা শুনিতে লাগিলাম।

সে প্রথমেই খল্ খল্ করিয়া এক গাল হাসি হাসিয়া সুমিষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিল,—হাঁ ভাই, তুমি আমাদের কথা ভাবিতেছিলে, কেমন কি না? তা তোমায় সকল কথা বলি শুন,—এই ছাখ, আমাদের নাম 'জলি-বোট'। আমরা নাকি ভারি 'জলি' (Jolly),—ভারি আমুদে, বিষাদ কাহাকে বলে জানি না, তাই আমাদের নাম 'জলি বোট'। 'জলি' না হইলে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমরা কি কখনও বড় জাহাজের সঙ্গে বাঁধা পড়িয়া সমান চালে সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গগুলি ভেদ করিয়া চলিতে পারিতাম? বিশেষত আমাদের মত যাহারা ক্ষুদ্র, বড়র মন যোগাইয়া যাহাদিগকে চলিতে হয়, তাহাদের ভিতরে যাহাই থাকুক, বাহিরে—'জলি' না হইলে চলিবে কেন? ছাখ ভাই, প্রাণের কথা তোমায় বলিতে কি, আমরা বড় দরিদ্র, আমাদের ঘর-দরজা চাল-চুলা কিছুই নাই, সকল কষ্টই আমাদের একচেটিয়া। ঝড়, জল, শীত, রৌদ্র সমান ভাবেই আমাদিগকে সহিতে হয়। তবে এই ক্লেশের সহনটা আমাদের একরূপ তপস্যাবিশেষ। ভাগবতে বোধ হয় দেখিয়া থাকিবে,—

"দরিদ্রো নিরহংস্তব্ধো মুক্তঃ সর্ব্বমদৈরিহ।
কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াপ্নোতি তদ্ধি তস্য পরং তপঃ॥" (১০।১০।১৫)

এই তপস্যার জোরেই আমাদের এত সহিষ্ণুতা এত নিরভিমানিতা এবং এত বিষাদবিহীনতা। আর এই তপস্যার প্রভাবেই আমাদের কিছু কিছু পরচিত্তাভিজ্ঞতাও আছে। এই ছাখ, তোমারই মনের

কথা বলিয়া দিই,—তুমি ভাবিতেছিলে না,—এই বড় বড় জাহাজগুলা আমাদের মাথায় ধরিয়া রাখে কেন? কেমন ঠিক কি না?

আমি আর বলিব কি, তাহার কথা শুনিয়া আমার তখন সকল কথা লোপ পাইয়া গিয়াছে। তাই ঘাড় নাড়িয়া তাহাকে বলিলাম,—'হাঁ'। সে বলিল,—আচ্ছা তবে তোমার মনের কথার জবাবটাও দিয়া দিই, শুন। এই ত্থাখ, এটা হইতেছে আমাদের মহৎসেবার অব্যভিচারি ফল। সাধে কি আর নীতিশাস্ত্রকারেরা বলেন—"কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ"? আমরা মহতের আনুগত্য করিয়া থাকি বলিয়াই আমাদের এতটা সৌভাগ্য। তুমি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রের মত থাকিয়া মহতের সেবা করিয়া যাও; মহৎ ব্যক্তি তোমায় মাথায় করিয়া রাখিবেন—ইহা সুনিশ্চিত। জাহাজ যে কত মহান্ কি বলিব। কেবল আকারে মহান্ নয়, প্রকারেও তাহার মহত্ত্ব পরিস্ফুট। তুমি তো কেবল জাহাজের উপরটাই দেখিতেছ, ভিতর তো কখনও দেখ নাই? দেখিলে দেখিতে পাইতে, তাহার ভিতরে কত আগুন দাউদাউ জ্বলিতেছে,—কত লোকের কত ভার তাহার অন্তরে বিন্যস্ত। তুমি তো এই ভাগীরথীব স্থির নীরে তাহাকে দেখিতেছ, সমুদ্রের তরঙ্গসঙ্কুল লবণাম্বু মধ্যে তাহার শোচনীয় অবস্থা দেখিলে বুঝিতে পারিতে—পরের পারাবারের জন্য তাহাকে কত ক্লেশ কত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়। ইহাতেই তাহার মহত্ত্ব অভিব্যক্ত। কিন্তু তোমরা ওই যে ষ্টীম্লঞ্চ গুলি দেখিতে পাও, ফোতো বাবুর মত কেবল এদিকে ওদিকে ফুক্কুড়ি করিয়া বেড়ায়, উহাদের না পাঁচ জনকে আশ্রয় দিবার ক্ষমতা আছে, না তাহাদের মালামাল লইবার যোগ্যতা আছে। উহারা পুঁটীমাছের মত অল্পজলেই খিল্‌খিল্ করিয়া খেলিয়া বেড়ায়, সমুদ্রের ত্রিসীমা মাড়াইতে পারে না। আমরা তাহাদেরও আশ্রয় লইয়া দেখিয়াছি, উহাদের যতই না কেন মন যোগাইয়া চল, তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না।

তোমায় কেবল তাহার পাছু পাছু উমেদারী করিতে করিতেই জীবনান্ত করিতে হইবে। ওটা হ'চ্ছে সেই নীতিকারের 'হীনসেবা', কাজেকাজেই ওটা 'ন কর্ত্তব্যা।' বুঝলে ভাই! বুঝলে?

আর ভাই! ওই যে বড় বড় বোট্গুলি দেখিতেছ, ওরা হইতেছে—'গাধাবোট্'। ওরা নামেও যা—কাজেও তা; কেবল গাধার মত মোট বহিতেই মজবুত। ওদের দ্বারা ছোট আমাদের কোন উপকারই হইবার নয়। ওরা আপনার গরবে আপনি ফাটিয়া মরে। কোন কোন আফিসের ভুঁড়িওলা বড়বাবুর মত বা কোন কোন নাদাপেটা জমিদারের মত ভারি ভারিক্কে মেজাজ। চাল-চলন যেন নবাবের নাতি। তুমি তাহার পার্শ্বে ডুবিয়া মরিলেও তাহার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। বরং ধাক্কা দিয়াই চলিয়া যাইবে। তোমাদের কোন কোন বড় বাবু বা জমিদার বাবুদেরও ধরণ ওইরূপ নয় কি? তুমি তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে অন্নাভাবে অবসন্ন হও,—ঔষধ এবং পথ্যের অভাবে মরিয়া যাও, তবুও তিনি তোমার পানে তাকাইয়া দেখিবেন না। তিনি যাহা করিতে আসিয়াছেন, একটুকুও চাল না বিগড়াইয়া তাহাই করিয়া যাইবেন,—টাকার ছালা বহিতে আসিয়াছেন তাহাই বহিয়া যাইবেন। ঠিক কি না? অ্যাথ ভাই, গর্দ্দভের একমাত্র সুখ হইতেছে গর্দ্দভীর পদ তাড়নে, ইঁহাদেরও তাহাই। তবে এই গর্দ্দভীর পদবীটা তাঁহাদের ঘরের লক্ষ্মীদের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না; বাহিরের লক্ষ্মীরাই ওটা অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন। আর আমাদের গাধাবোট্গুলিরও সুখ বোধ হয় কেবল ওই নৌকাটৌকার লগীর ঠেলায়। তা উহাতে উহাদের গর্দ্দভীর পদতাড়নবৎ সুখ হয় কিনা, হলপ করিয়া বলিতে পারি না। ফল, উহাদের ওই বেচাল দেখিয়া আমরা উহাদিগকে দূর হইতেই দণ্ডবৎ করি, জাহাজও তাহাদের উপর তেমন রাজি নয়। বুঝলে ভাই! বুঝলে?

হয় ত ভাই! তুমি বলিবে যে—"জাহাজ গরজে পড়িয়াই তোমাদের মাথায় করিয়া রাখিয়া থাকে, উহাতে উহার মহত্বের লেশ মাত্রও নাই। যে যতই বড় হউক না কেন, গরজের দায়ে সকলকেই ছোট লোকের খোসামোদ করিতে হয়। তোমরা না থাকিলে জাহাজের অনেক কর্ম্ম অচল হয়,—অল্প জলের কোন কর্ম্মই সম্পন্ন হইয়া উঠে না, তাই জাহাজের কাছে তোমাদের এত আদর। বিশেষত যেদিন দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়া জাহাজকে বিষম বিপন্ন হইতে হয়, এমন কি তাহার আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে, সেদিন তোমরাই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাক। তাই ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় তাহাকে তোমাদের আদর করিতেই হয়—মাথায় করিয়া রাখিতেই হয়।" তুমি বলিতে হয় বল, আমি কিন্তু ঐ কথাটা ষোল আনাই মানিতে চাহি না। কেন,—তাহাও বলি।

ত্মাখ ভাই! ভগবান্ সর্ব্বাশ্চর্য্যময়। তাঁহার এই বিশ্ব-সংসার আশ্চর্য্যেরই বিলাসভূমি! তাঁহার রাজ্যটা আগাগোড়াই আশ্চর্য্যে ভরা। এখানকার কাণ্ডকারখানা স্থূলদৃষ্টিতে দেখিয়া কিছুই বুঝিবার নয়। এখানে কিসে যে কি হয়, কাহার সহিত কাহার কিসের সম্বন্ধ, কি প্রয়োজনেই বা কাহার সৃষ্টি, এসকল কথা বুঝিয়া উঠা বড় যার-তার কার্য্য নয়। যে বুঝে, সে আবার ইহাই বুঝে যে, ইহার কিছুই বুঝা গেল না,—এ প্রহেলিকার প্রত্যুত্তর নিরূপণ করিতেই পারা গেল না। সে কেবল তন্ময় হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে, আর মনে-মনে বলে,—কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

ত্মাখ ভাই! এ জগতের রহস্য যে-দৃষ্টিতে দেখিতে হয়, সেই দৃষ্টিতে দেখিতে পারতো দেখিতে পাইবে যে, এখানে আলোককে ফুটাইবার জন্যই অন্ধকারের সৃষ্টি, ভালকে ফুটাইবার জন্যই মন্দের সৃষ্টি, আর মহৎকে ফুটাইবার জন্যই ক্ষুদ্রের সৃষ্টি। বড়র যে ছোটকে দরকার,

সেটা সেই স্রষ্টারই সৃষ্টি-কৌশল। তিনি ছোট দিয়াই বড়কে বুঝাইয়া থাকেন;—যে কাহাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখে না, ছোটকেও মাথায় করিয়া রাখে, সে-ই বড়—সে-ই মহৎ।

ছাখ ভাই, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র—অমরবৃন্দের প্রার্থনায় যিনি এখানে অবতীর্ণ, প্রভাবে যাঁহার সমান বা অধিক কেহই নাই, শত্রু সংহার কার্য্যে তাঁহার বনের বানরের সহায়তায় কিছু প্রয়োজন ছিল কি? তাই ভাগবত বলেন,—

"নেদং যশো রঘুপতেঃ সুরযাচ্ঞয়াত্ত-
লীলাতনোরধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ।
রক্ষোবধো জলধিবন্ধনমস্ত্রপূগৈঃ
কিং তস্য শত্রুহননে কপয়ঃ সহায়াঃ॥" (৯।১১।২০)

তবে, লীলাময়ের এ লীলা কেন? তিনি কেবল লীলা করিয়া ইহাই দেখাইলেন যে, এ সংসারে ক্ষুদ্র বলিয়া কাহাকেও উপেক্ষা বা অনাদর করিতে নাই; হউক না কেন বনের বানর, সে-ও তোমার আদরের সামগ্রী। কিন্তু হায়, তাঁহার এ অমূল্য উপদেশ শুনে কে? তোমরা এখন অভিমানেই আত্মহারা,—"আমি বড়, আমার কাছে আর সকলেই ছোট" এইটুকু প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত সকলেই বদ্ধপরিকর। বনের পশুকে ভালবাসা দূরে থাকুক, আপনাকে বড় করিতে গিয়া তোমরা এখন ঘরশুদ্ধ পর করিয়া ফেলিতেছ। শৌচ-সদাচারের সঙ্গে খোঁজ নাই, আহারের শুদ্ধাশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য নাই, সৎ-শিক্ষা সৎ-অনুষ্ঠানও নাই, কেবল রাজ্য জুড়ে হাম-বড়াইয়ের ঢাক পিটিলে কিছু হয় কি ভাই? ঐ বৃথা বড়াই-ই তোমাদের দিন-দিন দীন ও শ্রীহীন করিয়া ফেলিতেছে, তাহা তো তোমরা ভাব না।

ছাখ ভাই! তৃণের অপেক্ষা নীচ তো কিছুই নাই, কিন্তু সেই মহতো-

মহীয়ান্ ভগবান্ তাহা মাথায় ধরিয়া তোমাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করেন কেন, তাহা জান কি? তিনি তোমাদের ঐ দূর্ব্বার অর্ঘ্য শীর্ষে রাখিয়া শিখাইয়া দেন যে, জগতে তুচ্ছ বলিবার কিছুই নাই, সকলই তোমাদের আদর করিবার সামগ্রী। এই শিক্ষা তোমরা মান না, ক্ষুদ্রের আদরও কর না, তাই তোমরা সকলের সহানুভূতি হারাইয়া কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া পড়িতেছ।

ছাখ ভাই! তোমরা সেই প্রেমদাতা পরম-দয়াল নিতাই-গৌরের কথা তো শুনিয়াছ। দেশের দেবতা তাঁহারা, তাঁহাদের কথা না শুনিবেই বা কেন? তাঁরা দু-ভাই যে দীন-হীন-কাঙ্গালের বেশে দেশেদেশে গিয়া, —উচ্চ-নীচ-নির্ব্বিচারে যারে-তারে কোল দিয়া প্রেম-নাম বিতরণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের সে আদর্শও কি তোমাদের একবারও মনে হয় না? অহো! গৌরহরির সেই চিত্তহারী কথা,—তাঁহার সেই সনাতন গোস্বামীর প্রতি ক্ষুদ্রপ্রীতির অমৃতসিক্ত কথা মনে পড়ে, আর উন্মত্ত করিয়া দেয়,—

"কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে যাইলে তাদের করিও যতন॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

হায় হায়, প্রভুর এ প্রেমের বাণী না-জানি আর কোন্ রাজ্যে বিচরণ করিতেছে? অভিমানের বশে—এ সকল অমূল্য উপদেশ তোমরা ভুলিতে বসিয়াছ—কেমন করিয়া যে বড় হইতে হয়, তাহার পথপর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছ। "বড় হবি তো ছোট হ"—এই মহাজনবাণী এখন আর তোমাদের কর্ণে স্থান পায় না,—তাহার উচ্চ ভাবও তোমরা ভাবনায় আনিতে পারো না। তোমরা কেবল খুঁড়াইয়াই বড় হইতে চাও! তাহা কি কখনও হয় ভাই? তোমার ভগবানই কি, আর আমাদের আশ্রয়দাতা জাহাজই বা কি, যেখানে যত বড় দেখিবে, ক্ষুদ্রকে

আদর করিয়াই সকলে বড়,—ক্ষুদ্রের কাছে আপনাকে অধিকতর ক্ষুদ্র করিয়াই সকলে বড়। তাই আজ জাহাজের কাছে ক্ষুদ্র আমাদেরও এত আদর। তা বলিয়া মহান্ কখনও ক্ষুদ্র হইয়া যান না, বরং তাহাতে তাঁহার মহিমোজ্জ্বল মূর্ত্তিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র—যে ক্ষুদ্র সেই ক্ষুদ্রই থাকিয়া যায়। এই ছ্যাখ না কেন, জাহাজ আমাদের মাথায় করিয়া রাখিলেও আমরা যে ক্ষুদ্র সেই ক্ষুদ্রই আছি, আর জাহাজ যে মহান্ সেই মহান্ই আছেন। বুঝলে ভাই বুঝলে? জাহাজের এ ভালবাসা গরজের নয়,—স্বভাবের।

এই বলিয়া সে আমার গায়ে একটি প্রীতিমাখা ধাক্কা মারিল। আমি যেন কেমন চমক-ভাঙ্গা হইয়া চলিয়া পড়িলাম। চাহিয়া দেখি, যেখানকার জাহাজ যেখানকার জলিবোট সেইখানেই রহিয়াছে। জলি-বোটের কথার চোট কিন্তু থামিয়া গিয়াছে, চেতন ভাব চলিয়া গিয়াছে! এত লোকের সম্মুখে বসিয়া বসিয়া পড়িয়া গেলাম, হয়তো কেহ কিছু মনে করিল, ভাবিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখি,—অদূরে রাম-শ্যামের কথা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমার রোগের কস্তুরটুকু তখনও মরে নাই। তবুও তাহাদের কথা শুনিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না। মাতালের মত টলিতে টলিতে তাহাদের কাছে গিয়া বসিয়া পড়িলাম।

[বঙ্গবাসী; ২৮শে মাঘ; ১৩১৭ সাল।]

বয়া।

গঙ্গাতীরে যাওয়া তো আমার একটা রোগ, তার উপর রাম-শ্যামের তত্ত্বকথা শুনিবারও ঝোঁকটা আছে, তাই মাঝেমাঝে না যাইয়া থাকিতে পারি না। সেদিন সন্ধ্যাসমাগমের সামান্যক্ষণ পূর্ব্বে পতিতপাবনীর পবিত্র তীরে যাইয়া বসিয়া আছি। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। চারিদিকে বৈদ্যুতিক আলোকগুলি দপ্ দপ্ জ্বলিয়া উঠিল। সেই, আলোকের প্রতিবিম্বগুলি লইয়া জাহ্নবীর বীচিমালা সুন্দর খেলা জুড়িয়া দিল। কখনও মনে হইতে লাগিল,—তরঙ্গরা যেন রঙ্গভরে আলোকগুলি লইয়া লোফালুফি করিতেছে। কখনও বা মনে হইতে লাগিল,—তরঙ্গগুলা যেন দলে দলে আলোকগুলিকে লইয়া জলের ভিতর লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, আর আলোকগুলিও তাহাদের হাত ছাড়াইয়া পলাইবার প্রয়াস পাইতেছে। আবার এমনও কখনও মনে হইতে লাগিল,—যেন লাখেলাখে আলোকের পোকা ঝাঁক বাঁধিয়া জলের উপর ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। দেখিয়া ভারি আনন্দ হইল। অবাক হইয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম। মুখে কথা নাই বটে, কিন্তু প্রাণে যে কত কথাই জাগিয়া উঠিল, তাহা আর কি বলিব?

কতক্ষণ জানি না, জল ও আলোকের খেলা দেখিতে দেখিতে আমার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেই সাবেক রোগটাও চাগাইয়া উঠিল। তখন আমার কাছে সকলই চেতন,—সেই জল চেতন, আলোক চেতন, জলের উপর জাহাজ-টাহাজ যাহা কিছু, সমস্তই চেতন। আমি যেন তখন সকল ইন্দ্রিয়ের উপর কোন অতীন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয়ের শক্তি লাভ করিয়াছি। আমি যেন তখন এ রাজ্যে রহিয়াও আগাগোড়া এ রাজ্যছাড়া হইয়া গিয়াছি।

আর যায় কোথা, আমার এই রোগে ধরাও যা, অমনি আমার সহিত কথা কহিবার নিমিত্ত সকলেরই :মুখ চুল্‌বুল্ করিয়া উঠিল। কাহাকে রাখিয়া কাহার কথাই বা শুনি? হঠাৎ একটা ভারি গম্ভীর স্বর আমাকে তাহার দিকে টানিয়া লইয়া গেল। চাহিয়া দেখি,—তিনি আর কেহ নহেন,—বয়া মহাশয়। তাঁহার ভাবখানা যেন অভিমান মাখা,—যেন কিছু রাগরাগ।

কারণ তো জানি না, তাই তাঁহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া শ্রীমুখের কথাই শুনিতে লাগিলাম। শ্রীমুখ বলিতেছি বটে, কিন্তু তাঁহার যে শ্রীমূর্ত্তি, তাহার সবটাই পেট, মুখখানা কোথায়, খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। তবে নাকি মুখ না হইলে কথা কহা হয় না, আর তাঁহার কথাও যখন কাণে আসিতেছে, তখন তাঁহার 'শ্রীমুখের কথা' না বলিয়া আর বলিই বা কি?

বয়া মহাশয় অনেক কথাই বলিলেন। কথার মোদ্দাখানা হইতেছে,—আমি এতদিন ভাগীরথীর তীরে আসিয়া বসিয়া থাকি, কত-কির পানে চাহিয়াও দেখি, কিন্তু তাঁহার পানে একটি দিনও নাকি তাকাই নাই। শুধু তাই নয়, তিনি নাকি আমার জন্য অনেক অমূল্য উপদেশ তাঁহার জমা হইতে খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন, আর আমি তাহার একটীও কাণে তুলি নাই।

হইতেও পারে। এক একটা লোক থাকে,—ঘাড়ে-গর্দ্দানে এক। তাদের কথা বড় সহজে বুঝিতে পারা যায় না। বয়া মহাশয়ও তো তাই-ই; তাই তিনি বলিলেও আমি তাহা শুনিতে পাই নাই। যাহা হউক, আমি তাঁহার কাছে আমার ত্রুটি জানাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা

করিলাম, তিনিও প্রসন্নমনে আমার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ কত কি কথাবার্ত্তার পর আমি তাঁহাকে বলিলাম,—দেখুন, আপনি কথা কহিতেছেন বটে, কিন্তু আপনার মুখখানি না দেখিতে পাওয়ায় আমার কিছুই সুখ হইতেছে না। যদি অনুগ্রহ করিয়া মুখখানি দেখান, ভারি সুখী হইব।

• তিনি আমার কথা শুনিয়া একচোট খুব হাসিয়া লইলেন। অবশ্য হাসির আওয়াজ ধরিয়াই এ কথাটা বলিতেছি। সেই হাস্যের রোলে তরঙ্গরাও যেন হাস্যমুখরিত হইয়া উঠিল। তারপর তিনি গম্ভীর ভাবে আমাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—দেখ, আমি মানুষ বড় ভাল বাসি। আমার ভারি সাধ, সকলে আমার কাছে আসে,—কথা শুনে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমি চক্ষের সম্মুখে থাকিলেও আমায় বড় কেহ দেখে না,—আমার কথাও কেহ কাণে মাখে না। যাহারা আমার আহ্বানবাণী শুনিতে পায়, বা আমাকে যথার্থ দেখিতে পায়, তাহারা দেখে,—আমার হাত-মুখ বলিয়া একটা বিশেষ কোন কথা নাই। আমার সকল অঙ্গেই সকল অঙ্গের সমস্ত শক্তি বর্ত্তমান। তাই আমি আমার শরীরের যে-কোন স্থান দিয়া যে-কোন ইন্দ্রিয়ের যে-কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি। বলিতে গেলে,—আমার সকল অঙ্গই হাত-পা, সকল অঙ্গই পিঠ-পেট, সকল অঙ্গই চোখ-মুখ। এক কথায়—সকল শরীরটাই আমার এক ধাতুতে গঠিত,—সকল শরীরটাই আমার সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত। বুঝ্‌লে কি?

আমি বলিলাম,—না মহাশয়! আপনি হইতেছেন বয়া, আর পরিচয়টা দিতেছেন ভগবানের মত। ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে ভগবানেরই ঐরূপ পরিচয় দেখিয়াছি।

"অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি সদা জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

(৫ম অধ্যায়, ৪ শ্লোক)

বয়া বলিলেন,—হাঁ, কতকটা তাই-ই বটে। ভগবান্ না হইলেও আমার ধাত-ধরণটা ঐ ভগবানেরই মতন বটে। তাঁহার সহিত আমার অনেক বিষয়েই মিল পাইবে। দিবা রাত্রি তাঁহারই তপস্যা করিয়া আমি তাঁহারই শক্তি অধিকার করিয়া বসিয়াছি। আমার তপস্যাও তো কম নয়,—জল-ঝড় বাছি না, রৌদ্র-হিম বিচার করি না, একই স্থানে একই আসনে তাঁহাতে উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছি। বাহিরে আমার উপর কত লোকের কত উপদ্রব,—ছেলেরা সব খেলার ঝোঁকে আমার উপর উঠিয়া জলে লাফাইয়া পড়ে, মাঝিরা সব অবিশ্রান্ত লগীর গুঁতা মারে, পদপ্রহার করে; তাহার উপর তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত তো চলিতেছেই, আমি কিন্তু অকাতরেই তাহা সহিয়া থাকি। প্রভঞ্জনের গর্জ্জনে আমার ভয় হয় না,—বাত্যাবিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গগুলি দেখিয়া চিত্তক্ষোভ হয় না, যেখানে আছি, সেখান ছাড়িয়া পলাইতেও প্রবৃত্তি হয় না। আমার বাহিরটাই তোমরা দেখিয়া থাক, ভিতরটা বোধ হয় দেখ নাই। দেখিলে দেখিতে পাইতে,—সে জায়গায় আমি বাহিরের কিছুই যাইতে দিই নাই; সেই "আকাশবৎ সর্ব্বগত নিত্য" বস্তুতেই আমি সেই অবকাশটুকু পূরাইয়া রাখিয়াছি। শুধু তাই নয়, যাহারা আমার উপর অত্যাচার উপদ্রব করে, আমি তাহাদের ইষ্ট বই অনিষ্ট করি না। দেখ, ঐ দুরন্ত বালকগুলি তো আমার উপর এত লাফালাফি করে, কিন্তু তারা যখন অসামাল হইয়া অসহায় অবস্থায় ভাসিয়া যায়, কিংবা ডুবিতে বসে, আমিই তখন তাহা-

দিগকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করি। ঐ যে নৌকা বা বোটের মাঝিগুলা লগীর ঠেলায় লাথীর গুঁতায় আমায় ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলে, তাহাদেরও আমি বিপৎকালে আশ্রয় দিয়া থাকি। দেখ, কাক-টাক পাখীগুলা আমার উপর বসিয়া কত অমেধ্য বস্তু লইয়া আহার করে,—কত মলমূত্র পরিত্যাগ করে, কিন্তু আমি একটি দিনও তাহাদের তাড়াইয়া দিই না, কিংবা আবার বসিতে নিষেধও করি না। এত সহ্যগুণ না থাকিলে কি আর সেই ভগবানের কৃপা অধিকার করিতে পারা যায়? এই সহিষ্ণুতাই আমার পরম তপস্যা, আর এই তপস্যার ফলেই আমার ভগবৎ-শক্তিতে সম্পন্ন হওয়া। ব্যাপারখানা বুঝলে?

তাঁহার কথা শুনিয়াই তো আমার তাক্ লাগিয়া গিয়াছে; আমি আর বলিব কি? ঘাড় নাড়িয়া তাঁহার কথায় সায় দিলাম মাত্র। তিনিও আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন। স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন,—দেখ, সেই অনন্তশক্তিশালী ভগবান্‌ও তোমাদের জন্য আমারই মত এত নির্য্যাতন সহিয়া থাকেন। তোমরা যে তাঁহার উপর কত উপদ্রব কত অত্যাচার করিয়া থাক, তাহা তোমরা জান না, কিন্তু তিনি তাহা সমস্তই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিয়া তোমাদের কল্যাণের কামনাই করিয়া থাকেন। তোমরা পশু নও পক্ষী নও, কীট নও পতঙ্গ নও, বৃক্ষ নও পর্ব্বত নও, তোমরা তাঁহার সাধের সৃষ্ট মানব। তোমাদেরই একমাত্র তাঁহার কাছে যাইবার অধিকার। তাই তিনি যখন-তখন সম্পদের ভিতর দিয়া, বিপদের ভিতর দিয়া,—রোগশোক সুখ-দুঃখ সকলের ভিতর দিয়া, নানা প্রকারে তোমা-দিগকে তাঁহার কাছে যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু তোমরা তাহা শুনিয়াও শুন না। তাঁহার কথা দূরে থাকুক্, এই যে আমি এতদিন তোমাকে ডাকিতেছিলাম, তুমি কি তাহা কাণে তুলিয়াছিলে? হয় তো বলিবে,—তরঙ্গের কোলাহলে তাহা শুনিতে পাও নাই? অনেকটা তা-ই

বটে; কিন্তু কোলাহল কাটাইয়া কথা শুনিবার কাণও তো তৈয়ারি করা চাই। তাঁহার কথা শুনিবারও ব্যাঘাত ঐ তরঙ্গেরই কোলাহল বটে। আমি না হয় এ নদীতে থাকিয়া তোমাদিগকে ডাকিতেছি,—আমার এই শিক্ষা শুনিবার জন্য আমার প্রতি উন্মুখ করিতে চেষ্টা করিতেছি, আর তিনি না হয়—তোমরা যে নদীতে পড়িয়া আছ, সেই ভবনদীর পারে রহিয়া—কখনও বা ভিতরেও আসিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। ভবনদীর তরঙ্গও ভীষণ,—সংখ্যায় ছয়টী হইলেও ভীষণ। তাহাদের নাম বোধ হয় জানাই আছে,—"শোক-মোহৌ জরামৃত্যু ক্ষুৎপিপাসে যড়ূর্ম্ময়ঃ।" এই শোক বা মোহ, জরা বা মৃত্যু, আর ক্ষুধা বা পিপাসা,—ইহা লইয়াই তো তোমরা অস্থির, এই ছয়টা তরঙ্গে পড়িয়াই তো তোমরা হাবুডুবু খাইতেছ, তা তোমরা তাঁহার কথা শুনিতে পাইবে, বা তাঁহার প্রতি উন্মুখ হইতে পারিবে কোথা হইতে? কিন্তু তোমরা না শুন, তিনি এতই দয়াময় যে, তিনি তাঁহার কথা তোমাদের না শুনাইয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না। প্রথম, সম্পদের মধ্যেই তিনি তাঁহার বাণী শুনাইতে চেষ্টা করিবেন, তাহাতে শুনিতে না পাও, বিপদের কাণ দিয়া তিনি তাঁহার কথা তোমাদের শুনাইবেনই শুনাইবেন। দেহের গরবে আত্মীয়ের গরবে তুমি আত্মহারা হইয়া থাক তো তিনি রোগ দিয়া আত্মীয় বিয়োগ দিয়া তোমাকে তাঁহার প্রতি উন্মুখ করিবেনই করিবেন।

দেখ, তিনি প্রকৃতির অতীত, আর আমি প্রকৃতির উপাদানে গঠিত। তাঁহার বন্ধন নাই, আমার বন্ধন আছে। তাঁহাতে আমাতে এতটা তফাৎ। তথাপি তাঁহার কৃপাশক্তি পাইয়া আমার এমন একটা ক্ষমতা জন্মিয়াছে যে, আমি নিজে বন্ধনগ্রস্ত হইয়াও—বন্ধনের ক্লেশ জানিয়া-শুনিয়াও আবার নানা বিপন্নজনের বন্ধন সাধ করিয়াই সহিয়া থাকি। তবে কি জান, আমার ভিতরটায় নাকি ভগবান্ ছাড়া আর কিছুই নাই,

তাই ঐ বন্ধন-টন্ধনগুলা আমার অনুসন্ধানেই আসে না। তোমরাও যদি আমার মত ভগবানের আরাধনারূপ মহা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে পার তো তোমরাও আমারই মত জাগতিক উপদ্রব-অত্যাচার সহ্য করিয়াও,—শতশত বিপন্ন জনের বন্ধন গলায় পরিয়াও, আপন বন্ধনের অনুসন্ধানরহিত হইয়া আমারই মত পরমানন্দ অনুভব করিতে পারিবে। আর একটা কথা তোমায় বলি। আমরা হইতেছি—বয়াজাতি। ঐ যে জাহাজে-জাহাজে ষ্টীমারে-ষ্টীমারে কিংবা পোর্টে-পোর্টে ডম্বল কিংবা চক্রের আকারের বয়াগুলি দেখিতে পাও, উহারা হইতেছে—লাইফ-বয়া। আর ঐ যে পোল কিংবা জেটীর নিম্নে ছোট বড় নানা আকারের বয়া দেখিতে পাও,—উহারাও আমাদের জ্ঞাতি-বয়া। সকলেই আমরা সমান সাধক,—সকলেই আমরা আহার নিদ্রা ছাড়িয়া ভগবদ্ভজন করিয়া থাকি, আর জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই কল্যাণ করিয়া থাকি। আহার যে একেবারেই কিছুই করি না, তা নয়। তবে তাহাতে আসক্তি নাই—তাহার জন্য চেষ্টাও নাই। দেহরক্ষার নিমিত্ত যেটুকু প্রয়োজন, ভগবান্‌ই তাহা জুটাইয়া দেন। আমরা প্রার্থনা না করিলেও ভগবানের প্রেরণায় কেহ-না-কেহ তাহা দিয়া যান,—একটু তেল-রং মাখাইয়া দেহরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া যান। যাহার যাহা দেহরক্ষক, তাহাই তাহার আহার। দেহরক্ষক বলিয়া ঐ তেল-রংই আমাদের খাদ্যসামগ্রী। না পাইলেও বিশেষ ক্লেশ নাই, অন্তরের আনন্দগুণে বাহিরের খোরাকের বড় প্রয়োজনই হয় না। ও অবস্থাতেও আমরা অপরের উপকার করিতে কাতর হই না।

তবে কি জান, শত্রুভাবেই হউক, আর মিত্রভাবেই হউক, আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করা চাই, নচেৎ আমরা কাহারও কিছুই করিতে পারি না। আশ্রয় না লইলে ভগবান্‌ও কিছুই করিতে পারেন না। এই কথাটুকুই তলাইয়া বুঝিবার। দেখ না কেন, তুমি আমাকে লগীরই গুঁতা মারো,

বা হাত দিয়াই আঁকড়াইয়া ধরো, আমার পক্ষে উভয়ই সমান,—আমি উভয়েরই কল্যাণ করিয়া, বিপদ্ মোচন করিয়া দিব। ভগবান্ও তাহাই করিয়া থাকেন। শত্রুভাবেই তাঁহাকে আশ্রয় করুক, আর মিত্রভাবেই আশ্রয় করুক, উভয়েরই তিনি কল্যাণ করিয়া থাকেন,—বিপদ্ মোচন করিয়া থাকেন। কিন্তু যে কোন ভাবেই হউক তাঁহাকে আশ্রয় করা চাই-ই চাই।—বুঝলে?

আমি আর কি বলিব,—তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে আমি তখন কেমন একতর হইয়া গিয়াছি। শরীরও তখন নিশ্চেষ্ট। আর ঘাড় নাড়িয়া অভিমতি জানাইবারও শক্তি নাই। এবার আমার অচেতন দেহের অচেতন দুই বিন্দু জল কিন্তু চেতনের কার্য্য করিল। সে-ই নয়নদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া দিল। তিনিও আমার ভাব দেখিয়া উল্লাস-ভরে আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি বলিলেন,—দেখ তোমাকে এ কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। তুমি গীতার এই শ্লোকটী বোধ হয় জানো,—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"

(৯ম অধ্যায়, ২৯ শ্লোক।)

এটী সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই উক্তি। তিনি বলিতেছেন,—দেখ অর্জ্জুন! আমি সর্ব্বভূতে সম,—আমার কেহ দ্বেষের পাত্রও নাই, প্রীতির পাত্রও নাই; কিন্তু যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করিয়া থাকে, তাহারা আমাতে—সুতরাং আমি সেই সকলেতে অবস্থান করি। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কথা,—আমি ঠিক যেখানকার সেই খানেই আছি, শত্রুর দিক্ হইতেও টলি না, মিত্রের দিকেও ঢলি না; কিন্তু যাহারা

আপনা হইতে আমাতে আসিয়া মিলিত হয়, তাহারা যেহেতু আমাতে, সুতরাং আমি তাহাদিগের সহিত মিলিত হই। ভাল,—তুমি ভগবান্‌কে একান্তভাবে আশ্রয় কর তো তিনি তোমাতে অবস্থিত হইবেন; তুমিও তাঁহার শক্তিতে সম্পন্ন হইয়া বিপদের জাল অতিক্রম করিতে পারিবে। কিন্তু তুমি তাঁহার দিকে না চলিলে তিনি আপনা হইতে তোমার দিকে চলিবেন না, ইহা নিশ্চিত। মনে কর, তুমি বড় তপনতাপে উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছ; গঙ্গার শীতল ধারা তোমার সম্মুখ দিয়াই প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু তুমি যদি তাহাতে আসিয়া অবগাহন করো, তবেই তো তোমার তাপের শান্তি হইবে? আর যদি তুমি তাহা না করিয়া, যে ব্যক্তি জাহ্নবীজলে স্নান করিয়া তাপ জুড়াইয়া চলিয়া গেল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ভাগীরথীকে পক্ষপাতী বলিয়া গালি দিতে থাক, তাহা হইলে দোষ হইবে কাহার? ভাগীরথী তোমারও দিকে নন তাহারও দিকে নন, যে তাঁহার আশ্রয় লইবে তাহারই তিনি পাপতাপ মোচন করিয়া দিবেন। ভগবান্‌ও এইরূপ। তুমি তাঁহাকে আশ্রয় করো, তিনি তোমার পাপতাপ দূর করিয়া দিবেন, ধূলা-মলা ঝাড়িয়া-মুছিয়া তোমায় কোলে তুলিয়া লইবেন। তা না করিয়া তাঁহাকে দূর হইতে নির্দ্দয় বা এক-চোখো বলিয়া গালি পাড়িলে কিছুই ফল ফলিবে না। ভগবানের কৃপায় আমাদেরও ঐ ভগবানের ধাত। পাঁচজন বিপন্ন আসিয়া আশ্রয় লইবে বলিয়াই আমরা মাথার উপর একটা মস্ত কড়া আবিষ্কার করিয়া রাখিয়াছি, জাহাজ হও নৌকা হও আর জেলেডিঙ্গীই হও, ছোট বড় মাঝারী যে আসিয়া আমাদিগকে আশ্রয় করিবে,—আমাদের সহিত আপনাকে একরজ্জুতে আবদ্ধ করিবে, আপনা হইতে কাহারও দিকে না চলিলেও আমরা তাহার দিকে চলিয়া থাকি। আর যে আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করে না, সে যত বড় জাহাজই বা অন্য কিছু হউক না কেন,

আমরা তাহার দিকে এক চুলও অগ্রসর হইনা,—সামর্থ্য থাকিলেও তাহার কোনপ্রকার সহায়তা করিতে প্রস্তুত হই না। আমাদের জ্ঞাতিভ্রাতা লাইফ-বয়াও তা-ই, আশ্রয় গ্রহণ না করিলে, সে "জীবন-রক্ষক" হইয়াও তোমার জীবন রক্ষা করিতে পারিবে না। অন্যান্য জ্ঞাতি বয়ারাও আশ্রিতকেই আশ্রয় দিয়া তাহাদের নানাবিধ কল্যাণ করিয়া থাকে। বয়া-জাতি আমরা প্রতিনিয়ত এই শিক্ষারই প্রচার করিয়া থাকি। উদ্দেশ্য,—যাহারা এই ত্রিপথগামিনীর ত্রিতাপ-হরণ তীরে আসিয়া বিচরণ করে, তাহারা আমাদের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া অচিরেই সেই রুচির-বরণ ভগবানের শরণ গ্রহণ করুক। তোমাকেও আমি এতদিন এই কথাই শুনাইয়া আসিতেছি, আজিও শুনাইলাম। শুনিলে বা বুঝিলে কি?

বয়া মহাশয়ের উপদেশের ভাষায় আমার মানসরাজ্যে এক নবীন ভাবের আবির্ভাব হইল। মনে হইতে লাগিল,—তাইতো, আমরা কেবল ভগবান্‌কেই দোষ দিই, পক্ষপাতী দয়ারহিত বলিয়া গালি দিই, কিন্তু কই তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া—তাঁহার সহিত আপনাকে মিলিত করিয়া, তাঁহাকে আমাতে মিলিত করিতে একটি দিনও যত্ন করি না? তিনি যখন ভগবান্, তখন তাঁহার তো সকলের কাছে সমান থাকাই চাই। শত্রু বলিয়া কাহারও কাছ হইতে চলিয়া যাওয়া, কিংবা মিত্র বলিয়া কাহারও গলা জড়াইয়া ধরা, কিছুতেই তাঁহার সাজে না। তা বলিয়া আমি কেন তাঁহার তফাতে থাকিয়া আপনাকে তাঁহা হইতে তফাৎ করিয়া ফেলি? হায় দীনবন্ধো! দয়া কর, আর যেন আমরা তোমায় ভুলিয়া না থাকি,—তোমাকে এক বুঝিতে আর বুঝিয়া না বসি; —আর করুণাময় তোমার শরণ লইয়া তোমার করুণারসে আপনাকে সরস করিতে পারি। সংসারের বড় জ্বালা প্রভু বড়ই জ্বালা।

অসামর্থ্যপ্রযুক্ত তাঁহার কথার প্রত্যুত্তর দিতে না পারিয়া আমি মনে মনে কত কি বলিতেছি, এমন সময় কেল্লা হইতে 'গড়াম্' করিয়া সাড়ে-নয়টার তোপ পড়িল। আমি চমকিয়া উঠিলাম, বাহিরেও আসিয়া পড়িলাম। আর সেখানে বসিয়া থাকা পোষাইল না। রাত্রি অধিক হইয়াছে ভাবিয়া গৃহগমনে উদ্যত হইলাম। বয়ামহাশয়ের উদ্দেশে এবং মা গঙ্গার উদ্দেশে একএকটা প্রণাম করিয়া শিক্ষার কথা ভাবিতে ভাবিতে গৃহের পথ ধরিলাম। সে দিন রামশ্যাম আসিয়াছিল কি না, তাহা আর জানিতেই পারি নাই।

[বঙ্গবাসী ; ২৩শে বৈশাখ ; ১৩১৮ সাল।]

ফুটবল।

বহুদিন পরে সেদিন গঙ্গাতীরে রাম-শ্যামের দেখা পাই। বৈকালে বাবুঘাটে গিয়া দেখি, পূরা মজলিস; অনেক বাবুভেয়ে এসেছেন, দুই চারি জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও বসিয়া আছেন। তত্ত্বকথা তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের কথা জানিনা, তখন কথা হইতেছিল কর্ম্মসূত্রের।

কিছুক্ষণ কথা হইতেহইতেই মাঠের দিক্ হইতে এক মহা হৈ চৈ রব উত্থিত হইল। সকলেই চকিতনয়নে চাহিয়া দেখেন, বাঁধভাঙ্গা বন্যাজলের মত অগণিত লোক তুমুল কোলাহলে সকল পথই পূর্ণ করিয়া ফেলি-তেছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য আমাদের একটু আগ্রহ হইল। দেখিতেদেখিতে কতকগুলি লোক আমাদের নিকটে আসিয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিতে-না-করিতে কয়েকটি বাঙ্গালী উল্লাসভরে বলিয়া উঠিলেন, —মোহনবাগান জিতিয়াছে, মোহনবাগান জিতিয়াছে।

যাঁহারা সেদিনকার ফুটবল খেলার লড়াইয়ের কথা জানিতেন, তাঁহারা অবশ্য বুঝিতে পারিলেন যে, আজিকার খেলার প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালী মোহনবাগান সম্প্রদায় সাহেব-সম্প্রদায়কে পরাস্ত করিয়া বিজয় লাভ করিয়াছেন, তাই তাঁহারা এই সমাচারে আনন্দিত হইলেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যে কয়েকজন সবে কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাঁহারা ওসব ব্যাপারের কিছুই জানেন না, তাই বিস্ময়ে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মোহনবাগান তো একটা বাগান-বাগিচা হইবে, সে আবার জিতিল কি প্রকারে?

তাঁহারা তাঁহাদের যে সহরবাসী আত্মীয়ের সহিত আসিয়াছিলেন,

তিনিও পণ্ডিত। তিনি তাঁহাদিগকে রহস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—মোহনবাগান জয়লাভ করিতে পারিবে না কেন? "কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ" বলিলে কি বুঝা যায়? কলিঙ্গদেশ সাহসিক,—অর্থাৎ কিনা কলিঙ্গদেশ-বাসী লোকগুলা সাহসিক। এখানেও সেই রকম অর্থ করিলেই হইল। মোহনবাগান জিতিয়াছে,—অর্থাৎ কি না মোহনবাগানের অধিবাসীর দল জয়লাভ করিয়াছে।

তাঁহারা হাস্যমুখে আত্মীয়ের কথা মানিয়া লইলেন এবং ফুটবল খেলা সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করিতে লাগিলেন। ফলে ফুটবলের কথায় রাম-শ্যামের তত্ত্বকথা চাপা পড়িয়া গেল। সে যে কত রকমের কত কথাই উঠিল, তাহা আর কি বলিব। নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

প্রথম একজন পণ্ডিত মহাশয় "ফুটবল" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,—ফুটবল বোধ হয় "স্ফুটবল" শব্দজাত। যে ক্রীড়ায় বলের পরিস্ফুট পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই বোধ হয় "ফুটবল" হইবে?

তাঁহার কথায় সায় দিয়া একজন রসিকতা করিয়া বলিলেন,—হাঁ মহাশয়! ঠিকই বলিয়াছেন; এই যেমন "ফুটকলাই"। স্ফুটিত কলাই—ফুটকলাই, আর স্ফুট বল—ফুটবল।

তাঁহার কথার প্রতিধ্বনিরূপে আর একজন বলিয়া উঠিলেন,—হাঁ হাঁ, আরও আছে, আরও আছে; এই যেমন—ফুট্‌ফুটে ছেলে, ফুটন্ত ফুল, ভাতের ফুট ধরা প্রভৃতি।

এ অর্থ টিঁকিল না, হাঁসির তোড়েই উড়িয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয়কে বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে,—ফুটবল শব্দটা ইংরেজী। "বল" হইতেছে,—এক প্রকার চর্ম্মনির্ম্মিত গোলক, 'ফুট' বা পা দিয়া ঐ বলটিকে আঘাত করিয়া খেলিতে হয় বলিয়া উহার নাম "ফুটবল"।

পণ্ডিত মহাশয় দার্শনিক, তিনি তাঁহার তর্কের কষ্টিপাথরে না ঘসিয়া অমনি-অমনি ফুটবলের অর্থটি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। রজত-কাঞ্চনাদি অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ তো তাঁহাদিগকে প্রায় বিনাতর্কে লইতে নাই, তাই এই তর্ক। এ তর্কের মধ্যেও রহস্য ছিল। তাহার একটু নমুনা দিই।

সর্ব্বাগ্রে কথাটা উঠিল,—চর্ম্মের গোলক কি গোলাকৃতি চর্ম্ম—চামড়ার চাকৃতি? ইহার উত্তরে তাঁহার আত্মীয় পণ্ডিতই বলিয়া উঠিলেন—না হে না, সেই সংস্কৃত হেঁয়ালিটা জান তো—"গুণস্যূতিসমৃদ্ধোঽপি পরপাদেন গচ্ছতি?" ইহাও অনেকটা সেই ধরণের।

হেঁয়ালির কথা শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে "কি মহাশয়! কি মহাশয়!" করিয়া ধরিয়া বসিলেন। তিনিও বলিলেন,—

"দন্তৈর্হীনঃ শিলাভক্ষী নির্জীবো বহুভাষকঃ।
গুণস্যূতিসমৃদ্ধোঽপি পরপাদেন গচ্ছতি

অর্থ জিজ্ঞাসা আর করিতে হইল না। তিনি নিজেই হেঁয়ালীর অর্থ ভাঙ্গিয়া দিলেন। বলিলেন,—দন্ত নাই কিন্তু শিলা ভক্ষণ করে, চেতনা নাই কিন্তু অনেক কথা বলে, আবার নানাগুণে সম্পন্ন হইয়াও পরের পায়ে গমন করে। ইহা হইল হেঁয়ালির বাহিরের অর্থ। ভিতরের অর্থ হইতেছে "গুণস্যূতিসমৃদ্ধ" এই শব্দের শ্লিষ্ট অর্থ লইয়া। গুণস্যূতিসমৃদ্ধ কি?—না, দড়ি দিয়া শিলাই করা। এখানে গুণ শব্দের অর্থ দড়ি। তাহা হইলেই হেঁয়ালির অর্থ হইয়া গেল,—(নালবাঁধানো) জুতা। জুতার দাঁত নাই, কিন্তু সে পাথর খাইয়া ফেলে, অর্থাৎ তাহার ঘর্ষণে পাথর ক্ষয় হইয়া যায়। পাদুকার মুখ নাই, কিন্তু সে অনেক কথা বলে। অর্থাৎ মস্-মস্ খট্-খট্ প্রভৃতি অনেক প্রকার আওয়াজ তাহার শুনিতে পাওয়া যায়। আর সে লোকের পায়েপায়েই চলাফেরা করিয়া থাকে। যে

নানাগুণে-গুণবান্, সে কিছু পরের পায়ে যাইতে পারে না,—কাহারও পদানত হইতে পারে না। তাই ওই "গুণস্যাতিসমৃদ্ধোঽপি পরপাদেন গচ্ছতি" অংশটুকুই এ হেঁয়ালির প্রাণ। আমার এখানকার কথা হইতেছে, —চামড়ার জুতা যেমন দড়ি দিয়া শিলাই করা, চামড়ার ফুটবলও তেমনিই দড়ি দিয়া শিলাই করা। সে-ও পায়ে-পায়ে যায়, এ-ও পায়ের আঘাতে চালিত হয়।

হেঁয়ালির পালা চুকিয়া গেল। আবার পণ্ডিত মহাশয় আপত্তি তুলিলেন,—ভাল, না হয় দড়ি দিয়াই চামড়া শিলাই করাই হইল, কিন্তু সে গোলকবৎ হইবে কি প্রকারে? ইহার ভিতরে তো কোন সামগ্রী থাকা চাই?

এ কথারও উত্তর প্রদত্ত হইল। একজন বলিলেন,—যন্ত্র সাহায্যে কিংবা মুখের সাহায্যে সেই শিলাই করা গোলাকৃতি চামড়ার থলির মধ্যে বায়ু পূরিয়া দিলেই সে বেশ নিটোল গোলাকৃতি পৃথিবীর মত হইয়া উঠে। তাহার পর তাহার বায়ু যাইবার পথটা বাঁধিয়া বন্ধ করিয়া দিলেই সে খেলার উপযুক্ত হইল।

এই কথার উপর আবার একজন পণ্ডিত টীপ্পনী কাটিলেন। বলিলেন,—'ফুটবল' তাহা হইলে সর্পের মত বায়ুভক্ষক বল? উত্তরে একজন প্রবীণ ব্যক্তি বলিলেন,—হাঁ, অনেকটা তাই বই কি, আজ ইহার কামড়ে অনেকেরই বেজায় জ্বালা ধরিয়াছে। অপর এক বৃদ্ধ তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—না মহাশয়, আপনার ব্যাখ্যাটা ঠিক হইল না, বরং বলুন যে,—বায়ুভোজী সর্পের মত ওই বায়ুভোজী ফুটবলের দূরেদূরেই ছেলেপুলেদের রাখা কর্ত্তব্য; নচেৎ ওর দংশনের জ্বালায় একদিন বাছাদের ছট্‌ফট্ করিতে হইবে। তাঁহার মতে মত দিয়া অন্য একব্যক্তি বলিলেন,—হাঁ মহাশয়! ঠিক বলিয়াছেন, ও-সব

খেলা ভারতের ধাতের বিপরীত খেলা, উহাতে রজোগুণেরই বৃদ্ধি করে। যাহা কিছু সত্ত্বগুণের উদ্দীপক, তাহাই হইল ভারতের উপযোগী। ফুটবল খেলায় হয়তো স্থূল শরীরের কিঞ্চিৎ উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু সে উন্নতি সাত্ত্বিক উন্নতি নহে; মানস উন্নতির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। কিন্তু ভারতের ঋষিগণের উদ্ভাবিত ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত আসন-মুদ্রাদিতে শারীর ও মানস উভয়বিধই সাত্ত্বিক উন্নতি লাভ হইয়া থাকে। আর এদেশের তাহাই উপযোগী। উহাতে মানুষকে মানুষই করে,—দেবতা করে, দেবতার দেবতা করে; কিন্তু পশু করে না। এদেশের অন্যবিধ ব্যায়ামাদিও যে সাত্ত্বিক শারীর-সমুন্নতির একান্ত উপযুক্ত, বিচক্ষণ মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। ভারত পশুবলের প্রত্যাশা করে না, আধ্যাত্মিক বলই তাহার সম্বল। এই অধ্যাত্ম বল কি ফুটবল খেলিয়া মিলিতে পারে? তাই আমার ওই খেলাগুলোকে সাপের মত ভয়ানক বলিয়াই মনে হয়। আমি অবশ্য ছেলেপুলেদের শুভানুধ্যায়ী,—ভারতের ছেলেদের ভারতের মত হইতে দেখিলেই সুখী। আজকালের ছেলে-পুলেরা কেহ কেহ একে-ওকে মেরে-ধোরে বাহাদুরী দেখায়,—পশুবল প্রকাশ কোরে আপনাকে শক্তিশালী বোলে জাহির করিতে যায়। দেখে শুনে আমার দুঃখ রাখিবার স্থান থাকে না। কেবলই মনে হয়, হায় বাছা! তুই না দেববাঞ্ছিত ভারতের অধিবাসী, তোর এ পশুভাব কেন?

এইরূপ আলোচনা এবং ইহার বাদ-প্রতিবাদ এক পালা খুবই হইয়া গেল। তারপর একজন মাঝখান থেকে একটা কথা তুলিলেন,—যা বলুন বা কহুন মহাশয়, কিন্তু ফুটবলের জন্মটা বড় দুঃখের জন্ম। আহা, বেচারার লাথি খেতেখেতেই জন্মটা কেটে যায়। যে "ফুটবল" নিয়ে ফুটবল খেলা, খেলায় জয় হইলে তাহাকে কেউ মেডেল দেয় না, শীল্ড

দেয় না, দেয় কিনা তাহাকে, যাহারা লাথিতে লাথিতে অস্থির করিয়া তুলে। বলিব আর কি, যার যেমন বরাত!

এ লোকটা বোধ হয় অফিমচী। কারণ তিনি কথাগুলি চক্ষু বুজিয়াই চিবাইয়া চিবাইয়া বলিতেছিলেন। তাঁহার কথারও প্রতিবাদ হইল। একজন বলিয়া উঠিলেন,—বলেন কি মহাশয়! শুধু লাথিই বা খাবে কেন, বুকেও তো চড়ে? দেখেন নাই কি, খেলা করিতে আসিবার সময় কিংবা খেলা করিয়া যাইবার সময় ছেলেরা তাহাকে বুকে করিয়া লইয়া যায়?

পূর্ব্ব-বক্তা চক্ষু বুজিয়া বুজিয়াই আবার বলিলেন,—তা যা হ'ক বাবা! হাজারগণ্ডা লাথি মেরে একবার মুখে চুমো খাওয়া পিরীতে আমি রাজি হইতে পারি না।

তাঁহার কথার ভঙ্গীতে সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। একজন পক্বশ্মশ্রু পক্ককেশ বৃদ্ধ সেইখানে বসিয়া ছিলেন, তাঁহার হাসির মাত্রাটা কিছু অধিক হইয়া পড়িল। তাঁহার হাসি থামিয়া গেলে সকলে তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন,—কই মহাশয়, আপনি তো কেবল হোহো করিয়া হাসিতেইছেন, কিছু বলিতেছেন না যে? আপনিই বা বাকি থাকেন কেন, যাহ'ক কিছু বোলে ফেলুন?

বৃদ্ধ বলিলেন,—বলিব কি বাবা. আমার ওই ফুটবল খেলা দেখিলে কত-কি পাগলামি মনে হয়, তাহা কি তোমাদের ভাল লাগিবে?

সকলে বলিলেন,—আপনি বলুন তো, ভালমন্দর কথা পরে বুঝা যাইবে এখন। এখানকার সকলের মধ্যে আপনি হইতেছেন অতি প্রাচীন, আপনার কথাটা না শুনিলেই বা চলিবে কেন?

বৃদ্ধ বলিলেন,—দেখ বাবা! এই ফুটবল খেলার উভয় পক্ষেই এগারজন করিয়া খেলোয়াড় থাকে,—কমও নয় বেশীও নয়। ইহাদের

দেখিয়াই আমার কেমন একটি ভাবের উদয় হয়। তোমরা বলিতে বলো তো আমি বলি। "আজ্ঞে খুব বলিবেন, খুব বলিবেন" বলিয়া চারিদিক্ হইতে অনুরোধের উপর অনুরোধ হইতে লাগিল। তিনিও একবার চক্ষু বুজিয়া কি যেন কি ভাবিয়া লইয়া,—কি যেন কি দেখিয়া লইয়া গম্ভীর ভাবে গম্ভীর স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি সকলের লোচনগুলিকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিল। কেবল সেই পূর্ব্ববক্তা—যিনি চক্ষু বুজিয়া ছিলেন, তিনি চক্ষু বুজিয়াই রহিলেন। কেবল মুখে বলিলেন,—বলুন বলুন, বলিবেন বই কি, বলুন বলুন।

বৃদ্ধ বলিলেন,—দেখ বাবা! আমাদের এই দেহটা হইতেছে একটা প্রকাণ্ড ফুটবল গ্রাউণ্ড। এই দেহ-জমিতে চব্বিশ ঘণ্টাই ফুটবল খেলা চলিতেছে। ইহার মধ্যেও ওই দুই দল খেলোয়াড় আছে। এক এক দলে গুণতিতেও এগার জন করিয়া আছে। এক দল অপর দলের বিপক্ষও বটে। বলও একটী বই দুইটী নয়।

আগে বাহিরের জমির ফুটবলখেলার মোদ্দাখানা বলি, তার পর দেহজমির খেলার সহিত রুজু রুজু মিলাইয়া দিব। কিন্তু তোমাদিগকে একটু মন দিয়া শুনিতে হইবে। প্রথম দেখ বাবা! দুই দল খেলোয়াড় বাদাবাদি করিয়া কাজটা করে কি?—তাহাদের খেলার শেষ উদ্দেশ্যটাই বা কি? যাহারা এ খেলা দেখিয়াছে, তাহারা সকলেই জানে যে, এক দল যদি বলটীকে লইয়া নিরূপিত গণ্ডীর বাহিরে চালাইতে চায়,— "গোল" করিতে যায়, অপর পক্ষ আসিয়া তাহাতে বাধা দিবেই দিবে। বলটিকে গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যাইতে এক পক্ষের যেমন চেষ্টা, গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যাইতে বাধা দেওয়াই তেমন অপর পক্ষের চেষ্টা; এ চেষ্টা মর্ম্মান্তিক চেষ্টা।

বলটিকে গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যাইতে পারিলেই এক পক্ষের জয়। সঙ্গে সঙ্গে অপর পক্ষের পরাজয়। ইহাই হইল এ খেলার মর্ম্ম কথা। এইবার দেহজমির খেলার কথাটা বলি। আমাদের এ দেহটা যে একটা জমি বিশেষ, তাহা আমার কল্পনার কথা নয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা। গীতা পাঠ করিলেই দেখিতে পাইবে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

"ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।"

(১৩।১)

এই শরীরক্ষেত্রে যে উভয় পক্ষে লড়াই চলিতেছে, তাহাও আমার কল্পনার কথা নহে। সাক্ষাৎ উপনিষদের কথা। ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে যে,—আমাদের মধ্যে দেবাসুরে দ্বন্দ্ব নিরন্তরই চলিতেছে। (১।২) অর্থাৎ আমাদের ভিতরে দুই প্রকার ভাব,—দেবভাব এবং আসুর ভাব। এক প্রকার ভাবের চেষ্টা,—সে আমায় দৈবী শক্তিতে সম্পন্ন করিয়া দেহাদির গণ্ডী হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া দেয়। আর এক প্রকার ভাবের চেষ্টা,—সে আমায় আসুরী শক্তিতে সম্পন্ন করিয়া দেহাদি গণ্ডীতেই চিররুদ্ধ করিয়া রাখে। ফুটবলের বলের মত আমিই (জীবাত্মা) হইলাম তাহাদের বিবাদের বিষয়।

আমার (জীবাত্মার) প্রকৃত স্বরূপ হইতেছে আনন্দময়, কিছুতেই তাহার বিকার নাই। ফুটবলের বলেরও স্বরূপ ঠিক তাই; লাথীই মারো আর বুকেই রাখো—কিছুতেই তাহার বিকার নাই। দেহাদি গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকাতেই আমার (জীবাত্মার) নানা নির্য্যাতন; ফুটবলের বলেরও ওই খেলার জমি টুকুতে যতক্ষণ আবদ্ধ, ততক্ষণই নির্য্যাতন। দেহাদির গণ্ডী ছাড়াইতে পারিলেই আমার (জীবাত্মার) মুক্তি, আমার যাতনার দায়ে অব্যাহতি; ফুটবলের বলেরও ওই খেলার

জমির গণ্ডীটুকুর বাহিরে যাইতে পারিলেই মুক্তি,—লাথীর দায়ে অব্যাহতি।

এইবার এগারো এগারো জন খেলোয়াড়ের কথাটাও বলি। আমাদের দেহজমির খেলোয়াড়ও দুই দলে এগারো জন এগারো জন। পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, ইহারাই হইল দেহজমির খেলোয়াড়। দেবভাবের অনুগত কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এবং আসুর ভাবের অনুগত কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন,—এইরূপ বিভাগ অনুসারে উভয় পক্ষেই এগারো জন করিয়া খেলোয়াড়। এই এগারো জনের মধ্যে 'মন' হইতেছে গোলকিপার। ফুটবল খেলায় কেবল 'গোলকিপার'ই হাত-পা দুই-ই চালাইতে পারে; মনেরও গতি অন্তর-বাহির দুই দিকেই সমান। ফুটবল খেলার এগারো জনের মধ্যে গোলকিপারই প্রধান। করণ বা ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে অন্তঃকরণ বা মনই হইতেছে প্রধান। পঞ্চদশীতে দেখিতে পাই,—

"মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্।"

ফুটবলখেলায় গোলকিপারের বল-কৌশলের উপরই জয়-পরাজয় নির্ভর করে। অন্তঃকরণের বল-কৌশলের উপরই আমাদিগেরও দেহ-বন্ধন-মোচন নির্ভর করিয়া থাকে। বাপ-সকল! আমার এই কথাগুলা বায়াত্তুরে বুড়ার বেয়াড়া কথা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া না দিয়া, একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি, আনন্দ পাইবে। শুধু তাহাই নয়, ইন্দ্রিয় ও মনকে দেব-ভাবের অনুগত করিয়া খেলাইতে পারো তো আসুর-ভাবের হাত হইতে তুমি আপনাকে মুক্তও করিতে পারিবে। তখন তোমার খেলা দেখিয়া সামান্য লোকজনের কথা কি, স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি পর্য্যন্ত প্রীতি লাভ করিবেন। সামান্য মেডেল বা শীল্ডের কথা কি, শ্রীহরির শ্রীপদ-পদকই তুমি পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে।

এই কথা বলিয়া সেই জ্ঞানবৃদ্ধ বৃদ্ধ অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। গদগদে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। "তবে বাবা! আসি" বলিয়া তিনি ত্বরিতপদে চলিয়া গেলেন। সকলে অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে দেখিতে দেখিতে তিনি নয়নপথ অতিক্রম করিলেন। এইবার সকলের হুঁস হইল। ফুটবল সম্বন্ধে আর কোন কথা কেহই বলিলেন না। বুড়া যেন যাদুমন্ত্রে সকলকে অভিভূত করিয়া গিয়াছেন। কিছুক্ষণ আনমনে বসিয়া থাকিয়া সকলে,—যে যাহার আবাসের উদ্দেশে গমন করিলেন। সকলেই যেন অন্যমনস্ক,—সকলেই যেন কি একটা ভিতরের কথা পাইয়াছেন, তাহাকে লইয়াই বাহিরের কথা ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমিও তো তাঁহাদেরই একজন? আমারও দশা অন্যরূপ হয় নাই। আমিও আপনার মধ্যে আপনার কথা চিন্তা করিতে-করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

[বঙ্গবাসী; ২রা ভাদ্র; ১৩১৮ সাল।]

———

আলারাম-সিগনাল।

সেই রোগটা আমার এবার অনেকদিন হয় নাই। রোগটা তো তোমরা জানই। সেই যে—যে রোগটা হইলে আমার জড়ের সঙ্গে গলা-জড়াজড়ি গোছের ভাব হইয়া যায়। তাহার ভিতরে আমি যাইয়া পড়ি, আমার ভিতরে সে আসিয়া পড়ে। তাহার অন্তরের কথা আমি জানিতে পারি, আমার অন্তরের কথা সে জানিতে পারে। তা'তে আমাতে আর কিছু তফাৎ থাকে না,—সেই রোগটা।

এবার বড় বেয়াড়া যায়গায় রোগটা দেখা দিয়াছিল। অল্প দিন হইল, শ্রীপঞ্চমীর পরদিন আমি মেদিনীপুর জেলার একটী স্থানে গমন করি। রেল গাড়ীতে যাইতে হয়। যাইতে যাইতে গাড়ীর মাঝেই রোগটা দেখা দেয়। রোগের আগাগোড়া সকল কথা স্মরণ নাই। যেটুকু আছে, সেটুকুই আজ তোমাদিগকে শুনাইব।

গোড়ার কথাটা আগে বলি। আমি তো বেলা আন্দাজ একটার সময় হাবড়া ষ্টেশনে বেঙ্গল নাগপুর কোম্পানীর গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। আজকাল গাড়ীতে চাপিলে যেমন হয়, প্রথম প্রথম তাহাই হইল, মামলা মোকদ্দমার কথায় কাণ ঝালপালা করিয়া তুলিল। মনে হইতে লাগিল, কি বিপদ গা, সারা দেশটা মামলা মামলা করিয়া পাগল হইয়া উঠিয়াছে! আমার ভাগ্যটা ভাল, উলুবেড়ীয়ার পর আমার গাড়ীর কামরাখানি খালি হইয়া গেল। মাম্‌লা-টাম্‌লার কোন কথাই আর আমায় শুনিতে হইল না। আনমনে রেলপথের এধার ওধার দেখিতে লাগিলাম। কখনও দেখি, সৌরকিরণ সম্পাতে বায়ুচালিত হোগলাগাছে হীরার লহর খেলিতেছে। কখনও দেখি, টুক্‌টুকে রাঙ্গা গ্রাম্য পথগুলি

যেন পল্লীবধূর সীমন্তসিন্দুরের মত শোভা পাইতেছে। এক গাড়ী মানুষ হুড়মুড় করিয়া আসিতে দেখিয়া পল্লীবধূ যেন তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টানিয়া দিতেছে। আর সেই অবগুণ্ঠনের মধ্যে সিন্দূর-রেখাটুকু ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে। কোথাও দেখি, দুই চারিটী কিংবা ততোধিক শূন্য কলসী, অর্দ্ধদগ্ধ বংশখণ্ড এবং অঙ্গাররাশি পড়িয়া পড়িয়া নীরবে শেষের সে-দিনকার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আবার কোথাও বা দেখি, মুকুলিত চূতবৃক্ষে কোকিলের দল বড়-গলা করিয়া ঋতুরাজের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে।

বাহিরের এইরূপ কত-কি দৃশ্য দেখিতেদেখিতে ক্রমে ভিতরের দিকে নজর পড়িল। বাহিরে যেমন প্রলোভনমাখা তর-বেতর দেখিবার সামগ্রী, ভিতরে তো আর তাহার কিছুই নাই, তাই তাহার তেমন আকর্ষণও নাই। বাহিরের দৃশ্যই আমাদের মজায় বেশী। সে যাহা হউক, গাড়ীর ভিতরে এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে হঠাৎ আমার দশআঙুল কি বিঘত-খানেক শিকলের উপর নজর পড়িল। ঐ শিক্‌লী গাছটা চোঙার ভিতরে ভিতরে গাঢাকা দিয়া আসিয়া, এক-এক কাম্‌রায় এক-একবার দশ আঙুল বা এক বিঘত করিয়া আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে। যে জায়গায় ঐ শিক্‌লীর স্বরূপখানি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার কাছেই লেখা আছে,—"আলারাম সিগনাল"। তাহারি পাশে ইংরাজি হিন্দী আদি ভাষায় তাহার বিশেষ তত্ত্ব এইভাবে লিখিত আছে যে,—যদি তুমি বিপদে পড়—ভয় পাও তো এই শিকল ধরিয়া টান দাও, গাড়ীর গার্ডের কাছে—কর্ত্তার কাছে খবর পঁহুছিয়া যাইবে, গার্ড অমনি গাড়ী থামাইয়া তোমার ভয় বিপদ দূর করিয়া দিবেন। কিন্তু দেখো—সাবধান, যেন সখের খাতিরে—খেয়ালের বশে শিকল ধরিয়া টান দিও না। দাও তো তোমায় পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হইবে।

আমি বসিয়া-বসিয়া একদৃষ্টে সেই শিকলটুকু দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আমার মাথা যেন ঘুরিয়া গেল। সেই সাবেক রোগটা অমনি আমার ঘাড়ে চাপিয়া বসিল। আমি তখন যেন আর এ আমি নই, —আর এক আমি হইয়া গেলাম। দিব্যনেত্রে দেখিলাম,—শিকলী গাছটী সজীব হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দুই পার্শ্বের রাঙা-রংমাখা চোঙার মুখ দুইটী যেন আল্‌তামাখা ঠোঁট দুইখানির মত কাঁপিয়া উঠিল, কথাও ফুটিল। আহা তাহার ভাষার ভিতর দিয়া যেন সারা সংসারের প্রীতি মমতা পুঞ্জীভূত হইয়া প্রকাশ পাইল। সে যে কত মিষ্ট, কত সোহাগমাখা, তা আর কি বলিব?

শিকল আমায় প্রথমেই জিজ্ঞাসিল,—হাঁ ভাই, তুমি অমন ক'রে আমার পানে চেয়ে র'য়েছ কেন ভাই, তুমি কি আমায় ভালবাস? আমি চেষ্টা করিয়াও তাহার কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। অবাক্ হইয়া তাহার পানে তাকাইয়া রহিলাম। সে যে তখন কি সুন্দর কি চমৎকার দেখাইতে লাগিল, তাহা আর কি বলিব? শিকলী তাহার কথার জবাব না পাইয়া আবার আমাকে বলিতে লাগিল,—দেখ ভাই, আমায় কেউ ভাল বাসুক, আর না-ই বাসুক, আমি কিন্তু সকলকে ভালবাসি। তবে আমার সাধ হয় কি জান, সকলে আমায় ভাল বাসুক। কিন্তু আমার এম্‌নি কপাল, আমাকে ভালবাসা দূরের কথা, গাড়ীতে চাপিয়া আমার দিকে কেহ তাকাইয়াও দেখে না।

এইবার আমার মুখে কথা ফুটিল। আমি বলিলাম,—কেন তাকাইয়া দেখিবে না ভাই, এই যে আমিই তোমায় তাকাইয়া দেখিতেছি? শিকলী বলিল,—দেখিতেছ বলিয়াই তো আমি আমোদে মাতিয়া উঠিয়াছি; আমার দুইটা প্রাণের কথা বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আমি বলিলাম,— আচ্ছা ভাই, আর একটা কথা বলি, যাহারা বিপদে পড়ে, তাহারা তো তোমায় দেখে, তবে আবার তোমাকে কেউ দেখে না বলিতেছ কেন?

শিকল বলিল,—আরে ভাই, বিপদে পড়িলে কি সহজে কেহ আমার দিকে চাহিয়া দেখে,—না, আমার হদিস সকলেই জানে? যে জানে বা দেখে, সে-ও সকলের শেষে। প্রথম দেখে নিজের দিকে। নিজেকে দিয়া যদি না হইল,—নিজের বল-কৌশল যদি বিফল হইল, তখন দেখে আর পাঁচজনের দিকে। তাহাতেও যদি কিছু ফল না ফলিল, তবেই তখন আমার দিকে না তাকাইয়া করে কি? কিন্তু ভাই, বল দেখি, বিপদ ফুরাইয়া গেলে সে আর আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কি? তোমাকে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে,—না। তবেই দেখ, প্রকারান্তরে সে আমাকে না দেখিয়া আপনা-কেই দেখে। সে তো আর আমার জন্য আমাকে দেখে না, নিজের বিপদ নাশের বা নিজের জন্যই আমাকে দেখে। তাই তাহার সে দেখাটা আমি দেখার মধ্যেই গণ্য করি না। তাই সে দেখাতে সে আমার মর্ম্মকথার একটুও জানিতে পারে না। ফলে সে দেখা আর না দেখা দুই-ই সমান।

আমি বলিলাম,—ভাই শিক্‌লি, তোমার ও হেঁয়ালি কিছু বুঝিতে পারিলাম না, একটু ভাঙিয়া চুরিয়া বল দেখি? শিক্‌লী বলিল,—আচ্ছা বেশ, তাহাই বলিতেছি, কিন্তু ভাই! তোমাকে খুব মন দিয়া শুনিতে হইবে। আমি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম, শিক্‌লীও বলিতে আরম্ভ করিল।

শিক্‌লী বলিল,—দেখ ভাই, যে যথার্থ আমায় দেখে, সে ঐ গাড়ীর জানালা দরোজা দিয়া যা-তা সাত-সতেরো বাহিরের কিছুই দেখে না। ভিতরেরও হেন-তেন কিছুই দেখে না; দেখে কেবল আমাকে—আপনা ভুলিয়া—আমাতে মজিয়া আমাকে। যে ঐ ভাবে আমাকে দেখে, সে ঐ দেখার গুণে দেখে কি? দেখে,—সকল গাড়ীতেই আমি আছি। প্রথম, দ্বিতীয়, মধ্যম বা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর সাজ-সরঞ্জামের—বাহ্য শোভার অনেক তারতম্য আছে, কিন্তু আমার সম্বন্ধে কোন ইতর-বিশেষ ভাব নাই।

সেই, সকল শ্রেণীর গাড়ীতে—সকল কামরাতেই দশ আঙুল বা একবিঘত আন্দাজ জায়গায় আমি আপনাকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছি। আমাকে ধরিয়া টান দিবার জন্যও কোন জাতি বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের অধিকার দেওয়া নাই। আমাকে টানিবার সকলেরই সমান অধিকার। কেবল টানিবার ভাবগত পার্থক্যে ফলগত পার্থক্য হইয়া থাকে মাত্র। তা সে দোষ আমার নয়,—যে টানে তাহারই। তুমি বিপদ নাশের নিমিত্ত গাড়ী থামাইতে চাও, তুমি আমাকে ধরিয়া টান দিলেই দেখিবে—গার্ড গাড়ী থামাইয়া তোমার কাছে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার বদনে স্নেহ ও সমবেদনার ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে,—অন্তরের করুণা ভাষায় ব্যবহারে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আর যদি তুমি খালি খেয়ালের খাতিরে বা মজা দেখিবার মৎলবে দুষ্টামি করিয়া আমাকে ধরিয়া টান দাও, দেখিবে,—গাড়ী থামাইয়া গার্ড আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সে প্রসন্ন আননে প্রীতির ভাব নাই,—ভাষায় ও ব্যবহারেও করুণার অণুকণাও নাই। উভয়ের ফলেরও পার্থক্য,—একজনের বিপদ নাশ, আর এক জনের জরিমানা। এ দোষ আমারও নয় গার্ডেরও নয়।

তার পর শুন,—যে আমাকে দেখিবার মত দেখে, সে আরও দেখে যে,—এই সারা সংসারটা যেন একটা প্রকাণ্ড চলন্ত ট্রেণ। এই ট্রেণের একএকটা কাম্‌রা যেন একএকটা মানুষ। কাম্‌রার জানালা দরোজা গুলো যেন ঐ মানুষের ইন্দ্রিয়দ্বার। যে মানুষ কাম্‌রার জানালা-দরোজা বেশ বন্ধ করিয়া রাখে—তাহার ভয় নাই বিপদও নাই। সুচতুর সাবধান মানুষের ধারাই ঐরূপ। কিন্তু যে অচতুর অসাবধান, সে কামরার জানালা-দরোজা খুলিয়া রাখে। তাহার কামরায় যে-সে লোক প্রবেশ করে। বিপদ্‌ও ঘটে। ইন্দ্রিয়দ্বারগুলি খুলিয়া রাখিলেও ভারি ভয় ভারি বিপদ। খোলা পাইলেই কাম-ক্রোধাদি দস্যু সেখানে প্রবেশ করিয়া থাকে, আর

তাহার যথা-সর্ব্বস্ব অপহরণ পূর্ব্বক বিপন্ন করিয়া ফেলে। জানালা দরোজা বন্ধ করিয়া আপনার কামরায় আপনি হুঁসিয়ার হইয়া থাকিলে ভয় থাকে না—বিপদ থাকে না; নবদ্বার নিরুদ্ধ করিয়া আপনার অন্তরে আপনি সজাগ থাকিলেও ভয় থাকে না—বিপদ থাকে না। বেদ বলেন,—"দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি।"—বুঝলে?

আমি যে তাহার কথার কি জবাব দিব, কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। শিকলীর সেই মুরলী-কাকলীর মত মোহন স্বর আমায় মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। অনেক কষ্টে জড়িতকণ্ঠে বলিলাম,—কিছু কিছু।

শিকলী আবার আমোদভরে বলিয়া উঠিল,—বেশ-বেশ, আরও যাহা বলি মন দিয়া শুনিয়া যাও। আমি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম, সে-ও বলিতে সুরু করিল। বলিল,—দেখ ভাই! যে আমায় দেখার মত দেখে, সে আরও দেখে যে,—এই রেল-গাড়ীর সকল ক্লাসে সকল কামরায় থাকিলেও আমি যেমন সকল জায়গা জুড়িয়া থাকি না, মাত্র দশআঙুল বা বিঘত খানেক ভিতরের জায়গা জুড়িয়া থাকি, এইরূপ এই মানুষশরীররূপ কামরায়ও মাত্র দশ আঙুল বা বিঘতখানেক ভিতরের জায়গা জুড়িয়া ঠিক আমারই মত এক "শিকল" আছে। তাহাতে টান পড়িলেই গার্ডের টনক নড়ে। এই দশ আঙুল বা বিঘত খানেক স্থান হইতেছে—হৃদয়, আর এই শিকল হইতেছে,—'সূত্রাত্মা' বা 'অন্তরাত্মা'। ইহার নাম সকলের মতে সমান নয়। বেদশাস্ত্র এই স্থান ও শিকলকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন,—"অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্।" বা "বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি" প্রভৃতি।—বুঝলে?

আমি নীরবে মস্তক চালন দ্বারা সম্মতি জানাইলাম। শিকলী ফের বলিতে লাগিল,—দেখ ভাই, যে আমায় দেখার মত দেখে, সে আরও বুঝিতে পারে, এই বিরাট ট্রেণের গার্ড বা কর্ত্তা হইতেছেন—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। এই হৃদয়ের শিকলীতে হাত পড়িলেই তিনি ছুটিয়া আসেন, এ

রেলগাড়ীর গার্ডের মত যাহার কামরায় হাত পড়িয়াছে, তাহার কামরা-তেই ছুটিয়া আসেন। তা তার হাত-পড়াটা যে ভাবেই হউক। তার পর ভাবের অনুরূপ ফল দেওয়া তো আছেই। এ রেলগাড়ীর গার্ডের মত তাঁহারও বাঁশী লইয়া কার-কারবার।

দুইটা দৃষ্টান্ত দিয়া তোমাকে এ বিষয়টা আরও বিষদ করিয়া দিই। এই দেখনা কেন, দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া আনিয়া সভার মাঝে বিবস্ত্রা করিতে উদ্যত হয়, দ্রৌপদী তখন কি করিয়াছিলেন? পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, প্রথম তিনি এক হস্ত দিয়া—তার পর দুই হস্ত দিয়া কাপড়খানি ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। তাহাতে কিছু হইল না। তখন তিনি পতিগণের প্রতি হৃদয়ের বেদনা জানাইলেন। তাহাতেও কিছু হইল না। তখন তিনি নৃপতিবৃন্দের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। তাহাতেও কিছু হইল না। নিজের হাতে বাহিরের যে কয়টি উপায় ছিল, একে একে সকলই ফুরাইয়া গেল,—এইবার? এইবার তাঁহার বাহির ছাড়িয়া ভিতরের দিকে দৃষ্টি পড়িল; তিনি হৃদয়ের শিকল ধরিয়া টান দিবামাত্র গাড়ীর গার্ড কৃষ্ণচন্দ্র বস্ত্ররূপে আসিয়া গেলেন। তখন যে বস্ত্রেরই দরকার! দেখিয়া দ্রৌপদীর বড় অভিমান হইল,—বলিলেন,—হাঁহে কৃষ্ণ! এই তোমার ভালবাসা,—সখী বলা? এত দেরী করিয়া কি আসিতে হয়? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—সে কি কথা সখি! তুমি তো এতক্ষণ আমাকে ডাকো নাই? তুমি এতক্ষণ আপনাকে ডাকিয়াছ, পতিদের ডাকিয়াছ, নৃপতিদের ডাকিয়াছ। তার পর আমাকে ডাকিয়াছ বটে, কিন্তু তা-ও গোলোক-নাথ বৈকুণ্ঠনাথ প্রভৃতি বলিয়া। তা সখি! গোলোক বৈকুণ্ঠ হইতে আসিতে আমার তো একটু বিলম্ব হইবার কথা? আর অতদূর হইতেই কি সকলের সকল কথা সকল সময় শুনা যায়? কিন্তু দেখ সখি! তুমি যাই আমাকে "হৃদয়নাথ" বলিয়া ডাকিয়াছ, আর অমনি আমি সঙ্গেসঙ্গে

আসিয়া গিয়াছি। তা আমার আসিবার বিলম্বের কারণ আমি, না তুমি? হৃদয়ের শিকলে হাত দিয়া 'হৃদয়নাথ' বলিয়া ডাক দিলেই তো আমি তখনই ছুটিয়া আসি,—তখনই তাহার সকল দুঃখ দূর করিয়া থাকি। দ্রৌপদী আর কি বলিবেন, তাঁহার আনন্দগলিত নয়নজলই সে কথার জবাব দিয়া দিল।

তারপর আরও দেখ, এই যে কংস-শিশুপালাদি দিন নাই রাত্রি নাই খেয়ালের বশে দুষ্টামি করিয়া কেবলই "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া হৃদয়ের শিকলী ধরিয়া টানাটানি করিয়াছিল, তাহাদের দশা কি হইয়াছিল? তাহাদের গাড়ীর গতিরোধ করিয়া কৃষ্ণ গার্ড তাহাদিগকে দণ্ড দিয়াছিলেন। হয় তো তুমি বলিবে শ্রীকৃষ্ণ তো তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছিলেন? হাঁ, তাহাই,—মুক্তিই দিয়াছিলেন, তাহাদের গাড়ী থামাইয়া—সংসার নিবৃত্তি করিয়া মুক্তিই দিয়াছিলেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এই 'মুক্তি' দণ্ড ভিন্ন আর কি-ই বা হইতে পারে? পুরীরাজ প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কথা শুন নাই কি?—

"ভট্টাচার্য্য কহে—মুক্তি নহে ভক্তিফল।
ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা-যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে॥
সেই দুইয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি।
তার মুক্তি ফল নহে যেই করে ভক্তি॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

যাহা পাইলে, ভগবানের সেবাসুখে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহা 'দণ্ড' ভিন্ন আর কি-ই বা হইতে পারে? তাই ভাগবতগণ "নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না চায়"। তাই ভগবান্ কপিলদেব জননী দেবহূতিকে বলিয়াছিলেন,—

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-
সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি
বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৯।১১)

মা, যাহারা আমার জন—আমার ভক্ত, তাহারা না চাহিলেও আমি তাহাদিগকে সালোক্য (আমার সমান লোকে বাস), সার্ষ্টি (আমার সমান ঐশ্বর্য্য), সামীপ্য (আমার কাছে কাছে থাকা), সারূপ্য (আমার সমান রূপ লাভ) এবং একত্ব বা সাযুজ্য (আমার সহিত এক হইয়া যাওয়া)—এই পাঁচ প্রকার মুক্তি দান করিতে চাই, কিন্তু তাহারা আমার সেবা ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করিতে চায় না।

সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য এবং সারূপ্য এই চারি প্রকার মুক্তি যদি সেবার অনুকূল হয়, তবে কদাচিৎ ভক্ত তাহা অঙ্গীকার করেন, কিন্তু সাযুজ্য মুক্তির নাম শুনিলে তাঁহারা ভয়ে ঘৃণায় অভিভূত হন। তাই ভক্তের কাছে মুক্তি দণ্ড মধ্যে পরিগণিত।—বুঝলে?

শিক্‌লি এই কথা বলিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, অমনি বাহির হইতে—"হাউর হাউর" হাঁক শুনিয়া আমার রোগের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল। আমি অমনি তাড়াতাড়ি বাহিরে চাহিয়া দেখি,—তাই তো হাউর-ষ্টেশনেই যে গাড়ী আসিয়া গিয়াছে! সেইখানেই আমায় নামিতে হইবে। তাই গাড়ীতে আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না; দ্রুতপদে নামিয়া পড়িলাম। নামিবার পূর্ব্বে একবার শিকলির দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—আর সে জীবন্ত শিকলী নাই,—যে জড় লোহার শিকলী, সেই লোহার শিকলী! হবেইত, আমিই যে তখন আমার সে আমিত্ব খোয়াইয়া ফেলিয়াছি।

ষ্টেশনে লোকজন ছিল,—পাল্‌কীও প্রস্তুত ছিল। তাহাদের সহিত

দুইএকটা কথা কহিয়া পাল্‌কীতে চাপিলাম। পাল্কী চলিল। তখনও রোগের ঝোঁকটা সম্পূর্ণ রহিয়াছে। পাল্কীতে পড়িয়াপড়িয়া শিকলীর কথা ভাবিতে লাগিলাম। কেবলই মনে হইতে লাগিল,—আচ্ছা, যাহারা চক্ষুষ্মান্—সমর্থ, তাহারাই তো শিক্‌লী ধরিয়া টান দিতে পারিবে, কিন্তু যে অন্ধ-পঙ্গু,—শিকলী দেখিবার বা ধরিবার যাহার ক্ষমতা নাই, তাহার দশা কি হইবে? তাহার ভয় তাহার বিপদ বিনাশের উপায় কি? তাহার প্রাণের কথা গার্ডের কাছে পঁহুছাইবার উপায় কি? শাস্ত্র বলেন,—"সৎ-সঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্ম্মলং নয়নদ্বয়ম্।"—হায়, এই সৎসঙ্গ বা বিবেক—দুইটী নয়নই যে আমার নাই, তাহার উপর মহা কর্ম্মজড়, আমার দশা কি হইবে? হৃদয় কোথায়,—শিকলী কোথায়,—কে আমায় দেখাইয়া দিবে?—শিকলীর আকর্ষণপ্রণালীই বা কে আমায় শিখাইয়া দিবে? হায়, তবে কি আমার গাড়ীর গতিরোধ হবে না? কৃষ্ণ-গার্ডের দেখা কি আমি পাব না? হায়, অন্ধ অসাবধান পাইয়া কামাদি দস্যু যে আমার যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া হাত-পা ভাঙ্গিয়া পঙ্গু করিয়া ফেলিল?—এখন আমি করি কি?

তন্ময় হইয়া এইরূপ কত-কি ভাবিতেভাবিতে শিকল যেন আবার আমায় দেখা দিল। সেই হাসিহাসি মুখ, সেই মিষ্টমিষ্ট কথা। সোহাগের সুধায় চুবানো স্বরে শিক্‌লি বলিয়া উঠিল,—করিবে আর কি,—কাঁদো,—গার্ডের নাম লইয়া কাঁদো; কেউ-না-কেউ তোমার হইয়া আমায় টানিয়া দিবেই দিবে।

ও ভাই শিকল! ও কান্না যে আমার আসে না ভাই!—সংসারের শোকের কান্না, রোগের কান্না, অভাবের কান্না কাঁদিয়াকাঁদিয়া যে আমি তাহাতেই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি;—আমার দশা কি হইবে ভাই?

শিকল বলিল,—তার আর কি, এ-ও কান্না সে-ও কান্না; কান্নার তো রেয়াজ আছে, তাহা হইলেই হইল। এ না হয় বাপ-রে, মা-রে, যাদু-রে,

প্রাণ-রে, গেলাম-রে, মলাম-রে প্রভৃতি বোলে কান্না, আর সে না হয় কৃষ্ণ-রে, নন্দনন্দন-রে, যশোদাদুলাল-রে প্রভৃতি বোলে কান্না। এ আর পার্‌বে না? নাও, কাঁদো—কৃষ্ণ বোলে কাঁদো,—কৃষ্ণ বোলে কাঁদো। ভয় কিসের,—ভাবনাই বা কিসের? ও নাম বোল্‌তে বোল্‌তে নামের গুণে গার্ডের কাণে প্রাণের কথা আপনাআপনি পঁহুছাইয়া যাইবে। কাঁদো—কাঁদো—কৃষ্ণ বোলে কাঁদো।

এই বলিয়া শিকলী চলিয়া গেল। এদিকে খালের খেয়াঘাটে পাল্‌কী আসিয়া পঁহুছিল। আমারও মনোরাজ্য বা ভাবরাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল।

[বঙ্গবাসী; ৭ই বৈশাখ; ১৩১৯ সাল।]

শ্রীরথ মহাশয়।

চড়কের সময় গাজুনে সন্ন্যাসীর পিঠ চড়চড়ানীর মত এই রথযাত্রার সময়টায় শ্রীনীলাচল ধামে যাইবার জন্য আমার কেমন মন-ধড়ফড়ানী উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ এই সভ্য সহর কলিকাতায় অসভ্য তালিপাতার ভেঁপু বাজাইয়া বালকের পাল যখন ভোঁপো-ভোঁপো রবে শ্রীস্নানযাত্রার শুভাগমন সংবাদ প্রচার করিয়া দেয়, তখন আর এখানে আপনাকে আটকাইয়া রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। তখন কেবলই যেন মনে হইতে থাকে,—ঐ সেই নীলাচলধাম, ঐ সেই প্রকাণ্ড বড় দাণ্ড, ঐ সেই সারি সারি সজ্জিত তিনখানি রথ, ঐ সেই ভাববিভোর ভক্তবৃন্দ, ঐ সেই ব্রহ্মাণ্ডভেদী হরি হরি জয় জয় রব, ঐ সেই মৃদঙ্গের তালে তালে উদ্দণ্ড তাণ্ডব নর্ত্তন, ঐ সেই শ্রবণমনোহারী সঙ্কীর্ত্তন, ঐ সেই রথোপরি জগন্নাথ, আর পথোপরি ঐ সেই সচল কনকাচল বিশাল বক্ষে যুগল সুরধুনী ধারা ধরিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার মুখে কখনও জজ গগ জজ গগ ধ্বনি, কখনও মণিমা মণিমা উচ্চ আরাব, আর কখনও বা কি এক মোহন সুরে—"সোই পরাণ নাথ পাইনু"—সঙ্গীত। আহা, সে যে কত সুন্দর কত সুমধুর, কি আর বলিব!

স্নানযাত্রার দিন হইতে এবারও প্রাণটা কেমন আনচান করিতেছে। সদাই যাই যাই ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু প্রতিপদে প্রতিবন্ধ। মনে সুখ নাই। সে দিন রাত্রে শয়ন করিয়া আছি। খানিক পরে দেখিতেছি কি, আমি আর এখানে নাই। একেবারে নীলাচলে চলিয়া গিয়াছি। এই বাহিরের দেহটারই তো যাইবার যত কিছু বাধা; টিকিট কেনো, যোগাড় সোগাড় করিয়া প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করো, ভীড় ঠেলিয়া হুড়াহুড়ি

করিয়া গাড়ীতে চাপো প্রভৃতি কত কি ; ভিতরের শরীরের তো আর ও-সকলের তোয়াক্কা রাখিতে হয় না। ইহাকে তোমরা স্বপ্ন দেখা বলো আর যাহাই বলো, আমি কিন্তু দিব্য দেখিতেছি যে, পুরীধামের সেই প্রশস্ত রাজপথে রাজবাটীর সম্মুখে শ্রীজগন্নাথের সুন্দর সুসজ্জিত রথ বিরাজ করিতেছেন। দেখিয়া ভারি আনন্দ হইল। খুব ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে রথখানি যেন কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, তৎপরিবর্ত্তে একজন কমনীয় কান্তি রমণীয়বপু দিব্যপুরুষ হাসিতে হাসিতে আমার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—ভাই অতুলকৃষ্ণ! ভাল আছ ত? এই দেখ, তুমি ভাবিতে না ভাবিতেই আমি এসেছি।

শুনিয়া আমি তো অবাক্! জিজ্ঞাসিলাম,—কে মহাশয়, আপনাকে তো আমি চিনিতে পারিতেছি না, আপনার কথা ভাবিতেছিলাম বলিয়াও তো মনে হইতেছে না? ভাল, আপনার নামটা কি বলুন দেখি?

"নন্দি ঘোষ।"

"আঁ্যা, নন্দি ঘোষ, কই এমন কারুর নাম শুনেছি বোলে তো মনে হয় না? কি, নন্দি এবং ঘোষ, না, নন্দি নাম, ঘোষ উপাধি? তা হ'লে আপনারা কি ঘোষ,—ঘোষবর্ম্মন্, ঘোষ দাস, না শুধুই ঘোষ?"

"না ভাই, শুধুই ঘোষ।"

"তবে কি আপনি গোপজাতি?"

"ঐ জাতির অনেকটা সম্বন্ধ রাখি বটে ; আমি হচ্ছি একজন গোপনন্দনের বাহন।"

"আঁ্যা,—বাহন? ভাল, সে গোয়ালার পোলাটি কে?"

"ইহাও আর বুঝিলে না,—তিনি হচ্ছেন এই নীলাচলের নাথ—জগন্নাথ।"

"অঁ্যা, আপনি তাঁহার বাহন কিরূপ ?"

"আরে ভাই, এত উৎকলগ্রন্থ পড়িলে, আর এই মোটা কথাটা বুঝিতে পারিলে না ? আমি হইতেছি শ্রীজগন্নাথ দেবের রথ, চলিবার সময় আমার 'ঘোষ' বা ধ্বনি শুনিয়া জগন্নাথদেবের ভারি আনন্দ হয় বলিয়াই আমার নাম—নন্দি-ঘোষ।"

"হাঁ, হাঁ, জগন্নাথদেবের রথের নাম 'নন্দি ঘোষ' এই কথা দার্ঢ্যভক্তি-রসামৃত প্রভৃতি উড়িয়া গ্রন্থে পড়িয়াছি বটে, কিন্তু মানবমূর্ত্তি আপনি সেই রথ হইলেন কিরূপে ;—আর আমি না ভাবিতে-ভাবিতেই বা আসিলেন কি প্রকারে ?"

"দেখ ভাই, শ্রীজগন্নাথ হইতেছেন বিভুবস্তু, তিনি তাঁহার বিভুতা-স্বভাবে এই নীলাচলে থাকিয়াও সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছেন। নীলাচলনাথ ! নীলাচলনাথ ! বলিয়া ব্যাকুলভাবে যে যেখান হইতে তাঁহাকে ডাকুক না কেন, তিনি তখনি তথায় আপন স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নীলাচলনাথরূপেই দর্শন দিয়া থাকেন। তিনি যেমন বিভু, তাঁহার ধাম, তাঁহার লীলা-পরিকর, বেশ-ভূষা, যান বাহন প্রভৃতিও সেইরূপ বিভু। সুতরাং তাঁহার যেরূপ অন্যত্র প্রকাশ,—তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার ধাম প্রভৃতিরও সেইরূপ অন্যত্র প্রকাশ হইয়া থাকে। তুমি কয়েকদিন হইতে ব্যাকুল প্রাণে নীলাচল নীলাচল রথ রথ করিতেছিলে, তাই নীলাচল সমেত স্বয়ং আমিও তোমার কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়াছি। মনোরথে চড়িয়া তুমি যে এই রথের দেশে আসিয়াছ, এ কথাটা এখন এ রথের কথায় বোধ হয় ছাড়িয়া দিতে পারো। তারপর ভাই, তুমি আমার মানুষের মত মূর্ত্তি দেখিয়া আমাকে 'রথ' বলিয়া মানিয়া লইতে নিতান্ত নারাজ ; কিন্তু তুমি শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি আলোচনা করিয়া দেখ দেখি, এই মানুষ মূর্ত্তিতে তুমিও আমার মত একখানি 'রথ' কি না ?

আর আমার সজাতীয় 'রথ' বলিয়াই তো আমি তোমাকে 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি,—বুঝ্‌লে ?

আমি বলিলাম,—"না মহাশয়, আপনার কথার আমি একবর্ণও বুঝিতে পারিতেছি না। দয়া করিয়া একটু খুলিয়া বলিতে হইবে।" তিনি তখন হাসিতে হাসিতে আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—দেখ ভাই, তুমি একটু মন দিয়া আমার কথা শোনো, তুমি যে একখানি রথ বই আর কিছুই নও, এ কথা এখনই উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতেছি। এই 'তুমি' বলিতে অবশ্য আমি তোমার দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতিকে এক সঙ্গেই বলিয়াছি, এবং 'রথ' বলিতে রথ, রথের ঘোঁড়া, ঘোঁড়ার লাগাম ও সারথি প্রভৃতিকে এক সঙ্গেই অভিহিত করিয়াছি।

আমি বলিলাম,—ভাল কথা, আমি খুব আগ্রহ সহকারেই শুনিতেছি, আপনি আপনার বক্তব্য বলিতে থাকুন। তিনি বলিলেন,—দেখ ভাই, ইহা আমার কল্পনার জল্পনা নয়, সাক্ষাৎ উপনিষদের উপদেশ। কঠ-উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন,—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেযু্‌ গোচরান্‌॥" ইত্যাদি
(তৃতীয়া বল্লী, ৩, ৪)

তোমার এই শরীর হইতেছে—রথ, আত্মা (জীবাত্মা) হইতেছেন—রথী (এ রথের মালিক), বুদ্ধি হইতেছে—সারথি, মন হইতেছে—লাগাম, ইন্দ্রিয়গণ হইতেছে—ঘোটক এবং রূপ-রসাদি বিষয় হইতেছে—রথ চলিবার পথ। অর্থাৎ রথস্বামীর ইচ্ছা না হইলে যেমন সারথি রথ চালায় না, তেমনই অন্তরবিহারী আত্মার প্রেরণা না হইলে বুদ্ধি-সারথি দেহ-রথ চালিত করে না। যাহার দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে

বলে—করণ। আমাদের অন্তরের কার্য্য যাহার দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে, তাহাকে বলে—অন্তঃকরণ। এই অন্তঃকরণ আবার চারি ভাগে বিভক্ত,—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। হাঁ না হাঁ না—এইরূপ তোলাপাড়া যখন ভিতরে ভিতরে হইতে থাকে, বুঝিতে হইবে তখন মনের কার্য্য চলিতেছে। হাঁ এই ঠিক, এইরূপ নিশ্চয়াত্মক ব্যাপার যখন ভিতরে ভিতরে হইতে থাকে, বুঝিতে হইবে তখন বুদ্ধির কার্য্য চলিতেছে। আত্মা প্রেরণা করেন এই বুদ্ধিকে, বুদ্ধি প্রেরণা করেন মনকে, আর মন প্রেরণা করেন ইন্দ্রিয়গণকে, তবেই দেহরথ চলে—রূপরসাদি নানা প্রকার বিষয় গ্রহণ করে। নচেৎ দেহ অচল।

ঘোটকগণ যেমন রথকে পথের দিকে আকর্ষণ করে, ইন্দ্রিয়গণও তেমনই দেহকে বিষয়ের দিকে টানিয়া আনে। লাগাম টানিয়া রাখিলে যেরূপ ঘোঁড়া পথের দিকে যাইতে পারে না, আল্গা রাখিলেই পারে, এইরূপ মন ইন্দ্রিয়গণকে ভিতরের দিকে আকর্ষণ করিলেই তাহারা আর বাহিরের রূপরসাদি বিষয়ের পথে যাইতে পারে না, কিন্তু মনের রাশ আল্গা পাইলেই পারে,—মন বিষয়ভোগে উন্মুখ হইলেই ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের দিকে দেহরথকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

সারথি যদি পাকা হয়, রাশ যদি বাগাইয়া ধরিয়া থাকিতে পারে, তবেই ঘোঁড়াও তাহার কাছে সায়েস্তা থাকে। নচেৎ বড় গোলের কথা। তাহার কাছে ঘোঁড়া টিট মানে না। রথেরও বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

সু ও কু ভেদে বুদ্ধি দুই প্রকার। সু'এর নিশ্চয় এক, কু'এর নিশ্চয় আর। ("ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥"—গীতা) শৌচ-সদাচারাদিসম্পন্ন ব্যক্তির ভাগ্যেই সুবুদ্ধি-সারথি মিলে। আর অশুচি অসদাচারীর ভাগ্যে কুবুদ্ধি-সারথি জুটিয়া থাকে। সুবুদ্ধি সারথি মনের লাগাম বেশ বাগাইয়া দৃঢ়তার

সহিত ধরিয়া থাকিতে পারে, সুতরাং তাহার চালকতায় ইন্দ্রিয় অশ্বগণ বিষয়ের পথে যথেচ্ছ গমন করিতে পারে না। আর কুবুদ্ধি-সারথির তাদৃশ দৃঢ়তা না থাকায় মনের লাগাম সে তেমন বাগাইয়া ধরিয়া রাখিতে পারে না, সুতরাং তাহার চালকতায় ইন্দ্রিয় অশ্বগণ বিষয়ের পথে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে গমন করিয়া থাকে। ফলে রথীর তাহাতে বড় বিপদ্—বারংবার সংসার-পতন অনিবার্য্য। ঠিক পথ ধরিতে পারে না বলিয়া, তাহার পথ আর ফুরায় না, পথের পার আর সে পায় না। কিন্তু,—

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥"

(কঠ, ৩য়া বল্লী, ৯ শ্রুতি)

যে মানব বিজ্ঞানসারথি বা সুবুদ্ধি-সারথি পাইয়াছে, তাহার সাহায্যে যে চঞ্চল বিষয়োন্মুখ মনকে নিগৃহীত করিতে সমর্থ হইয়াছে, সে-ই পথের পার প্রাপ্ত হয়,—শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ তাহার অধিগম্য হইয়া থাকে।—বুঝলে ?

আমি বলিলাম,—হাঁ মহাশয়, কিছু কিছু। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রথের ঘোঁড়াটোড়া তো একরকম যা'হক বুঝা গেল, কিন্তু চাকা-টাকার কথা তো তেমন বুঝা গেল না ?

রথ মহাশয় বলিলেন,—ভায়া, তুমি ভাগবতের পোড়ো, এ কথাটাও আবার তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে ? পুরঞ্জনের উপাখ্যান পড় নাই ? তাহাতেই তো সব লেখা আছে,—

"দেহো রথস্ত্বিন্দ্রিয়াশ্বঃ সংবৎসররয়ো গতিঃ।
দ্বিকর্ম্মচক্রস্ত্রিগুণধ্বজঃ পঞ্চাসুবন্ধুরঃ॥" ইত্যাদি (ভাঃ ৪।২৯।১৮)

শুভ আর অশুভ এই দুই প্রকার কর্ম্মই হইল তোমাদের রথের দুইটী চাকা। আমাদের চাকা-টাকার সঙ্গে তোমাদের চাকা-টাকার একটু

আধটু তফাৎ থাকে থাকুক, ফলে কিন্তু তোমরা যে আমাদেরই মত এক-একখানি রথ, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আরে ভাই! তোমাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও তো এ কথা আছে, দেখ নাই কি? মহাভাগবত রামানন্দ রায় বলিতেছেন,—

"রায় কহে,—চরণ রথ হৃদয় সারথি।
যাহাঁ লঞা যায়, তাহাঁ যায় জীব রথী॥" (মধ্য, ১১শ)

"এখানে 'চরণ' শব্দ যে দেহেরই উপলক্ষণ, আর হৃদয় বলিতে যে বুদ্ধিকেই বুঝিতে হইবে, তাহা বোধ হয় তোমাকে আর অধিক করিয়া বুঝাইতে হইবে না? তবে ভাই! আমি এখন আসি, রথযাত্রার নিমন্ত্রণ রহিল, সোজায় না পারো উল্টা রথেও যাইও, আর নিতান্ত না যাইতে পারো তো ঘরে রহিয়া ঐরূপ ব্যাকুল প্রাণে নীলাচলনাথ! নীলাচলনাথ! বলিয়া ডাকিও, তাঁহাকে শুদ্ধ লইয়া আমি দেখা দিয়া যাইব। তবে ভাই! আসি।

আরও কত কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব, একটা প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইব, মনে করিতে-না-করিতেই ফিক্ করিয়া হাসিয়া তিনি তথায় মিলাইয়া গেলেন। প্রাণে বিষম ব্যথা বাজিল। সুখের স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া গেল। তখন আমি যে তিমিরে সে তিমিরে। কোথায় বা নীলাচল,—কোথায় বা রথ, আর কোথায় বা কি?

শ্রীরথযাত্রার মরসুমে তোমাদের এ রথের কথা ভাল লাগিবে কি ভাই? ভাল লাগুক আর না-ই লাগুক, কথাটা একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি?

[বঙ্গবাসী; ৯ই আষাঢ়, ১৩২৪ সাল।]

ফানু বাবু।

গত ২৮শে কার্ত্তিক বুধবার—শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার দিন সন্ধ্যার পর দ্বিতলের বারাণ্ডায় বসিয়া আছি। রুগ্ন শরীর, কোথাও যাইবার যো নাই। সুযোগ বুঝিয়া নানা প্রকার চিন্তা আসিয়া চারিদিক হইতে আক্রমণ করিয়াছে। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। দীপান্বিতা উপলক্ষে উৎসৃষ্ট দেহলী-দীপগুলি একে একে নিবিয়া গেল। পটকার পট্‌পটানি, বোমার দুম্‌দুমানি, তুবড়ী-হাউইয়ের ফোঁস্‌ফোঁসানি সোঁসোয়ানি থামিয়া গেল। চারিদিক্ আঁধারে আঁধার। কেবল মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে এক আধটা বাজির আওয়াজ, আর পূজাবাড়ীর বাজনার আওয়াজ শুনা যাইতেছে। আমার ভিতরের অবস্থাও বাহিরেরই অনুরূপ,—তাহারও চারিদিকে জমাটবাঁধা অন্ধকার, কেবল মাঝে মাঝে দুরন্ত চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত, আর অবিশ্রান্ত কয়েকবৎসর ধরিয়া যাহাদিগকে চিতায় আহুতি দিয়াছি, তাহাদেরই জ্বলন্ত মূর্ত্তির বিকাশ। কতক্ষণ জানিনা, কত কি ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল,—তাইতো, আজই তো আমার জন্মতিথি; দেখিতে দেখিতে এইরূপ পঞ্চাশটী তিথি অতীত হইয়া গেল, কিন্তু করিলাম কি?—না জুটিল সাধুসঙ্গ, না ছুটিল মোহের নেশা, না টুটিল কর্ম্মের বাঁধন! সাধক বলিয়াছিলেন,—

"কালীরূপের আলো জ্বালো মহামোহ-অন্ধকারে।
হেরিয়া পরমজ্যোতি তমোভয় যাবে দূরে॥"

কই এ আঁধারভরা হিয়ার মাঝে তো কালো রূপের শীতল আলোও জ্বালাইতে পারিলাম না? হায় হায়, বিফলে জনম গোঙাইনু!

নির্ব্বেদে হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল—হায় হায়, কোথায় যাই কোথায় যাই, কোথায় গেলে শান্তি পাই, এই চিন্তাই সারা অন্তর তোলপাড় করিয়া তুলিল। এমন সময় কে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত সুধামধুর স্বরে আমায় সম্বোধন করিয়া বলিল,—কি ভাই গোঁসাই! ভাল আছ ত? চমকভাঙ্গা হইয়া আমি এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখি, কই, কোথাও তো কেহই নাই। —কাহার এ কণ্ঠস্বর?

বারাণ্ডার সম্মুখেই প্রকাণ্ড পিয়াল গাছ, তাহার উপর হইতে যেন আবার সেই কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হইল। বলিল,—ভাই, এদিক্ ওদিক্ কি চাহিয়া দেখিতেছ, এই যে আমি গাছের উপর, দেখিতে পাইতেছ না? তাড়াতাড়ি সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখি,—মস্ত একটা রং-চঙে ফানুষ, গাছের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, শব্দটা যেন তাহারই ভিতর হইতে বাহির হইতেছে। ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া, তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়াই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—কে ভাই তুমি এ অভাগার কুশল প্রশ্ন করিতেছ,—তোমার নাম কি ভাই?

এবার স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম,—আমাকে তাহার দিকে তাকাইতে দেখিয়া আনন্দভরে তাহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল, জলন্ত আলোক-পিণ্ডটা যেন নৃত্য করিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে চেঁচাড়ির বেড় ও তারের বাঁধন সমেত আলোকপিণ্ডটা যেন একখানি হাসি হাসি মুখের ভাব ধারণ করিল; সেই ফানুষই তখন মানুষের মত মুখ নাড়িয়া বলিয়া উঠিল,—নাম জিজ্ঞাসা করিতেছ, কোন্ নামটা বলিব ভাই;—সাহেবী, না বাঙ্গালী?

আমি যে সাদা-চোখে আছি, কিংবা ঠিক প্রকৃতিস্থ আছি, এ বিষয়ে অবিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও, আমি সে কারণের তল্লাস না করিয়া, এ এক ব্যাপার মন্দ নয় ভাবিয়া, উল্লাসভরে তাহার সহিত কথা-বার্ত্তা জুড়িয়া দিলাম। বলিলাম,—সাহেবী নাম বাঙ্গালী নাম আবার কি

প্রকার? সে বলিল,—এই যেমন আসল বাঙ্গালী নাম হইতেছে নগেন্দ্র, কিন্তু সাহেবী ধরণে বলিতে গেলে ঐ নাম হইবে—মিষ্টার নগিন্। গোপাল হইবেন—মিঃ গপেল্। ভড়জী হইবেন—ভ্যাড়াজী, সিংহ হইবেন—সিনা, বন্দ্যোপাধ্যায় হইবেন—বানরজী, গোস্বামী হইবেন—গোসেন্ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার তেমনি সাহেবী নাম হইতেছে—মিষ্টার ফ্যান্সি।

শুনিয়া আমি হাসিয়াই অস্থির। জিজ্ঞাসিলাম,—আচ্ছা ভাই, তোমার তো সাহেবী নাম শুনা গেল, এখন একবার বাঙ্গালী নামটা শুনাইয়া দাও দেখি? সে-ও হাসিমাখা স্বরে বলিল,—ফানু বাবু। আমি বলিলাম—এ আবার কি রকম নাম? সে বলিল—এই যেমন—নগেন্দ্রনাথ নগু, বাণেশ্বর বাণু, কেনারাম কিনু, সেই রকম ফানুষ আমি ফানু হইব না কেন? আমি বলিলাম,—ভাল, বুঝিলাম—ফানুষ তুমি না হয় ফানুই হইলে, কিন্তু তুমি শুধু ফানু নয়, ফানুবাবু হইলে কি প্রকারে? এই কথা বলাও যা, আর তাহার ফর্‌ফরাণি দেখে কে? সে মহা তার্কিকের মত আমার সহিত তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার প্রধান কথা,—সে বাবু নয় কিসে? আধুনিক বাবুর লক্ষণ অধিকাংশই তাহাতে বিদ্যমান থাকিতে সে বাবু নয় কিসে? বাবুদের ভিতরে ফোক্কা, বাহিরেই রংচং জাঁকজমক, তাহাদেরও তাহাই। বাবুদের সকলের ফেসিয়ান সমান নয়, তাহাদেরও তাহাই। বাবুদের সাজ গোজ কাটছাঁট হরেক রকমের, তাহাদেরও তাহাই। বাবুদের মুখে চুরুট-সিগারেটের আগুন সর্ব্বদা বিদ্যমান, তাহাদের মুখেও তাহাই। বাবুদের সর্ব্বস্ব উদর ও মুখ, তাহাদেরও তাহাই। বাবুরা বায়ুর বশে উড়িয়া বেড়ায়, তাহারাও তাহাই। ধূমপান না করিলে বাবুদের প্রাণ আর বাঁচে না, তাহাদেরও তাহাই। ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে বাবুদের সমানধর্ম্মা সে, বাবু না হইবে কেন? ফলে সে যে একজন লক্ষণাক্রান্ত বাবু, তাহা আমাকে মানিয়া লইতেই হইল। 'থিংস্ হুইচ আর

ইকোয়েল টু দি সেম থিং আর ইকোয়েল টু ওয়ান এনাদার’ (Things which are equal to the same thing are equal to one another.) এই ইংরাজী বুলিটুকু আওড়াইতেও সে ত্রুটি করে নাই।

তর্কের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আচ্ছা ফানুবাবু, হঠাৎ তোমার এ অধমের উপর এত মেহেরবাণী হইল কেন? উত্তরে সে বলিল, কি জান ভাই,—বাহিরটাই দেখে সকলে, ভিতরটা তো তেমন দেখা যায় না? বাহিরে হয়তো ফিট্‌ফাট্ বাবু, ভিতরে কিন্তু দাউ দাউ দাবানল, সমুদ্রের বাহিরে বুকভরা শীতল জল, ভিতরে কিন্তু প্রবল বাড়বানল, সহজে কে বুঝিবে বল? ভিতরে আগুন জ্বলিলে আবার কাহারও স্থির থাকিবার জো নাই, ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেই হয়; তা সে আগুন যে প্রকারই হউক। সমুদ্র অবিশ্রান্ত অস্থির এই আগুনের দায়ে, পৃথিবীরও বিরতিহীন পরিভ্রমণ কিংবা থাকিয়া থাকিয়া কম্পন, ভিতরে আগুন আছে বলিয়া। জঠরের হুতাশন বিশ্ববাসীকে অস্থির করিয়া রাখিয়াছে, কামের অনলেও কত জীব ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে। অমন যে ভগবানের ভক্ত, যাঁহাদের অন্তরে শান্তির অমৃত প্রস্রবণ, তাঁহাদেরও পরিভ্রমণ এক প্রকার অনলেরই প্রেরণায়,—জগজ্জীবের দুরন্ত দুঃখদুর্গতি দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের মাঝে যে দারুণ আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহারই প্রেরণায়। বিরহের বহ্নিতাপে প্রেমিকের চিত্তও চঞ্চল বিকল করিয়া তুলে, তাই সেই প্রেমের ঠাকুরকেও কখনও জলে গিয়া ঝাঁপ দিতে হইয়াছে, কখনও বা বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। আর আমি যে ফানুবাবু, বাহিরের চটক যতই থাকুক, আমারও ভিতরে একটা আগুন সদাই জ্বলিতেছে, তাই আমাকেও প্রায় ঘুরিয়াই বেড়াইতে হয়। যাহার যাহার ভিতরে আগুনের জ্বালা, তাহারা যদি সকলে ছুটাছুটি করিতে না পারিত, তাহা হইলে কি আর রক্ষা থাকিত? নিত্যই তাহা হইলে বিশ্ব-

বিলম্বের দৃশ্য দেখিতে হইত। ছুটিতে পারে না বলিয়াই অন্তর্ব্বহ্নি পর্ব্বত ফাটিয়া দেশ ছারেখারে দেয়, ছুটিতে পারে না বলিয়াই বৃক্ষ নিজে পুড়িয়া সমগ্র বন পুড়াইয়া ফেলে। সে যাহা হউক ভাই, ঘুরিতে ঘুরিতে দৈবাৎ এইখানটা দিয়া যাইতেছিলাম, হঠাৎ তোমার দিকে নজর পড়িয়া গেল। তুমি ছেলেবেলায় আমাদের বড় ভাল বাসিতে। এই কালীপূজার সময় তিন চারি শত আমাদের লইয়া কত আমোদ আহ্লাদ করিতে। তাই তোমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম। ষ্টীমটাও কিছু কম পড়িয়াছে, এই পিয়ারা গাছে বসিয়া একটু ধূমপান করাও হইবে, আর তোমাকে দুইটা তত্ত্বকথাও বলা হইবে। জানতো ভাই, বাবু লোক আমরা, ভিতরে কিছু থাক আর নাই থাক, মৌখিক তত্ত্ব উপদেশ দিতে আমরা খুব মজবুত! তবে এ উপদেশ কতক্ষণ দিব, তা জান? যতক্ষণ না আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। তারপর আর আমি এখানে বোকার বা বেকারের মত বসিয়া থাকিব না। অমনি—যাহার আশ্রয়ে থাকিয়া আত্মশক্তি সংবর্দ্ধন করিলাম, তাহাকে ছাড়িয়াই দাও চম্পট। এটাও অবশ্য বাবুরই লক্ষণ!—বুঝলে ভাই?

আমি বলিলাম,—তা বেশ ভাই বেশ, তত্ত্ব উপদেশটাই চলুক, যতক্ষণ চলে ততক্ষণই লাভ। কি উপদেশ দেবে ভাই? সে বলিল,—প্রথম বলিব আমাদের অর্থাৎ ফানুষের প্রত্নতত্ত্ব। তারপর যদি সময় থাকে তো ভক্তিতত্ত্ব সাকার-নিরাকারতত্ত্ব এবং বৈরাগ্যতত্ত্ব প্রভৃতিও বলিবার ইচ্ছা আছে। আমি মহাকৌতূহলাক্রান্তচিত্তে তাহাকে বলিলাম;—বেশ ভাই, বলিয়া যাও, আমি খুব আগ্রহের সহিতই শ্রবণ করিতেছি। ফানুষবাবুও তত্ত্ব উপদেশ আরম্ভ করিল। বলিল,—দেখ ভাই, এই যে আমরা ফানুষ, আমরা হইতেছি মানুষের পূর্ব্বপুরুষ। প-বর্গের গোড়া হইতে

আরম্ভ কর, প্রথম হইবে—পানুষ, তারপর ফানুষ, বানুষ ও ভানুষ, তারপর হইবে—মানুষ। তবেই দেখ, মানুষ যে তোমরা, সেই তোমাদের আদিতে আমরা নই কি না?

ফানু বাবুর কথা শুনিয়া হাসিবই বা কত? সংস্কৃত কলেজে পঠদ্দশার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। আমরা তখন তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি। পূজ্যপাদ রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় অধ্যাপক। রসিকের শিরোমণি তিনি একদিন রহস্যের সুরে আমাদের এক সহাধ্যায়ী তারণকৃষ্ণ নস্করকে বলিয়াছিলেন,—দেখ নস্কর! তোমাদের গোড়া হচ্ছে —তস্কর। এই দেখ না কেন,—তস্কর, থস্কর, দস্কর, ধস্কর, তার পরে নস্কর! হাসিতে হাসিতে ফানু বাবুকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—আচ্ছা ফানু বাবু, তুমি না হয় মানুষের পূর্ব্বপুরুষ হইলে, কিন্তু তোমার গোড়ায় যে পানুষ, আর পাছে যে বানুষ ও ভানুষকে দেখিতে পাইতেছি, তাহারা তবে কে? সে বলিল,—ভাই, পানুষ ও ফানুষ উভয়েই এক, পূর্ব্ব-বঙ্গে পানুষই বলে; আর বানুষ ও ভানুষের বিষয় লইয়া প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণবে তুমুল তুফান উঠিয়াছে, সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে সত্বর ইহার আলোচনা হইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ কেহ কিছু বলিতে পারিবেন না; ইহা নিশ্চিত। আমি তোমাকে গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্ব বলিয়া দিতেছি;—এই বানুষ হইতে বানর জাতির উৎপত্তি; সুতরাং দারবিন যে উক্ত জাতিকে মানব জাতির আদিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আদৌ মিথ্যা নয়। আর ভানুষ হইতে সূর্য্যবংশের সমুদ্ভব। "বিবস্বতো মনুঃ।" সূর্য্যের অনেক নাম—ভানু, বিবস্বান প্রভৃতি। সেই বিবস্বান ভানু বা সূর্য্য হইতে মনুর উৎপত্তি, ইহা তোমাদের শাস্ত্রেরই কথা। সেই মনু হইতেই মানুষের সৃষ্টি, এ কথাই বা তোমাদের কে না জানে? তবেই দেখ, ভানুষ তোমাদের পীঠোপীঠি আদিপুরুষ, আর

আমরা হচ্ছি সেই সকলেরও আদিপুরুষ। পরিষদে যে দিন এই তত্ত্বের আলোচনা হইবে, তুমি সে দিন উপস্থিত থাকিবার চেষ্টা করিবে। আমার উপদেশ মনে রাখিয়া বলিতে পারিলে তোমার সেদিন ধন্য ধন্য রবের ধূম পড়িয়া যাইবে।—বুঝলে?

ফানু বাবুর বাবুত্বের বিচার বিতর্কে পূর্ব্বেই আমার মাথা ধরিয়া গিয়াছিল, তাই আর উক্ত কথার বাদপ্রতিবাদ না করিয়া বাহবা দিয়া মানিয়াই লইলাম। এইবার ফানু বাবু অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তি-তত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিল। বলিল,—দেখ ভাই!—"অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ।" এই ভক্তিসূত্রের প্রকৃত অর্থ কি জান? সাদাসিদে অর্থ হইতেছে,—অনন্তর আমি এই হেতু বা এই নিমিত্ত ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব। অথ শব্দের অর্থ—অনন্তর, এই অনন্তর বলিতে 'কিসের অনন্তর' লইয়া অনেকে অনেক ঢেঁকীর কচকচি করিয়াছেন। আর 'অতঃ' শব্দের মানে 'এইহেতু' বা 'এই নিমিত্ত'; এক্ষেত্রেও কি হেতু বা কি নিমিত্ত, এ বিষয় লইয়া অনেকে অনেক বিচার বিতর্ক করিয়াছেন, কিন্তু ঠিক আসল অর্থটী কেহই জানেন না, আজ আমি তাহা তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। অনন্তর—অর্থাৎ তোমার নিকট আমাদের এই প্রত্নতত্ত্ব বলিবার পর, এইহেতু অর্থাৎ যেহেতু আমার একটু ধূমপান করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব এই অবকাশে তোমার নিকট আমরা (গৌরবে বহুবচন) ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব। দেখ ভাই, আমি তোমাকে ভক্তি-শব্দের অর্থ প্রভৃতি বলিতে যাইয়া নূতন একটা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সৃষ্টি করিব না, কেবল আমার স্বরূপ দেখাইয়া ভক্তির স্বরূপ আকার-ইঙ্গিতে কিছু বুঝাইতে প্রয়াস পাইব মাত্র। ভক্তিতত্ত্ব তো ভাষায় বুঝাইবার নয়? ভাই, আমার দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ, তোমাদের দৃষ্টি-গোচর আমার শরীরে আছে কি? ভিতরের রহস্য যাহাই থাকুক,

তোমরা অবশ্য বলিবে,—আমার এই দেহের উপাদান হইতেছে,—পাতলা ঘুঁড়ীর কাগজ, বাঁশের চিয়াড়ি, লোহার তার, আর একটু-আধটু আটা ও দড়ি প্রভৃতি। বিচার করিয়া দেখিলে, এ সকল সামগ্রীর মধ্যে কোনও একটা সামগ্রীরই আপনা হইতে উর্দ্ধে—আকাশে যাইবার যোগ্যতা নাই। কিন্তু যাহার উপরে যাইবার স্বতঃসিদ্ধ যোগ্যতা আছে, সেই ধূমের সাহায্যে ইহারা উপরে যাইয়া থাকে। ইহা হইতেই মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত করিয়া লও, সামগ্রী বিশেষের সঙ্গের প্রভাবে, যাহার নিজে নিজে যে বিষয়ে যোগ্যতা অদৌ নাই,—সে, সে বিষয়েও অনায়াসে যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। সংসারে আসক্ত মানুষ তুমি, সংসারের রূপরসাদি বিষয়ে যতদিন আসক্ত হইয়া অবস্থান করিবে, ততদিন তুমি কিছুতেই সেই আকাশ হইতেও উর্দ্ধতম প্রদেশে অবস্থিত ভগবদ্‌রাজ্যে যাইতে পারিবে না,—ভগবানের পাদপদ্মও পাইতে পারিবে না। কিন্তু আমরা যেমন আপাত দৃষ্টিতে কোনও ব্যক্তি বিশেষের সাহায্যে ধূম বা ষ্টীম প্রাপ্ত হইয়া, উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতম প্রদেশে চলিয়া যাই, সেইরূপ তোমরাও যদি কোনও ভগবদ্ভক্তের সানুগ্রহ সাহায্যে ভক্তির ষ্টীম লাভ করিতে পার, তাহা হইলে তোমরাও অনায়াসে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া গোলোক বৈকুণ্ঠাদি ধামে গমন করিতে পার। আমাদের কাগজ লোহা বাঁশের কলেবরকে উর্দ্ধে চালাইতে পারিবার পক্ষে ধূমই যেমন একমাত্র সহায়, এই প্রকৃতির উপাদানে গঠিত দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণকে ভগবানের পাদপদ্ম অভিমুখে চালিত করিবার পক্ষে তেমনি ভক্তিই একমাত্র সহায়। কিন্তু ভাই, ধূমও আছে, আমাদের শরীরের উপকরণ কাগজটাগজগুলিও আছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেইগুলির গঠন ধূমধারণের উপযুক্ত হইবে, ততক্ষণ যেমন কেহ সেই উপকরণগুলির দিকে অবিশ্রান্ত ধূম প্রদান করিলেও তাহারা উর্দ্ধে গমন করিতে পারে না, সেইরূপ তোমরাও যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সৎসঙ্গ-সদাচারাদি

দ্বারা আপনাকে সেই ভক্তিধারণের উপযুক্ত করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা শত ভক্তের শত সাহায্যেও কিছুতেই আপনাকে উর্দ্ধে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে না। আমাদের গঠনের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; আমরা ভিতরটায় 'আমার' বলিবার একটা কিছুই রাখি নাই, ধূমের জন্য সকলটা স্থানই খালি করিয়া রাখিয়াছি, সুতরাং ধূম সেখানে সম্পূর্ণরূপে আত্মশক্তির বিকাশ করিতে পারে এবং আমরাও তাহার সাহায্যে উর্দ্ধে উত্থিত হইতে পারি।

ভক্তি কি?—না, ভগবানে ভালবাসা। বৈষয়িক যতকিছু ভাল-বাসা, সব সরাইয়া ফেলিয়া যদি এই ভগবানে ভালবাসার জন্য অবকাশ করিয়া রাখিতে পার, বুঝিবে, তবেই তোমার গঠন উচ্চে যাইবার উপযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ অবকাশ তুমি যত বেশী বেশী করিতে পারিবে, ভক্তির শক্তি তত বেশী বেশী অনুভব করিতে পারিবে। আবার ভাই, উচ্চে উঠিলেই হয় না, দুর্দ্দৈব ঝড় ঝাপটায় ধূমের সহিত যদি আমাদের বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলে লোকদৃষ্টিতে আমাদের পতন অনিবার্য্য। তোমরাও হয়ত ভক্তির সাহায্যে অনেক উন্নতি লাভ করিলে, কিন্তু যদি ইতি মধ্যে দুর্দ্দৈব বশতঃ অভিমানের তাড়নায় ভক্তির সহিত বিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে তোমাদেরও পতন অনিবার্য্য। কিন্তু ভাই, গুরুদেব যে, আমার হৃদয়ে আলোকবাতি জ্বালিয়া দিয়াছেন, এ বাতি জ্বলন্ত থাকিতে আর আমার পতনের আশঙ্কা নাই। এ বাতির জ্বলন্ত অবস্থায় যদি ঝড়ঝাপটাও লাগে, তাহা হইলে হয় কি জান? যোগ অনলে যোগী পুরুষ যেমন দগ্ধ হইয়া যায়, আমরাও সেইরূপ এই আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাই বা দেহ-বন্ধন হইতে—শরীরবন্ধন হইতে চিরমুক্ত হইয়া যাই। তোমাদেরও মধ্যে যাহারা সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইয়া হিয়ার মাঝে এইরূপ আলোকবাতি জ্বালাইতে পারিয়াছে, ঐ বাতি জ্বলন্ত থাকিতে তাহাদেরও আর পতনের আশঙ্কা নাই; সংসারের শত বাধা

শতদিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেও তাহারা ঐ অনলের সাহায্যে সর্ব্বকর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া গুণময় দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া যাইবেই যাইবে।

দেখ ভাই! অনেকদিন পরে দেখা, তাই গোড়ায় একটু আধটু রহস্য করিয়াছি বটে, কিন্তু এখন তোমাকে প্রাণের কথাই প্রকাশ করিয়া বলিতেছি,—শ্রীভগবানের সাকার শ্রীবিগ্রহ না হইলে ভাই, ভক্তি একটা কথার কথা। দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন,—'হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।' 'হৃষীক' শব্দের অর্থ হইতেছে ইন্দ্রিয়, যিনি সেই ইন্দ্রিয়ের অধিপতি, তাঁহার নাম 'হৃষীকেশ'। সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা, সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যিনি অধিপতি, তাঁহার সেবাই হইল ভক্তি। তবেই দেখ ভাই, যাঁহার কোনও আকার নাই, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার সেবা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে বল দেখি? যিনি প্রকৃত ভক্ত, ভগবান তাঁহার কাছে কখনও নিরাকার হইতে পারেন না, ভক্তের কাছে ভগবান্ চিরদিনই সাকার—করচরণাদি অবয়ব বিশিষ্ট। ভক্তিহীন জ্ঞানী যে শ্রীভগবান্‌কে নিরাকার বলেন, তাহাতে তাঁহার বড় দোষ নাই, কেননা তিনি ত ভক্তের মত তাঁহার সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই? তিনি যে বহুদূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন। ভক্তের কাছে ভগবান্ হয় প্রভু, না হয় সখা, না হয় পুত্র, না হয় প্রাণকান্ত, কিন্তু জ্ঞানীর কাছে ভগবান্ অবাঙ্মনসোগোচর। এক কথায় বলিতে গেলে, জ্ঞানী বহুদূর হইতেই ভগবান্‌কে দেখেন বলিয়াই তাঁহার কাছে ভগবান্ করচরণাদি-বৈশিষ্ট্যবিহীন বা নিরাকার, আর ভক্ত তাঁহাকে অতি নিকট হইতে নিকটতম প্রদেশে দেখেন বলিয়াই ভক্তের কাছে তিনি করচরণাদি বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট বা সাকার। এই আমাকে দিয়াই তোমাকে এ কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিই। দেখ ভাই, আমার দিকে একবার

ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ, এখন আমি তোমার খুব নিকটে রহিয়াছি, তুমি আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশ উত্তমরূপেই দেখিতে পাইতেছ, কিন্তু আমি যখন আবার উড়িয়া দূরে চলিয়া যাইব, তখন তুমি আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছুই দেখিতে পাইবে না। কিন্তু দেখিতে পাইবে কি?—না, আমার বৈশিষ্ট্যশূন্য জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ মাত্র। জ্ঞানীর ব্রহ্ম এই জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহেন, কিন্তু ভক্তের ভগবান্ হাত-পা-ওলা প্রেমের ঠাকুর! এই সাকার-নিরাকার-তত্ত্ব কিছু বুঝলে?

ফাস্নু বাবুর পেটে যে এত বিদ্যা ছিল, তা কে জানে? আমি ত শুনিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বৈরাগ্যতত্ত্ব বলিবার জন্য অনুরোধ জানাইলাম, সে-ও বলিতে আরম্ভ করিল। বলিল,—দেখ ভাই, তর-বেতর চুল, গোঁপ, দাড়ি ছাঁটা কাপুড়ে বাবুদের দেখিয়া যেমন প্রকৃত বাবুয়ানা বুঝিতে পারা যায় না, তেমনি হরেক রকম ভেকধারী বৈরাগীদের দেখিয়া খাঁটি বৈরাগ্য জিনিষটা বুঝিতে পারা যায় না। সংসারের সকল সামগ্রীতে বিরক্তি বা আসক্তি ত্যাগই বৈরাগ্যের প্রকৃত স্বরূপ। এই বৈরাগ্য যাহার জন্মিয়াছে, সংসারের মোহনীয় লোভনীয় আকর্ষণ আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, সে উধাও হইয়া ভগবানের দিকে ছুটিয়া চলিয়া যায়। রসনাতর্পণের কিংবা কামিনীকাঞ্চনের লালসায় যাহারা বৈরাগীর বেশে দেশে দেশে প্রতারণার ফাঁদ বিস্তার করিয়া বেড়ায়, তাহারা এই পবিত্র বৈরাগ্যের নামে কলঙ্ক-লেপ করে মাত্র। ভাইরে, শ্মশানবৈরাগ্যের মত ছোটখাট বৈরাগ্য মানবজীবনে একআধবার আসেই আসে, তাহার একএকটা ঝলক আসিলে মানুষ সংসারের আসক্তি কাটাইয়া ভগবানের দিকে একটু আধটু অগ্রসরও হইয়া থাকে; কিন্তু সে বৈরাগ্যের বেগ তেমন প্রবল নয় বলিয়া তাহাকে আবার পুনর্মূষিক হইতে হয়,—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া

আসিতে হয়, সুতরাং বৈরাগ্যের এরূপ অবস্থায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় ঘরের ছেলে ঘরেই থাকিয়া অথবা কোন নিরুপদ্রব পবিত্রস্থানে অবস্থান করিয়া গুরূপদিষ্ট প্রণালী অনুসারে ভগবদ্ভক্তির সাধন করিতে হয়। তাহার পর, সাধন করিতে করিতে যেমন ভগবদ্ভক্তিতে ভিতরটা ভোরপূর হইয়া উঠিবে, অমনি সংসারের টান আপনা হইতে কমিয়া যাইবে, ভগবানের দিকেও আপনা আপনি প্রবল টান আসিয়া পড়িবে। এ অবস্থায় আপনা আপনি সে সংসার হইতে একেবারে তফাৎ হইয়া পড়িবে; আর তাহার ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এই আমাকে দিয়াই বিষয়টা তোমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিই। যে ষ্টীম বা ধূমের সাহায্যে আমরা তোমাদের হাত ছাড়াইয়া বহুদূরে চলিয়া যাই, সেই ষ্টীম যদি পূরাপূরি না হয়, তাহা হইলে একটু উঠিয়াই আমাদিগকে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়। এই দেখনা ভাই, আমারই দশা কি হইয়াছিল? ষ্টীম বা ধূম কিছু কম পড়িয়াছিল বলিয়াই ত উপরে উঠিয়াও আবার আমাকে নামিয়া আসিতে হইয়াছে। তোমার এই পিয়ারা গাছের উপর নিরুপদ্রব স্থানে বসিয়া আমি আমার গুরুদত্ত দীপের সাহায্যে শক্তি সংবর্দ্ধিত করিয়া লইয়াছি, এইবার ষ্টীম পূরা হইয়া উঠিয়াছে, উপর হইতে প্রবল টান ধরিয়াছে, আর আমার এখানে থাকিবার যো নাই। ভাই, কিছু মনে করিও না, আমি চলিলাম। আরও তোমায় বলিবার কথা অনেক ছিল, কিন্তু আর পারিয়া উঠিলাম না। ক্ষমা করিও ভাই, যদি পার তো কাঙ্গালের কথা কয়টা মনে রাখিও।

এই বলিয়া ফানু বাবু হাস্যমুখে হুস্ হুস্ করিয়া আকাশপথে উড়িয়া চলিয়া গেল। নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে দেখিতে দেখিতে সে যেন নক্ষত্রের দলে মিশিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

[বঙ্গবাসী; ২২শে অগ্রহায়ণ; ১৩২৪ সাল।]

ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।

হরিদাস ও কৃষ্ণদাসে বড়ই বন্ধুত্ব। এ ওকে একদিন না দেখিলে থাকিতে পারে না; এতই বন্ধুত্ব। কিন্তু দুইজনের স্বভাব ঠিক বিপরীত। এত বিপরীত,—যেন একজন পূর্ণিমা, আর একজন অমাবস্যা। হরিদাস পরম ধাম্মিক, কৃষ্ণদাস অধার্ম্মিকের একশেষ। হরিদাস প্রতিদিন সন্ধ্যার পর দেবমন্দিরে যাইয়া ভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করেন, আর কৃষ্ণদাস প্রতিদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে-না-হইতে বেশ্যাভবনে গমন করিয়া মদ্যপান ও অখাদ্য ভোজন করিতে থাকেন।

আপনার দল পুষ্ট করিতে সকলেই চায়। হরিদাসের ইচ্ছা, কৃষ্ণদাস আমার দলে আসুক, আমার মত হরিভজনা করুক, হরিপ্রেমে মজিয়া রহুক। কৃষ্ণদাসেরও ইচ্ছা, হরিদাস আমার দলে আসুক, আমার মত বেশ্যাবাড়ী গিয়া মদ্যপান করিয়া বিভোর হইয়া থাকুক। ইচ্ছা হইলে কি হয়, দুই জনেই দুইদিকে এমনই মজিয়া গিয়াছে যে, কেহ কাহাকেও আপন দলে টানিয়া আনিতে পারে না, অবশেষে একদিন কৃষ্ণদাস হরিদাসকে বলিলেন,—ভাই, আজিকার দিন আমাদের উভয়ের ভাগ্য-পরীক্ষার দিন নির্দ্ধারিত হউক;—আমাদের দুই জনের মধ্যে আজি যে লাভবান্ হইবে, তাহারই দলে অপরকে আসিতে হইবে। আমার লাভ হয় তো তুমি আমার দলে আসিবে,—আমার মত বেশ্যাবাড়ী গিয়া মদ খাইয়া মাতামাতি করিবে। আর তোমার লাভ হয় তো আমিও তোমার দলে প্রবেশ করিয়া, তোমারই মত দেবালয়ে গিয়া ভগবৎকথা শ্রবণ কীর্ত্তন রসে মাতিয়া থাকিব।

কথা পাকাপাকি হইয়া গেল। হরিদাস হরি স্মরণ করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরীক্ষার ফল দেখিবার জন্য একটু ব্যাকুলও যে না হইলেন তাহা নহে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তিনিও পূতচিত্তে ভগবন্মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছুদূর যাইতে-না-যাইতে তাঁহার পদতলে একটা কিসের কাঁটা ফুটিয়া গেল, তাহাতে তিনি যেন কিছুক্ষণ অচেতনের মত হইয়া পড়িলেন। এমন কি, একটি পা ফেলাও যেন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বোধ হইল। তাহার পর, অসহ্য যাতনাতে তিনি আরও অধীর হইয়া পড়িলেন, তাঁহার আর দেবালয়ে যাওয়া হইল না। তিনি অসহ্য যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বাড়ীতেই ফিরিয়া আসিলেন। তিনি একটুখানি বসিতেও পারিলেন না; শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। মনে মনে কেবল বলেন,—দয়াময়, এ আবার কি ছলনা প্রভু!

এদিকে কৃষ্ণদাসও যথারীতি বেশ্যাভবনে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক তোড়া টাকা কুড়াইয়া পাইলেন। টাকার তোড়া হাতে লইয়া তিনি বন্ধু হরিদাসের বাড়ীর দিকেই ছুটিলেন। কেননা, পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য তাঁহারও প্রাণটা তোলপাড় করিতেছিল। তিনি হরিদাসের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদাসের মুখে তাঁহার অবস্থা সকলই শুনিলেন। শুনিয়া দুঃখিত না হইয়া বরং আনন্দিতই হইলেন। হাতে-ধরা টাকার তোড়া দেখাইয়া হর্ষভরে বলিয়া উঠিলেন,—বন্ধু, এই দেখ, আমি পথে যাইতে যাইতে এই মাত্র এই টাকার তোড়া কুড়াইয়া পাইয়াছি। সুতরাং বলিতে হইবে, আমারই আজ লাভ হইয়াছে। আর তোমার লাভ না হইয়া বরং লোকসানই হইয়া গেছে। তাই বলি বন্ধু, তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর,—তুমি আমার দলভুক্ত হও।

দুই বন্ধুতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় একজন

সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী সহসা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদাস ভক্তিভরে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী হাসিতে-হাসিতে হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এত তক্‌রার কিসের?

হরিদাস তাঁহার সমীপে উভয় বন্ধুর সকল কথাই আমূল বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই সর্ব্বজ্ঞ সন্ন্যাসী হাস্যবদনে বলিতে লাগিলেন,—বাপু হে, সংসারের সকলে স্থূল জিনিষটাই দেখে, সূক্ষ্ম জিনিষ দেখা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কৃষ্ণদাস আজ এক তোড়া টাকা পাইয়াই আপনাকে লাভবান, আর তোমার কাঁটাফোটার ক্লেশ দেখিয়া তোমাকে মহা ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিতেছে। এইরূপ মনে করিবারই কথা। তাহার তো আর সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাই? ভগবান্ কিংবা তাঁহার ভক্তের কৃপা না হইলে তো আর এ দৃষ্টি লাভ করা যায় না? তা কৃষ্ণদাসের দোষই বা দিব কি? কিন্তু বাবা, আজ তোমাদের দুই বন্ধুর দুইটি বিচিত্র ঘটনার সূক্ষ্ম তত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া আমার প্রাণে যে কি বিমল আনন্দ উত্থিত হইতেছে, আর সেই লীলাময় ভগবান্‌কে যে কত শত শত সাধুবাদ দিতে ইচ্ছা হইতেছে, তাহা আর কি বলিব।

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া উভয়ের কৌতূহলের আর সীমা নাই। উভয়েই আগ্রহসহকারে সেই সূক্ষ্মতত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যাকুলতা জানাইলেন। সন্ন্যাসীও বলিতে লাগিলেন,—বৎস হরিদাস, আজ তোমার মৃত্যুর দিন অবধারিত ছিল, তুমি যে স্থলে পদতলে কণ্টকের আঘাত পাও, তাহার কিঞ্চিৎ ব্যবধানেই এক ভয়ঙ্কর বিষধর সর্প শয়ন করিয়া ছিল। তুমি আর এক পদ অগ্রসর হইলেই সেই বিষধরের পৃষ্ঠেই তোমার পদাঘাত হইত, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষধরের দংশনে তোমাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইত। কিন্তু তুমি নাকি সেই ভগবান্ শ্রীহরির শরণাগত, তাই

তিনি কৌশলে তোমার পায়ে কাঁটা ফুটাইয়া দিলেন। তুমি কাঁটার আঘাত পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলে, ব্যথা অনুভব করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলে, তাই কাল-সর্পের মুখ হইতেও বাঁচিয়া গেলে। সামান্য একটু কাঁটা ফোটার কষ্ট পাইলে, এই মাত্র। আর বৎস কৃষ্ণদাস, আজ তোমার রাজা হইবার দিন স্থিরই ছিল। কিন্তু তুমি সর্ব্বদা অপকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর বলিয়া, তোমার সমস্ত সুকৃতির ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তাই তুমি সেই পদে বঞ্চিত হইলে। সামান্য একতোড়া টাকা পাইলে, এই মাত্র। এইবার একবার উভয়ের লাভ-লোকসানটা খতাও দেখি, কাহার্ লাভ হইল, সহজেই বুঝিতে পারিবে। একপক্ষে কোথায় মৃত্যু, আর কোথায় সামান্য একটু কাঁটা-ফোটার কষ্ট! আর একপক্ষে কোথায় রাজপদ, আর কোথায় একতোড়া টাকা! লাভটা বেশী হইল কাহার?

সন্ন্যাসীর কথা শুনিতে শুনিতে হরিদাসের কণ্টক-ক্লেশ অন্তর্হিত হইল। ভগবানের মধুময় মহিমার সাগরে তিনি যেন ডুবিয়া গেলেন। কৃষ্ণদাসেরও মনের ময়লা কাটিয়া গেল। তাঁহার হৃদয় যেন এক নূতন আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিল। বেশ্যা ও মদের অপেক্ষাও আরও যেন এক অপূর্ব্ব নেশার সামগ্রী তিনি দেখিতে পাইলেন। আর সেই দিনই মনে-প্রাণে বন্ধু হরিদাসের দলভুক্ত হইয়া পড়িলেন। আনন্দময় সন্ন্যাসীও বন্ধুযুগলের এই আনন্দ-সম্মিলন দর্শনে পরমানন্দিত হইলেন এবং হাস্য করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। যাইবার সময় কেবল একটি কথা বলিয়া গেলেন,—বাবা! চর্ম্মচক্ষে যাহা দেখ, তাহাই চরম মনে করিও না। সর্ব্বদা মনে রাখিও,—ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।

[বঙ্গবাসী; ২৯শে ফাল্গুন; ১৩১৫ সাল।]

মনোজয়ের সহজ উপায়।

এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। অনেকগুলি পরিবার;—এক স্ত্রী, চারিটী পুত্র, পাঁচটী কন্যা। তাহার উপর দেবতা আছেন, অতিথি-অভ্যাগত আছেন। ব্যয় বড় অল্প নয়। কিন্তু উপার্জ্জন যৎসামান্য;—সংসার বেশ স্বচ্ছলে চলে না। শরীর যখন ভাল ছিল, তখন তিনি এক রকমে কষ্টে-স্রষ্টে দিনপাত করিতেছিলেন; কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে এবং অনিয়মিত ও অপর্য্যাপ্ত আহারে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইল। অথচ তাহার উপর তাঁহাকে ক্ষমতার অধিক খাটিতে হয়। না খাটিলে একবেলা চলা ভার বলিয়াই খাটিতে হয়। খাটুনি যত অল্প হইতে লাগিল, রোজকারও তত কমিতে সুরু করিল। কাজেকাজেই নিজের ও পরিবারবর্গের আহারের মাত্রাও ক্রমে ক্রমে কম হইতে থাকিল। কয়েকদিন একবেলা আহার জুটিতেছিল, আজ দুই দিন তাহাও জুটে নাই। ব্রাহ্মণের এখন দাঁড়াইলে মাথা ঘুরিয়া পড়ে। এ অবস্থায় তিনি যানই বা কোথায়—করেনই বা কি? চিন্তার আর কূল-কিনারা নাই। ক্ষুধার্ত্ত বালক-বালিকার কাতর ক্রন্দন শুনিয়া শুনিয়া,—তাহাদের ম্লান মুখমণ্ডল দেখিয়া-দেখিয়া তিনি যেন কেমন একতর হইয়া গিয়াছেন। বাহিরে দাওয়ায় বসিয়া গালে হাত দিয়া তিনি 'কি করেন?' ভাবিতে-ছেন, আর দরদরধারে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। এমন সময় তাঁহার পত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার কাছে আসিলেন। কঙ্কালসার কয়েকটি বালক-বালিকা তাঁহাকে ছাঁকিয়া ধরিয়া আছে;—আর জঠরের জ্বালায় মহা কান্নাকাটি করিতেছে। ওঃ, সে দৃশ্য দেখিলে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া

যায়। ব্রাহ্মণ একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। ব্রাহ্মণী কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন,—ওগো চাহিয়া দেখিতেছ কি;—আজ আহার না জুটিলে সকলকেই আমাদের যমালয়ের অতিথি হইতে হইবে। তাহার অপেক্ষা তুমি এক কাজ কর;—কিছু বিষ সংগ্রহ করিয়া আনো, বাছাদের মৃত্যু দেখিবার পূর্ব্বেই ইহলোক হইতে বিদায় লই।

ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া আর বাক্য বাহির হয় না। কি যে বলেন ভাবিয়াও কিছু ঠিক পান না, ধৈর্য্যধারণের উপদেশের সময় চলিয়া গিয়াছে, এখন চাই আহার,—না হয় মরণ। ব্রাহ্মণ সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন,—দেখ, রোজ-রোজ প্রতিবেশীদের উপর কত উপদ্রব করি বল? দূরগ্রামে যাইবারও সামর্থ্য নাই। আজিকার দিনটা কোন রকমে কাটাইয়া দাও, কল্য একজনের কাছে কিছু পাইবার সম্ভাবনা আছে। আর না হয়, পাড়াঘরে একবার ঘুরিয়া আসি, দেখি যদি শিশুদের মতও কিছু মিলে।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ গুটি গুটি বাটীর বাহির হইলেন। তিনি পত্নীর নিকট মুখে বলিয়া আসিলেন বটে,—পাড়াঘরে ঘুরিয়া আসি, কিন্তু তাঁহার মনের কথা তাহা নয়। তাঁহার মনের ভাব,—ঐ অছিলায় তো এখন এখান হইতে বাহির হইয়া পড়ি, তাহার পর কোন নির্জ্জন পুষ্করিণীতে গিয়া নিমজ্জিত হই। নচেৎ এ দৃশ্য তো আর দেখা যায় না। ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহাও তো কল্পনায় কুলায় না।

গ্রামের প্রান্তেই বন। ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে স্খলিতপদে সেই বনে গমন করিলেন। কিছুদূর গিয়া দেখেন, এক সুরম্য শিবমন্দির। সম্মুখে সুবৃহৎ সরোবর। জন-মানব নাই,—নির্জ্জন যেমন হইতে হয়। ভাবিলেন,—এই তো শুভসংযোগ, আর কেন,—এই জলাশয়েই ভব-লীলা সাঙ্গ করি। এই সময় তাঁহার একবার শেষ পত্নী-পুত্রাদির কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না;—সেই

সলিলাশয়ের সোপানে বসিয়া অঝোরনয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে দেখেন—পার্শ্বেই একটী বিল্ববৃক্ষ নূতন পত্রে ভরিয়া রহিয়াছে। তাঁহার সাধ হইল,—সেই ত মরিবই, তা এই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া এই বিল্বপত্র তুলিয়া শূলপাণির পূজাটাই একবার করি না কেন? ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। তিনি স্নান করিয়া নব-নব বিল্বপত্র চয়ন করিয়া,—মন্দিরের মধ্যে গমন করিলেন এবং প্রাণের সাধ মিটাইয়া নয়নজলে ও বিল্বদলে প্রাণেশ্বরের পূজা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ তো নিত্যই শিব পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু এমন পূজা তাঁহার ভাগ্যে একটী দিনও ঘটে নাই। তাঁহার হর-হর ব্যোম-ব্যোম রবে মন্দিরের মধ্যভাগ গম্‌গম্ করিতে লাগিল। প্রীতিমাখা স্তবস্তুতিতে আশুতোষের পরম সন্তোষ জন্মিল। ব্রাহ্মণ মহেশকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া মরিবার জন্য সরোবরের তীরে আসিলেন। একবার এদিক ওদিক চাহিয়া লইলেন। তাহার পর "জয় জয় শিব শম্ভু" বলিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে গেলেন। তাঁহার উদ্যম কিন্তু তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। দেখিলেন,—সম্মুখেই কে একজন রজত-শুভ্র-কান্তি ব্রাহ্মণ দুই হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক বাধা দিয়া বলিতেছেন,—আরে, কর কি,—কর কি? ব্রাহ্মণ-শরীর;—আত্মহত্যা?—আত্মহত্যা মহাপাপ!

ব্যাপার দেখিয়া ব্রাহ্মণ একটু চমকিয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু তিনি মৃত্যুর পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে চাহিলেন না। তিনি নবাগত ব্রাহ্মণের কথায় প্রতিবাদ করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—মহাপাপ,—কিসের মহাপাপ? যে মহাপাতকে আমাকে নিত্য লিপ্ত হইতে হইতেছিল, তাহার কাছে এ আবার মহাপাপ কিসের? আপনি যে-ই হউন, আমাকে আর বাধা দিবেন না, বাধা দিবেন না; এই আত্মহত্যাই

এখন আমার একমাত্র অবলম্বন,—এই আত্মহত্যাই এখন আমার পুণ্যের পবিত্র প্রস্রবণ।

সে বাধাদায়ক ব্রাহ্মণ যে কে, তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না? তিনি হইতেছেন—ব্রাহ্মণের পূজায় প্রসন্ন স্বয়ং প্রমথপতি। তিনি স্নেহ-সম্ভাষণের প্রবল আকর্ষণে ব্রাহ্মণকে আত্মহত্যা হইতে নিরস্ত করিলেন এবং তাঁহার দুঃখ দূর করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। আত্মপরিচয় একটু গোপন করিয়া বলিলেন,—দেখ বাপু! আমি হইতেছি শিবকিঙ্কর; এই বন শিবের বন,—ইহার রক্ষার ভার আমারই উপর। আমার শাসনে এ বনে কাহারও অন্যায় আচরণ করিবার যো নাই; তাই আমি তোমার অপকর্ম্ম দেখিতে পাইয়াই আসিয়াছি; তাহা হইতে তোমাকে নিবৃত্তও করিয়াছি। আমার প্রভু তোমার পূজায় বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছেন। তোমার কোন ভয় নাই। অন্য কেহ হইলে ঐ গর্হিত কার্য্যের জন্য দণ্ডভোগ করিতে হইত। তা তুমি এক কার্য্য কর। তোমাকে আমি একজন লোক দিতেছি,—তুমি ইহাকে যখন যাহা আদেশ করিবে, এ তখনই তাহা সম্পন্ন করিয়া দিবে; তা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যেখানকার যে জিনিষ আনিতে বলিবে, তাহাই তৎক্ষণাৎ আনিয়া হাজির করিতে পারিবে। কিন্তু একটী সর্ত্ত ইহাই থাকিবে যে, তুমি ইহাকে চুপ করিয়া বসাইয়া রাখিতে পারিবে না, সর্ব্বদাই একটা-না-একটা ফরমাস করিতেই হইবে। না পারিলেই বড় গোল। ইহাকে হুকুম করিয়া খাটাইতে না পারিলে এ-ই তোমাকে খাটাইয়া লইবে। খাটাইতে পারিলে তুমিই ইহার মনিব, না খাটাইতে পারিলেই এ-ই তোমার মনিব হইয়া বসিবে। তবে ইহার আহার বা মাহিনা তোমাকে কিছুই দিতে হইবে না। কেমন?—দেখ, এইরূপ চাকর রাখিতে প্রস্তুত আছ কি?

শঙ্করের স্মরণমাত্র একজন চঞ্চল-স্বভাব লোক আসিয়া উপস্থিত।

ব্রাহ্মণও ব্যাপার দেখিয়া মহা বিস্মিত! তিনি ভাবিলেন,—আমার তো আর অভাবের কূল-কিনারা নাই, যদি লোকটার ঐরূপ শক্তিই থাকে,—যখনই যাহা বলিব তখনই তাহা আনিতে পারে, তাহা হইলে ও কত ফরমাস্ খাটিবে খাটুক না কেন? আমি হুকুম করিব,—স্বর্গ হইতে এই সামগ্রীটা আন,—পাতাল হইতে অমুক জিনিষটা লইয়া আইস,—এইরূপ কত কি মৎলবমত আদেশ করিতে থাকিব; তখন ও আর ফুরসৎ পাইবে কোথায়? কিন্তু কেবল কথায় ভুলিলে চলিবে না, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইতে হইতেছে,—যথার্থ ই লোকটার ঐরূপ শক্তি আছে কি না? এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ মায়াব্রাহ্মণকে বলিলেন,—মহাশয়! আপনার যেরূপ সৌম্য মূর্ত্তি, তাহার উপর যেরূপ সুধাসিক্ত উক্তি, তাহাতে আপনার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না। আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতেও বিশেষ কোন আপত্তি দেখা যায় না। কিন্তু কিছু মনে করিবেন না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে,—নিজের কপাল বড় মন্দ বলিয়াই ইচ্ছা হইতেছে; জিজ্ঞাসা করি,—আপনার এ লোকটা এখনই আমার আদেশমত কোন কার্য্য করিতে সম্মত হইবে কি না?

মায়া-ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তা কেন হইবে না? তুমি ত উক্ত সর্ত্তে সম্মত আছ? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আজ্ঞে হাঁ। ভগবান্ হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন,—ভাল কথা। তিনি সেই লোকটিকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন,—দেখ বেতাল! তুমি আজ হইতে এই বিপ্রের কিঙ্কর হইলে; কড়াড়ের কথা সকলই শুনিয়াছ; যাও,—ইঁহার সমীপে যাও; কি করিতে হইবে জিজ্ঞাসা কর।

পশুপতির অনুমতি পাইয়া বেতাল সেই ব্রাহ্মণের নিকটে যাইয়া কহিল,—মহাভাগ! দাসের প্রতি কি আদেশ? ব্রাহ্মণ তখন বড়ই ক্ষুধার্ত্ত, তিনি বলিলেন—আচ্ছা, কিছু উত্তম খাদ্য আনয়ন কর দেখি?

বেতাল ভূতযোনি; ব্রাহ্মণের কথা মুখ হইতে বাহির হইতে-না-হইতে সে চলিয়া গেল এবং চক্ষের পলক পড়িতে-না-পড়িতে পালটিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বড় চেঙ্গারির এক চেঙ্গারি উপাদেয় খাদ্য উপস্থিত করিয়া দিল। খাবার দেখিয়া তাঁহার কিন্তু আহার করা হইল না; অভুক্ত সন্তানগণের ক্ষুধার্ত্ত মূর্ত্তি যেন তাঁহার নয়নসমক্ষে খেলিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাটী যাইবার জন্য তাঁহার অন্তরে একটা উৎকট ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখনই সেই মায়া-ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে প্রস্তুত হইলেন। অন্তর্য্যামী সমস্তই জানিতেছেন, তিনি প্রসন্নমুখে ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া বলিয়া দিলেন—দেখ, দেবাদিদেব তোমার প্রতি যার-পর-নাই প্রীতিলাভ করিয়াছেন; তুমি তাঁহার করুণা স্মরণ করিও; যদি কখনও বিপদে পতিত হও তো এখানে আসিও—স্মরণমাত্রেই আমি তোমায় দেখা দিব,—আপদ-বালাই দূর করিয়া দিব।

ব্রাহ্মণ এখন যেন নব-বলে বলীয়ান্। গৃহে যাইয়া যে শিশুসন্তানগণকে কিছু খাইতে দিতে পারিবেন,—তাহাদের বিশুষ্ক ও পরিম্লান অধরপ্রান্তে আবার যে শুভ্রহাস্যের কৌমুদীচ্ছটা দেখিতে পাইবেন, তাহাদের অরুন্তুদ ক্রন্দনের রোল যে আনন্দকোলাহলে পরিণত করিতে পারিবেন, এই আনন্দেই তিনি আত্মহারা। তিনি বেতালকে বলিলেন,—চল, ঐ খাবারগুলি লইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে চল; অতঃপর যাহা করিতে হইবে, তাহা বাটী গিয়া বলিয়া দিব।

তাঁহারা তো বনভূমি ছাড়িয়া গ্রামের অভিমুখে চলুন। এদিকে ব্রাহ্মণের পত্নী সেই পতির প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন, আর মধ্যে মধ্যে ক্ষুধায় কাতর বালকবালিকা-সকলকে—"ঐ তোদের বাবা খাবার নিয়ে আস্‌ছে"—প্রভৃতি আশ্বাসের ভাষায় সান্ত্বনা

করিতেছেন। তিনি দূর হইতেই পতিকে দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে কে একজন লোক কিসের একটা মস্ত বোঝা বহিয়া আনিতেছে। দেখিয়া তাঁহার বড় আনন্দ হইল। ভাবিলেন,—ভগবান্ বুঝি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন; ছেলে-পুলেদের বুঝি আহারদানে বাঁচাইতে পারিব? এইরূপ ভাবিতেভাবিতেই ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার হাসিহাসি মুখই পত্নীর সকল উৎকণ্ঠা দূর করিয়া দিল। তিনি নিঃসংশয় বুঝিলেন,—এই বোঝায় আহার্য্য ছাড়া কিছুই নাই। তাহার পর ব্রাহ্মণ যখন সেই দেবদত্ত ভৃত্যকে খাবারের চেঙ্গারিটি তাঁহার পত্নীর নিকটে রাখিতে বলিলেন, তখন সতীর আর বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। তিনি—ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য পতির প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন—সে অনেক কথা, শুনিতেই পাইবে এখন। এখন এক কার্য্য কর, বাছাদের সব খাইতে দাও; দেখিয়া আমি আনন্দিত হই।

পতিব্রতা পুত্রকন্যাগণকে খাইতে দিলেন। সেরূপ খাদ্য তাহারা কখনও চক্ষে দেখে নাই, তাহার অপূর্ব্ব আস্বাদে তাহাদের রসনা জুড়াইল,—ক্ষুধারও নিবৃত্তি হইল। তাহারা মহা আনন্দে নাচিয়া-কুঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ সর্ত্তের কথা ভুলেন নাই; তিনি সেই ভৃত্যকে একটা মস্ত প্রকাণ্ড লম্বাচওড়া হুকুম করিলেন,—দেখ বাপু, এই স্থানে একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে; তুমি অগ্রে তাহার বন্দোবস্ত কর,—ইমারতের মালমশলা সংগ্রহ করিয়া আন। বেতালও "যে আজ্ঞে" বলিয়া বিদায় লইল। দেখিতেদেখিতে সে কোথা হইতে ইঁট-কাঠ চূণ-সুরকি প্রভৃতি মালমশলা রাশিরাশি আনিয়া ফেলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ এই অবকাশে আহার করিয়া লইলেন। পত্নীকেও যথাযথকথা কতক-কতক বলিলেন। তাঁহার আহারের পর পত্নীও আহার

করিলেন। এমন সময় বেতাল আসিয়া বলিল,—মালমশলা সকলই প্রস্তুত, এখন কি করিতে হইবে বলুন? তাহার ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া ব্রাহ্মণ মহা বিস্মিত, প্রত্যুত কিঞ্চিৎ চিন্তিতও হইলেন। বলিলেন,—এই-বার একখানা বাড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহারই বন্দোবস্ত কর। বেতাল বলিল,—যে আজ্ঞে। সে সেই রাত্রের মধ্যেই বৃহৎ অট্টালিকা বানাইয়া ফেলিল। প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ শয্যা হইতে উঠিয়া দেখেন—কি আশ্চর্য্য, এ যে প্রকাণ্ড প্রাসাদ! এরূপ একটা অট্টালিকা নির্ম্মাণ তো চারি পাঁচ বৎসরের নীচে কিছুতেই হইতে পারে না। তিনি এইরূপ মহা বিস্ময়ে নিমগ্ন, এমন সময় বেতাল আসিয়া বলিল,—প্রভু! প্রাসাদ তো প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—উত্তম কথা, এখন এক কার্য্য কর, ইহার সংলগ্ন দেবালয়, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, হস্তিশালা, অশ্বশালা, অতিথিশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ কর। "যে আজ্ঞে, তাহাই করিতেছি" বলিয়া বেতাল চলিয়া গেল। তাহাও তৎপর তৈয়ারি হইয়া গেল। সে আবার আসিয়া "কি করিতে হইবে?" জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—এই বাটীর যথাস্থানে ধন-রত্ন বসন-ভূষণ হস্তী-অশ্ব প্রভৃতি স্থাপন কর। বেতালও "প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য" বলিয়া গমন করিল এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল, আবার তাহার ব্রাহ্মণের কাছে কাজের তাগিদ। তাগিদের চোটে ব্রাহ্মণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। দুই চারি দিবসেই তাঁহার সকল ফরমাস ফুরাইয়া গেল। তিনি কেবলই ভাবেন, তাইতো এইবারে আবার কি আনিতে হুকুম করি। বেতাল আসিলেই তিনি হয়—"সাত সমুদ্রের জল লইয়া আইস, কি আকাশের নক্ষত্র গণিয়া আইস" গোছের এক একটা বিদ্‌কুটে ফরমাস করিতে লাগিলেন। ফলে হইল কি, তাঁহার অত বিষয়-বৈভব কোঠাবালাখানা প্রভৃতি কিছুই ভাল লাগে না। তিনি সেই ভূত্যের

চিন্তাতেই অস্থির হইয়া পড়িলেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই। পূর্ব্বে যে চেহারা ছিল, সে চেহারাও নাই। দেহ দিন দিন ক্ষীণ ও মলিন হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন,—ভৃত্য লইয়া তো ভালই বিপদ হইল দেখিতেছি। এখন করি কি? না হয় একবার সেই শিবের বনেই যাই, দেখি যদি সেই শিবকিঙ্করের দেখাই পাই, তবে তাঁহাকে এই বিপদের কথা জানাই আর বলিয়া কহিয়া—"এ ভৃত্যটিকে আর আমার দরকার নাই" বলিয়া ফিরাইয়া দিয়া আসিতে পারি।

ব্রাহ্মণ বেতালের কাছে আজ এক আজগুবি আদেশ জাহির করিয়া শিব-বনের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি সেই সরোবরে অবগাহন স্নান করিয়া লইলেন এবং বিল্বপত্র তুলিয়া পূর্ব্বের মত পার্ব্বতী-নাথের পূজায় বসিয়া গেলেন। পূজাবসানে তিনি যেমন সেই শঙ্কর-কিঙ্করের কথা মনে মনে চিন্তা করিয়াছেন,—অমনি তিনি সাক্ষাতে আসিয়া উপস্থিত। তিনি সহাস্যবদনে ব্রাহ্মণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। স্নেহসম্ভাষণে বলিলেন,—তাইতো এত কাহিল দেখ্‌চি কেন? কিছু অসুখ-বিসুখ করে নাই তো? আর সেই ভৃত্যের সংবাদ কি? সে তোমার আদেশমত সকল কর্ম্ম করিতেছে তো? উত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন,—মহাত্মন্! আপনার অনুকম্পায় আমাদের দুঃখ দারিদ্র্য দূর হইয়া গিয়াছে। অসুখবিসুখও কিছুই নাই। ভৃত্যটীও ভাল আছে। আদেশমত সকল কার্য্যও সম্পন্ন করিতেছে। কিন্তু এক দুরন্ত চিন্তায় আমায় পাগোল করিয়া তুলিয়াছে। সেইজন্যই আজ আমার এখানে আসা।

মায়াব্রাহ্মণ যেন কিছু জানেন না; তিনি বিস্ময়ে-বিস্ময়েই জিজ্ঞাসা করিলেন,—আবার তোমার বিপদ কিসের? চিন্তাই বা কিসের? ব্রাহ্মণ বলিলেন,—বিপদ আর কিছুই নয়, আপনার সেই চাকরটীকে

লইয়া বড় দায়েই ঠেকিয়াছি। এখন আপনি যদি তাহাকে ফিরাইয়া লন, তবেই আমি নিস্তার পাই। মায়াব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিলেন,—কেন, সে কি কোন উপদ্রব করে? ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আজ্ঞে, উপদ্রব এমন কিছুই নয়, তবে তাহার কার্য্যতৎপরতাই আমায় কাতর করিয়া ফেলিয়াছে। আমার মুখের কথা মুখ হইতে বাহির হয় কি না হয়, সে অমনি সেই কথা লুফিয়া লইয়া নিমেষের মধ্যে আদিষ্ট কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলে। আবার কি করিতে হইবে—কি করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিতে থাকে। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বিলাস কাহাকে বলে জানি না, দুই বেলা পেট পূরিয়া খাইতে পাইলেই হইল,—আমি এত ফরমাস কোথায় পাই বলুন? তাই দিবারাত্রি ভাবিয়াভাবিয়া আমার এই দশা ঘটিয়াছে। তাই প্রার্থনা,—আপনি আপনার প্রদত্ত ভৃত্যটিকে ফিরাইয়া লউন, আমি চিন্তার দায় হইতে নিস্তার পাই। সে ইতিমধ্যে যে সকল ধনরত্নে ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিয়াছে, তাহাতে আমি-তো-আমি আমার নিম্নতন সাত আট পুরুষেও তাহা খরচ করিয়া ফুরাইতে পারিবে না। আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন; সেই দাসটীকে আপনার নিকটে আসিতে আদেশ করুন। মায়া-ব্রাহ্মণ হাসিতে-হাসিতেই বলিলেন,—বটে, এরই মধ্যে তোমার সব ফরমাস ফুরাইয়া গিয়াছে; তুমি আর তাহাকে কি হুকুম করিবে খুঁজিয়া পাইতেছ না? তা বাপু, দেওয়া জিনিস তো আর ফিরাইয়া লওয়া চলে না। আমি তোমাকে এক উপায় বলিয়া দিই, তাহাতেই তুমি এই চিন্তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে। সে উপায় আর অন্য কিছুই নয়,—তুমি তাহাকে একটা মস্ত বড় বাঁশ আনিতে বলিবে। সেই বাঁশ যেমন তেমন নয়,—একশত-আটের উপর তাহার পর্ব্ব থাকা চাই। সে বাঁশটী লইয়া আসিলে তাহাকে সেই বাঁশটী এমন-ভাবে পুঁতিতে বলিবে যে, মাটীর উপর ঐ একশতআটটী পাব জাগিয়া

থাকে। বাঁশটী ঐ ভাবে পোঁতা-ই থাকিবে। তুমি যখন সেই ভৃত্যকে কোনকিছু আদেশ করিতে পারিবে—করিবে। না পারিলে তাহাকে বলিবে যে, অন্য আদেশ না করা পর্য্যন্ত তুমি ঐ বাঁশের উপর উঠিতে ও নামিতে থাক। ইহা হইলেই সে জব্দ হইয়া যাইবে। কাজের তাগিদে আর তোমায় ভাবাইতে পারিবে না। যাও, মঙ্গলময় তোমার মঙ্গল করুন।

ব্রাহ্মণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে সে ভৃত্যও আসিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র সে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল,—মহাশয়! আদেশ করুন—এইবার কি করিতে হইবে? ব্রাহ্মণ তাহাকে সেই বাঁশের কথা বলিলেন। সে-ও তুনিয়া ঢুঁড়িয়া সেইরূপ বাঁশ আনিয়া হাজির করিল। ব্রাহ্মণ একশত-আট-পাব উপরে রাখিয়া তাহাকে সেটী পুঁতিতে বলিলেন। প্রোথিত করা শেষ হইয়া গেলে ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিলেন,—দেখ, আমি তোমাকে যতক্ষণ না অন্য আদেশ করিতেছি, তত-ক্ষণ তুমি এই বাঁশে ওঠানামা করিতে থাক। ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া বেতাল যেন একটু থতমত খাইয়া গেল। সে ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,—তাঁই তোঁ! ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আর তাঁই তোঁয় কাজ কি,—নাও এই বাঁশের উপর উঠে পড় আর কি? বেতাল কি করে, এইবার সে মহা দায়ে ঠেকিল। সে বাঁশের উপর একবার উঠিতে ও তাহা হইতে নামিয়া আসিতে, আবার উঠিতে আবার নামিতে আরম্ভ করিয়া দিল। ফলে, এইবার ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার সকল দুঃখ এত দিনে দূর হইয়া গেল।

ইহা তো গেল গল্পের কথা। এইবার আসল কথাটা বলি,—আমাদে মন হইতেছে এই বেতালের মত। আমরা যদি তাহাকে খাটাইয়া লইতে পারি তবেই সে খাটিবে, নচেৎ সে-ই আমাদিগকে খাটাইয়া লইবে। মনের গতি সর্ব্বত্র অবারিত। সে মুহূর্ত্তমধ্যে আকাশ-পাতাল স্বর্গ-নরক সকলই

ঘুরিয়া আসিতে পারে। সে ভারি চঞ্চল। কি করিব—কি করিব করিয়া সর্ব্বদাই আমাদিগকে পাগোল করিয়া তুলে। ফরমাস করিয়াকরিয়া তাহাকে আর কাবু করা যায় না। আদেশ পাইলে সে আমার কাছে সকলই আনিয়া হাজির করিয়া দেয়। আমরা মনেমনে কি না দেখি, কি না শুনি, কি না পাই, কোথায় না যাই? তাহার ফরমাসের দায়েই আমরা সর্ব্বদা অস্থির। এখন ইহাকে যদি আপন একতারে রাখিতে হয়, তাহা হইলে তাহারও একমাত্র সহজ উপায় আছে। সে উপায়—অষ্টোত্তরশত-পর্ব্বযুক্ত বংশের মত একশতআট-মণিযুক্ত জপের মালা। তুমি যদি মনকে সহজে জয় করিতে চাও,—তবে তাহাকে এই নামের মালায় বারংবার উঠা-নামা করাও, আর যখন আবশ্যক পড়িবে তখন তাহাকে দিয়া অপর কার্য্যও করাইয়া লও। ইহাতে সে তোমার বশীভূত থাকিবে। তাহা না হইলে সে-ই তোমার উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইবে,—তোমাকে মনের অধীন হইতেই হইবে। তাই বলি ভাই, যদি সহজ উপায়ে মন জয় করিবার বাসনা থাকে, তবে এই একশত আটটী মণিতে গাঁথা নামের মালা আশ্রয় কর,—তাহাতেই মনকে নিযুক্ত রাখিয়া দাও। সে অনুলোম-বিলোম-ক্রমে তাহাতেই উঠানামা করিতে থাকুক, তাহাকে জয় করিবার জন্য আর চিন্তা করিতে হইবে না।

[বঙ্গবাসী; ৭ই আশ্বিন; ১৩১৭ সাল।]

সমাপ্ত

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদিত

ভক্তি-গ্রন্থাবলী !!!

(১) **ভক্তের জয়,**—প্রথম উল্লাসে আটটী, দ্বিতীয় উল্লাসে এগারটী এবং তৃতীয় উল্লাসে তেরটী ভক্তের চরিত্র আছে। সকল চরিত্রই সম্পূর্ণ—সকল চরিত্রই চিরমধুর। তিনটী উল্লাস তিনখণ্ডে পৃথক্ বাঁধাই করা। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲ এক টাকা করিয়া।

(২) **পূজার গল্প,**—সদানন্দের সন্ধিপূজা, মনে মনে মায়ের পূজা, মুখুয্যে মশাই এবং তারাসুন্দরী,—এই চারিটী উপদেশপূর্ণ কৌতূহলপ্রদ গল্পে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। মূল্য ।০ চারি আনা।

(৩) **শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত,**—জয়গোবিন্দ দাসের মধুর পদ্যানুবাদ। মূল্য ১৲ এক টাকা।

(৪) **শ্রীচৈতন্যভাগবত,**—টীকা-ব্যাখ্যাদিযুক্ত। গ্রন্থ অল্পই আছে। মূল্য কাগজের মলাট ৫৲ টাকা হইয়াছে।

(৫) **সাধন-সংগ্রহ,**—নিত্যপ্রয়োজনীয় স্তব-স্তোত্র প্রভৃতির এরূপ বিশুদ্ধ সংস্করণ আর নাই। ইহাতে শ্রীগোপালসহস্রনাম, শ্রীবিষ্ণু সহস্রনাম, শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়, শ্রীপাণ্ডবগীতা, শ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলি, শ্রীমুকুন্দ-মুক্তাবলী, শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, শ্রীঠাকুরমহাশয়ের প্রার্থনা প্রভৃতি ৪৬ প্রকার নিত্যপাঠ্য স্তবাদি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রভুপাদের সমস্ত গ্রন্থের প্রাপ্তিস্থান,—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

৪০।১।এ, মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন, পোঃ আঃ সিমলা, কলিকাতা।